রূপকথার আংটি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০

প্রকাশক : কান্তিরঞ্জন ঘোষ / **প্রকাশকাল :** আগষ্ট ১৯৬৩।
প্রচ্ছদ : পঞ্চানন মালাকর / **মুদ্রাকর :** গোবিন্দলাল চৌধুরী, ভগবতী প্রেস,
১৪।১, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা—৮।

সুহৃদবরেষু

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ—

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অলৌকিক জলযান

রাজা যায় বনবাসে

মানুষের ঘরবাড়ি

টুকুনের অসুখ

সমুদ্র-মানুষ

এখন এই শহরে শীতকাল। শীতের কামড় অন্য বারের চেয়ে তীক্ষ্ণ। সকালে ঘন কুয়াশা। সারা রাত উত্তুরে হাওয়ায় ঘর বাড়ি সব যেন বরফে জমাট বেঁধে আছে। রিনতি দরজা খুলে একবার উঠোনটা দেখেছিল। কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যায় না। সে আবার বিছানায় এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। মা সকাল না হতেই কাজে বের হয়ে গেছে। ওর জন্য দুখানা শুকনো বাসি রুটি রেখে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই রিনতির বড় খিদে পায়। অথচ কাঁথা ছেড়ে উঠলেই হাত পা ঠাণ্ডা—কন কনে শীতে শরীর অবশ হতে থাকে। খাবে না শরীর গরম রাখবে কাঁথার নিচে, সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

তখনই জানালায় কেউ ডাকল, রিনতি!

রিনতি বলল, কেরে?

—আমি সূর্য।

রিনতি বলল, খুব শীতরে। হা হা করতে থাকল কাঁথার নিচে।

তখন আবার জানালায় সূর্য ফিস ফিস করে বলল, যাবি?

রিনতির জানালা বন্ধ। ঝাঁপের জানালা। টালির ঘর। ছেচার বেড়া। ফাঁকফোকরে অনবরত উত্তুরে হাওয়া ঢুকছে। এই ঠাণ্ডায় সূর্য এত সকালে তাকে যে কোথায় যেতে বলছে!

রিনতি বলল, শীতে মরে যাচ্ছি।

সূর্য বলল, ওঠ না। শুয়ে আছিস কেন। শুয়ে থাকলে শীত যায় না।

রিনতি ফ্রকটার ওপরে বাবুদের দেওয়া পুরানো চাদরটা জড়িয়ে জানালার ঝাঁপ তুলে বলল, কোথায়?

—আমরা আগুন জ্বেলেছি। আয়। আগুন পোহাবি।

—সত্যি! বলেই রিনতি দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে কলতলায় দেখল সব এঁটোকাঁটা নিয়ে বিনি মাসি বাসন মাজছে। সে কি ভেবে ফের ফিরে গেল। বিনি মাসিটার স্বভাব ভাল না। দরজা খোলা পেলে কখন ঢুকে এটা ওটা চুরি করে নেবে। সে বারান্দায় উঠে

দরজায় শেকল তুলে দেবার সময় বলল, সূর্য দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। চলে যাবি না কিন্তু।

সূর্য বলল, তাড়াতাড়ি আয়।

রিনতি দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে দিল। টেনে দেখল, খুলে যায় কি না, তারপরই মনে হল, শুকনো রুটি দুটো নেওয়া হয়নি। ফের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। প্যান্টের পকেটে রুটি দুটো পুরে এবারে যাওয়া। বাইরে এসে বলল, বড্ড শীতরে—শীতে মরে যাবরে।

বাইরে বের হয়ে রিনতি পকেট থেকে একটা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিল। গোপনে খেতে হচ্ছে। সূর্যটা দেখলেই হাত পাতবে। সে যে একেবারে দেবে না, তা নয়। সে তিনবার খেলে একবার হাতে হাতে একটু একটু করে প্রসাদের মতো সবাইকে ছোঁয়াবে। এবং পকেটের এই দুটো রুটির জন্য সূর্য, গোপাল বিশু তার সারা সকালের বশংবদ, সে যা চাইবে তাই করাতে পারবে ওদের দিয়ে। সে যেতে যেতে চাদরে মুখ ঢেকে খাচ্ছিল। সূর্য আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। একটা ছেঁড়া হাফ সার্ট গায়, নিচে গেঞ্জি থাকে না, প্যান্ট তোলা। ওর মা গত বছর এই শীতেই মরে গেল বলে রিনতির একটা কষ্ট ওর জন্য বুক বেয়ে মাঝে মাঝে উঠে আসে। রিনতি ডাকল, সূর্য! সূর্য পেছন ফিরে তাকাল। বলল, আয়। রিনতি দৌড়ে গেল। বলল, হাত পাত। রিনতি পকেট থেকে রুটি ছিঁড়ে দিল একটু।

হাসপাতালের পাঁচিলের কাছে এসেই দেখতে পেল, দূরে নদীর চরে আগুন জ্বলছে। বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। মেথর-দের শুয়োরগুলিকে রিনতি খুব ভয় পায়। সে হাসপাতালের ওদিকটায় দৌড়ে গেল। সুন্দর মত বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় পাঁচিলে লাফ দিয়ে সে দেখে নেয়, মসৃণ ঘাস, বিলাতি কুকুর, মালিদের উবু হয়ে কাজ করা। শীতকাল এলেই কত সব সুন্দর বড় বড় ফুল ফুটে থাকে বাড়িটাতে। সে একটা ফুলেরও নাম জানে না। অথচ এই বাড়ির প্রত্যেকটি গাছ—তার চেনা। গাছপালা থেকে কুকুর, বেড়াল ক'টা আছে সব সে জানে। ক'জন মালি, চাকরবাকর, আয়া তাও

জানে। এবং সেই ফুলের মতো ছোট বাচ্চাটা যখন মনে লাল বল নিয়ে খেলা করে তখন রিনতির ইচ্ছে হয় বলটার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে। সে একবার লোভে পড়ে পাঁচিল টপকে নেমেও গিয়েছিল; আর তখনই হা হা করে ছুটে এসেছিল চাকরগুলি। মস্ত কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। সে যতটা দ্রুত পাঁচিল টপকে ছিল, তাড়া খেয়ে তার চেয়ে কত দ্রুত হবে জানে না, তবু নিমেষে আবার পাঁচিল পার হয়ে হাওয়া। চাকর বাকরেরা থ। একটা আস্ত শয়তানের বাচ্চা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ধর ধর করতে করতে শেষ পর্যন্ত ছুটে আর পারেনি। হাসপাতালের মরা-ঘর পার হয়ে রিনতি সোজা বাবলা বনে ঢুকে গেছিল।

এই বাড়িটার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রিনতি আজও লোভ সামলাতে পারল না। অদ্ভুত এক রহস্যময় গন্ধ পায় বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময়। পাঁচিলটা ওর মাথার চেয়ে উঁচু তবু একবার পাঁচিলে ঝুলে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেবার সাধটা কিছুতেই গেল না। কিন্তু আজ সে দেখল বাড়িটাতে কেউ নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা গেল না। কাঁচের শার্সিগুলো সব বন্ধ। বড় ফুলের চাষ হয়নি বাগানে। গাছগুলো ন্যাড়া ন্যাড়া। রিনতির এই বাড়িটার জন্যও একটা কষ্ট বুক বেয়ে উঠল। সেই যে সুন্দর মতো ছেলেটা—ওর কিছু হয়নি তো। কতদিন এদিকটায় আসেনি, সূর্য না গেলে, সে আজও আসত না। তখনই দূর থেকে সূর্য ডাকল, এই আয়। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

ঐ তো আগুন। সে এক দৌড়ে নদীর চরে নেমে গেল। আর নেমে যেতেই বিশু গোপাল যেন প্রাণ পেয়ে গেছে। দৌড়ে দৌড়ে আনছে খড়কুটো। বাবলার ঘন বন থেকে তুলে আনছে অজস্র শুকনো ডাল। এবং সূর্য শ্মশানের ওদিকটা থেকে চুরি করে কটা চেলা কাঠও নিয়ে এল। রিনতি কেমন গুম মেরে আছে এখনও। সে আগুনটার পাশে চুপচাপ বসে আছে। পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, সে একটা পা আগুনে সেঁকে নিচ্ছে, পরে অন্য পা-টা রাখছে। ফ্রক তুলে কিছুটা আগুন সাপটে নিল শরীরে।

তখন বিশু বলল, এই রিনতি যাবি ?

রিনতি বলল, কোথায়।

শীতের সময় এলে রিনতিদের কাজকর্ম কমে যায়। কারণ শীতে এই শহরটা বড় বেশী কষ্ট পায়। শীতের সকালে রিনতির উঠতে কষ্ট। আর দিনটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কোথাও সূর্য, গোপাল অথবা বিশুর সঙ্গে গেলে রাত হয়ে যায়। তবু রিনতি ফ্রকের উপর চাদর গায়ে দিতে পারে। বিশুদের তাও নেই। শীত এলেই সকালে সূর্যটা আগুন জ্বালবে, আগুন জ্বালতে না পারলে সারা মাঠে বালিয়াড়িতে দৌড়াবে। শরীর গরম করার জন্য গাছে চড়ে বসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে যাবে—তখন ওদের বুনো স্বভাবটা বেড়ে যায়। কিন্তু রিনতি তখন এভাবে ছুটতে পারে না। ওর যে কি হয়, শীত এলেই মা বকবে, রিনতি তুমি আর ছোট নেই। এবারে বড় হয়ে যাবে। সূর্য গোপালের সঙ্গে হা হা করে চলাবে না। বারণ করে দিলাম। শীতকালেই মা তার একবার ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। তখন সে কিছুদিন বের হতে পারে না। বিনি মাসির যা স্বভাব, মা বাড়ি এলে সব বলে দেয়। সেই ভয়ে কদিন জানালায় বসে থাকে অথবা রাস্তা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে আসে কথা বলতে বলতে। তারপর মা-ই আবার বলবে, রিনতি বড় গরম পড়েছে। ঢেকুর উঠছে। পেট গরম হয়ে গেছে। বিশুকে বলে দেখ না।

রিনতি বললে বিশু কী না করতে পারে! সূর্য পারে গোপাল পারে। বিশু খুব ভাল ছেলের মতো পায়ের কাছে ডাব রেখে বলবে মাসি আর লাগবে ?

—নারে! তুই কোত্থেকে আনলি ?

—এই নিয়ে এলাম। রিনতি ছিল বলে।

রিনতি বলবে, মামুর বাগানের।

মা মেয়ে এবং বিশু জানে কোথাকার কি ফল। ফলের দিনে ফল মাছের দিনে মাছ সখ যা হয় মার, যেমন মার উদাসবাবু সখ মেটানোর জন্য এই ডেরায় রোজই আসে, তেমনি বিশুরা মার খাবারের সখ

মেটায় ; তেষ্টার সখ মেটায়। সঙ্গে রিনতি থাকলে বিশুরা সব জয় করে আনতে পারে। চোখ রাঙানি মার বেশি দিন চলে না। একবার রিনতিকে লাঠিপেটা করেছিল, সে কেন উদাসবাবু এলে ঘরের বার হতে চায় না। সেজন্য উদাসবাবু এলে, সে ঘরে থাকে না আজকাল, রিনতি আজকাল যে কোন সময় বিশু গোপাল সূর্যদের সঙ্গে বের হয়ে যেতে পারে। উদাসবাবুটি বড় বজ্জাত। উদাসবাবুটি চুরি করে আসে। ওর গোঁফের একদিন পাকা লোম তুলে দিয়েছিল বলে রিনতিকে দশটা পয়সা দিয়েছিল। রাস্তায় এসেই উদাসবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে মুখ ঢাকবে। শীত গ্রীষ্মে একটা মানুষ চাদর গায়ে এদিকটায় এলে লোকে ধরেই ফেলে উদাসবাবু কোথায় যায়। বিশু তো একদিন উদাসবাবুকে গলিতে ঢুকতে দেখেই শিস দিয়ে ফেলেছিল। রিনতির কোথায় যেন লেগেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুর গালে ঠাস করে চড় কষিয়েছিল।

আগুনটা খুব জ্বলে উঠেছে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে ওরা চারজন। পাশে নদী, শীতকালে প্রায় জল থাকে না বললেই হয়। কেবল খাগড়ার দিকটায় একটু জল থাকে। এবং তখন শীতে কিছু মানুষ জন গলা ডুবিয়ে স্নান করে। একটা নৌকা নেই নদীতে। কিছু শীতের পাখি উড়ে যাচ্ছিল। আর কাঁদির বাস ধরবে বলে, নদীর ওদিকটায় একটা লোক কাপড় গুটিয়ে খেয়া নৌকায় লাফিয়ে উঠে গেল।

তখনও রিনতি কোন কথা বলল না।

—এই রিনতি ! বিশু কাঠি দিয়ে আগুন নেড়ে দেবার সময় কথাটা বলল।

রিনতি তাকাল। চোখে মুখে শীতের ঠাণ্ডা ঝাপটা মারছে। সে ফ্রক তুলে বসেছে। আগুন শরীরে বেশ উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তার ভাল লাগছিল। মনটা খারাপ, বড় বাড়িটাতে উঁকি দিয়ে কাউকে দেখতে পায়নি। এমন খোলামেলা সুন্দর বাড়ি মানুষের পড়ে থাকে খালি, কেউ নেই, কুকুর বেড়ালও না—না কি খুব শীত পড়েছে

বলে ঘুম থেকে এখনও কেউ ওঠেনি। কুকুর বেড়ালগুলিও বুঝি শীতের কষ্ট বোঝে। টের পায় শীত হাড় ফুটো করে দেবার মতো।

রিনতি এবার বলল, কোথায় যাবি ?

সূর্য বলল, 'মীরা'তে ভাল বই এসেছে।

—তোদের তো গায়ে দেবার জামা নেই। শীত করে না!

বিশু গোপাল নিজেদের জামা দেখল, প্যাণ্ট দেখল। এবং টেনে টেনে বলল, চলে যাবে।

—কি ঠাণ্ডা রে! আরো আগুন।

গোপাল দৌড়ে গেল বাবলার জঙ্গলে। সে কাঠ কুটো নিয়ে এল।

রিনতি বলল, কিছু নেই আর।

গোপাল ফুঁসে উঠল, সব শেষ করে দিয়েছিস!

—বা সেদিন তোরা ফুচকা খেলি না!

মনে আনতে পারে কিনা গোপাল চোখ বুজে বলল, তালে মাঠে মারা গেল বইটা।

সূর্যও ফুঁসে ওঠে। রিনতিকে ঠেলা দিয়ে বলল, টাকাটা সিকিটা দিই। সব শেষ!

—যখন খাস টের পাস না। ফুচকা খেলি না।

বিশু বলল, কিছুই নেই আর!

রিনতি বলল, না। তার মা সেই পয়সা থেকে কিছু সরিয়েছে। মাকে চোর ভাবতে এখনও তার কষ্ট হয়। সে মাথা নিচু করে বলল, আমার কাছে আর রাখবি না।

—তা বেশ কার কাছে রাখব বল! বলে প্রায় তেড়ে গেল সূর্য।

—ভালো মানুষ দেখে রাখ।

—তুই খারাপ, কখনও বলেছি।

—আমি খারাপ, আমার মা খারাপ।

—আমরা বুঝি খুব ভাল! রিনতি আমরাও খুব খারাপ।

—তোরা খারাপ হতে যাবি কেন। বলে রিনতি উঠে দাঁড়াল। তিরিশটে টাকা ওরা সেনেদের বাগান থেকে ডাব চুরি করে এনে

দিয়েছিল। যখন যেখানে ফাঁক মতো কিছু পায় বিশু, গোপাল, সূর্য মেরে দেয়। তারপর বিক্রির টাকা রিনতির কাছে জমা রাখে। সব যা তাদের, সবই রিনতিকে নিয়ে—ওরা তিনজন আর এই রিনতি। সেই রিনতি বলছে, কিছু নেই। রিনতি পকেট থেকে রুটি বের করে এক টুকরো মুখে দিচ্ছে। ওরা তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

রিনতি বলল, আমি যাইরে।

বিশু সহসা তখন চিৎকার করে উঠল, হাঁ হাঁ চরে বালিহাঁস বসেছে।

ওরা দেখল, সত্যি দু'তিন জোড়া বালিহাঁস ওদিকের চরটায় হেঁটে যাচ্ছে। রিনতি বলল, নে খা। সে তার দুটো রুটি ভাগ করে সবার হাতে দিয়ে দিল। তারপর বালিহাঁসগুলো দেখতে দেখতে বলল, পাখিগুলির পেছনে লাগিস না। রিনতির ভেতরে কি যেন কি হয়ে যায়। দুরন্ত সেই পাখিগুলি এখন কেমন চুপচাপ। ধ্যম দেবার মতো বসে আছে। ওদিকটায় মানুষজন যায় না। খুবই নিরিবিলি জায়গা। বিশুর চোখ চক চক করছে লোভে। সূর্য বলল, রাতে আসবি বিশু। রাতে ওরা দেখতে পায় না।

রিনতি জানে এই বালিহাঁসের দুটো একটা যদি ধরা যায়, ওরা কাল কিছু পয়সা কামাবে। বাবুরা বালিহাঁসের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। শিকারী মানুষেরা টের পায়নি, নদীর ওদিককার চরে ক জোড়া বালিহাঁস উড়ে এসেছে। কিন্তু সূর্য চুপচাপ কি ভাবছিল। ভাবছে না ফন্দি ফিকির আঁটছে কে জানে। আর রিনতির সেই যে কি হয়ে যায়, কেমন কষ্ট হতে থাকে। পাখির জীবন না টাকা পয়সা কোনটা বড় সে বোঝে না। সূর্য বিশু গোপাল যদি ভেবে থাকে, ধরবে, তবে ধরবেই। ঠিক সকালে সে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে—জানালায় ওরা তিনজন। তিন জোড়া বালিহাঁস তিনজনের হাতে। যা কিছুই করুক রিনতিকে না দেখিয়ে যাবে না। মরা বালিহাঁসের বুক থেকে রক্ত পড়ছে। এবং দৃশ্যটার কথা মনে হতেই রিনতি বলল, জানিস উদাসবাবুর গোঁফে আবার সাদা লোম হয়েছে।

সূর্য বলল, একদিন হারামিকে মারব এমন লেজি!

রিনতি বলল, দাঁতের কপাট খুলে দেব সূর্য। ওদিকে হাত বাড়াতে যাস না। তারপরই কেমন গুম মেরে গেল।—আমি জানি তোরা মারবি। তোরা সব করতে পারিস। তোরা কেবল খাই খাই করিস। এটা খাই ওটা খাই এত খেলে মরবি।

বিশু আবার হা হা করে উঠল। রিনতিরে তুই আমাদের সোনার আংটিরে।

—ওই মুখে!

—মুখে! কাজে না?

—কাল তোরা তিনটে চাদর আনতে পারবি।

—তুই বলছিস আনতে!

—বলছি।

—আনব।

—ধরা পড়বি না তো?

—দ্যাখ না।

—সূর্য বলল, আর কিছু?

—আর হাঁসগুলি মারবি না বল।

ওরা তিনজনই বলল, মারব না। তুই যখন বলছিস মারব না। তবে বাবুরা টের পেলে, সব কটা খতম হবে।

বাবুদের লোভের কথা রিনতিও জানে। সে তার বালিকা বয়সেই টের পেয়েছে ওদের খাঁই বড় বেশি। সে তখন কি ভাবল দাঁড়িয়ে। তারপর দৌড়ে নদীর খাতে নেমে গেল। বিশু সূর্য গোপাল দেখছে রিনতি চাদর গায়ে ছুটছে। ওর এক মাথা চুলের ওপর দিয়ে উত্তুরে হাওয়া ছুটছে। চুলে কপাল মুখ ঢেকে যাচ্ছে। এক হাতে চুল ধরে অন্য হাতে চাদর সাপটে রিনতি সেই নির্জন নদীর চরে গিয়ে পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিল। তালি বাজাল হাতে। পাখিগুলি ভয় পেয়ে আকাশে রিনতির মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকল।

ভারি সুন্দর দৃশ্য। সূর্য শহরের মাথার ওপর উঠে গেছে। লোকজন দূরে দূরে দেখা যাচ্ছিল। আকাশ নীল এবং বাবলার গভীর জঙ্গলে কোনো শীতের পাখি ডাকছে কুব কুব করে। হাসপাতালে কেউ মারা গেছে তখন। রাস্তায় হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

আর আশ্চর্য রিনতি দেখছে পাখিগুলি তার মাথার ওপরেই আছে। সে সরে গেলেই আবার এসে বসবে। রিনতি বার বার বলছে, যা চলে যা। তোরা চলে যা। না গেলে মরবি।

গোপাল অথবা সূর্য কেউ রিনতির কথা শুনতে পাচ্ছে না। অনেক দূরে তখন রিনতি। ঠিক একটা ডল পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। দু'হাত মাথার ওপরে তোলা। পাখিগুলি ওর মাথার ওপরে। পাখিগুলি নিয়ে রিনতি আবার একটা ঝামেলা বাধাবে বুঝি। আর রিনতির জেদ ওরা এর আগেও টের পেয়েছে। অগত্যা ওরা দৌড়াতে থাকল। হাতে ঢিল নিয়ে ওরা দৌড়াতে থাকল। তারপর দেখা গেল, শহরের চার বেওয়ারিশ বাচ্চার আপ্রাণ পাখি তাড়াবার চেষ্টা। নদীর খাত ধরে ওরা ছুটে যেতে থাকল। যেন ওরা পাখিগুলিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কত দূর দিয়ে এলে মানুষের লোভের শিকার হবে না তাও তারা ঠিক জানে না। নদী পার হয়ে গেল। জল নেই বলে, সহজেই কোথাও পা ভিজিয়ে কোথাও হাঁটু জল ভেঙে যখন নদীর ওপারে পাখি কটাকে তাড়িয়ে দিতে পারল তখন কেমন স্বস্তি। রিনতির খেয়াল হল অনেক বেলা হয়ে গেছে। মা ফিরে এসে বাড়ি না দেখতে পেলে চুল ধরে মারধোর করতে পারে। সে বড় হয়ে যাচ্ছে বলে মার কি রাগ! মা ওর দিকে মাঝে মাঝে তেরছা চোখে তাকায়। রিনতির তখন বুক কাঁপে। সে নদীর পাড়ে উঠে বলল, আমি যাই রে। বলেই এক দৌড়। কোনো দিকে এখন রিনতি তাকাচ্ছে না। রিনতির চুল, চাদর বাতাসে উড়ছে।

॥ ২ ॥

প্রবল একটা শিসে রিনতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। শিসটা কতদূর থেকে আসছে, কোথায় দাঁড়িয়ে ওরা শিস দিচ্ছে, শুয়ে রিনতি অনুমান করার চেষ্টা করল। তারপর উঠে ঝাঁপের জানালা খুলে দেখল, কেউ নেই। ঝাঁপের জানালা বন্ধ করে দিতেই আবার প্রবল শিস। রিনতি বুঝতে পারল, যত দূরেই থাক, ওর জানালা খোলা, ওরা দেখতে পেয়েছে। এত সকালে রোজ রোজ, অথচ গায়ে দেবার কিছু নেই, রিনতিকে ওরা কথা দিয়েছিল, ভাল হয়ে যাবে, ভাল হতে গিয়ে কিছুই জুটছে না। তাই রিনতি কাল নিজেই বলে এসেছিল, শীতে কষ্ট পাস না। চাদর গায়ে দে। ওরা পারে এবং সে বাইরে বের হয়ে দেখল সত্যি ওরা পারে। গায়ে চাদর দিতে পারে।

রিনতিদের বস্তির পাশেই একটা মাঠ। পরে আমবাগান এবং আরও পরে শহরের আবর্জনা ফেলার জায়গা। সব সময় একটা ভারি উৎকট দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরে থাকে। সকালের দিকে ময়লার গাড়ি-গুলি নিয়ে কিছু লোক এদিকটায় আসে। দুপুর পড়তে পাড়ার চাঁদুবাবু এক ঠোঙ্গা কচুরি কিনে নিয়ে যায়। বাবু মানুষ বলতে এ-অঞ্চলে একমাত্র চাঁদুবাবু। তার একটা ইটের ভাঙ্গা দালান আছে। তারপরই গরীব গুরবোদের বস্তি। বস্তির শেষ দিকটায় রিনতির মা রিনতিকে সম্বল করে থাকে।

মাঠ পার হয়ে আমবাগানের মধ্যে ওরা তিনজন ভারি সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনজনই তিনটে দামী শাল গায়ে যেন কিছুই দেখছে না, গাছপালা পাখি দেখছে এমনভাবে ঘোরা ফেরা করছে। আর রিনতি ধীরে ধীরে অনেকটা হেঁটে গিয়ে বলল, সাবাস। চাদরগুলো খুব দামী। পশমের। সে একবার বাবুদের বাড়ির গৌরীদির বিয়েতে এমন সব চাদর গায়ে লোকজন আসতে যেতে দেখেছে। রিকসয় বাবুদের গায়ে সাদা কারুকাজ করা শাল সে

দেখেছে। সেইসব শালের মতো হুবহু নতুন আর কি চকচকে—রিনতি বলল, তোরা মরবি।

এবং চুল উসকো খুসকো সবার। রাতে ঘুমায়নি। বোধহয় এই আমবাগানেই সারা রাত শাল চুরি করে কাটিয়ে দিয়েছে। রিনতি কাছে যেতেই বিশু ফিক করে হেসেছিল, বলেছিল, ভাল লাগছে না দেখতে ?

—খুব সুন্দর লাগছে তোদের। পায়ে জুতো লাগবে। জামা প্যাণ্ট নতুন লাগবে। তবে আরও ভাল লাগবে দেখতে। তারপরই রিনতি হাসল, হ্যাঁরে চোরের বাচ্চারা, কেউ দেখতে পেলে তোদের রক্ষা আছে! তোরা কিরে! লোকের সন্দ হবে না।

—তুই যে আনতে বললি!

—তাই বলে এমন দামী শাল!

—কেমন হবে বুঝিয়ে দিবি তো।

—গায়ে দিলে চোর বলবে রে। পুলিশ লাগবে।

—পুলিশ!

রিনতি হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। জামা প্যাণ্ট সম্বল নেই; আর গায়ে শাল, দেখলেই ধরবে। ঠ্যাঙাবে।

বিশু বলল, তাহলে রেখে দে। উদাসবাবুকে দিয়ে—

—ও বাবুটা সব মেরে দেয়। সে বলতে পারল না মাও কিছুটা মেরে দেয়। মাকে চোর ভাবতে রিনতির কষ্ট হয়। রিনতি ভাবল, তবু যা হোক করে উদাসবাবুর বিক্রির টাকায় ওদের তিনটে চাদর হয়ে যাবে। কিছু বাঁচলে একদিন রেষ্টুরেণ্টে খাবে—আর কি যেন একটা বই এসেছে—মুঘলাই আজম - বইটা ওরা চারজনে দেখে আসবে।

জঙ্গলের মধ্যে ওরা তিনজন চাদর খুলে রিনতির হাতে দিয়ে দিল। রিনতি চাদর তিনটে ভাঁজ করে ফ্রকের নিচে রেখে চার পাশটা ভাল করে দেখল, তারপর এক দৌড়ে ঘর এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার নিচে রেখে একটা দেশলাই নিল। ঘরে খাবার বলতে উদাসবাবু গত

সন্ধ্যায় কচুরি আর আলুর দম নিয়ে এসেছিল—মার জন্য সোহাগ উথলে উঠলে কচুরি আর আলুর দম আনতে ভালবাসে উদাসবাবু। রাতে রিনতির কেবল মনে হয়েছিল, ওরা সত্যি কষ্টে আছে। রিনতির এই কষ্টটাই খুব প্রবল—ওদের সঙ্গে রিনতির এত যে মাখামাখি, রিনতি এত যে ওদের ভালবাসে সেটাও একটা কষ্ট থেকে। ওরা তখন বস্তির একই বাড়িতে একই উঠোনে। সকাল হলেই ওরা হামাগুড়ি দিয়ে নেমে গেলেও সেই উঠোন। এমন একটা উঠোনেই রিনতির সঙ্গে ওরা তিনজন বড় হয়ে উঠেছিল। উদাসবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পরই মা ও-পাড়া ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকদের পাড়া ছেড়ে এদিকটায় উঠে এল। শহরের সবচেয়ে খারাপ জায়গা। চোর, বাটপাড়, উঠতি গুণ্ডা এবং বদমেজাজী লোক সব এ-অঞ্চলে থাকে। আর মাতাল লোকেরা এ-অঞ্চলে আসতে পছন্দ করে থাকে। কারণ আমবাগানটা পার হয়ে বাঁদিকের পথ ধরে গেলে তাড়িখোলা। সেখানে রাতে নেশা করে একদল লোক রোজই খোলকরতাল বাজিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে। রিনতির ঝাঁপের জানালা পর্যন্ত এসেই ওরা মাঠের মধ্যে উঠে যায়। আর দুহাত তুলে গান গাইতে থাকে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ বলে জ্যোৎস্না রাতে দেখা যায় ছায়া ছায়া কিছু মানুষের হল্লা। ওরা এলোপাতাড়ি খোলকরতাল বাজায়। মাতালেরা যেমন নেশা উঠলে লম্ফ ঝম্প করে ওরাও তেমনি। কাপড় জামা ঠিক থাকে না। গলা জড়ানো। আমবাগানের ছায়ার নিচে ভূতের মতো লাগে দেখতে। একবার দেখেছিল হল্লা করে গান গাইতে গাইতে তাদের যখন চূড়ান্ত অবস্থা তখন জামা-কাপড় ছিল না কারো শরীরে। যেন পৃথিবীতে সবই বাড়তি। শুধু খাও গাও উলঙ্গ হও এমন একটা জীবনই থাকে মানুষের। রিনতির হাসি পায়। ভারি মজা লাগে—এত রাতে লোক গুলোর হল্লা নিয়ে আজকাল আর মাথা ঘামায় না কেউ। একবার পটলাদা পাড়ার মস্তান লোকজন নিয়ে একটা মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। পরে কি হয়েছিল জানে না, পটলাদা মাস তিনেক জেল খেটে এল। সেই থেকে বোঝা গেছিল, লোকগুলি শুধু মাতাল নয়,

বাবু মানুষও বটে। কেউ আর ঘাঁটায় না। স্বাধীনতায় মানুষের আজন্ম অধিকার। কথাটা যেতে যেতে ওদের একজন বলেছিল। ভাল কথা রিনতির ভীষণ মনে থাকে। কথাটার দাম যে কত রিনতি পটলাদার তিন মাস জেল খাটা থেকে তার গুরুত্ব বুঝেছিল।

এখন রিনতি হাতে সেই বাসি কচুরি এবং আলুর দম নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বিশুর বাপটা সেদিন এদিকে ভিক্ষে করতে এসেছিল। কি একটা কাজ করত তেল কলে। ডান হাতটা নোলা হয়ে গেল বলে কাজ করতে পারে না, বাবুদেরওতো দোষ নেই—কাজ না করতে পারলে রাখবে কেন? বিশুর বাবা তারপরই গলায় তুলসীর মালা পরে ফেলল। কোত্থেকে একতারা যোগাড় করল। বিশুর মা-টা তালের ব্যাপারীর সঙ্গে চলে গেল। সমসার ভিষম ব্যাপার। বিশুর বাবার এই কথাটাও সে মনে রেখেছে। তাই রিনতির কষ্টই সম্বল। সে কষ্ট সম্বল করে ওদের সকালে কিছু খেতে দেবে বলে ছুটছিল। বাগান পার হয়ে সেই ময়লা ফেলার জায়গা থেকে ওদের ডেকে নিয়ে বলল, কি গন্ধরে। ওদিকে না এদিকে আয়। এবং খাল আছে একটা, ওটা পার হয়ে গেলে ভাঙ্গা মাঠের নিচ দিয়ে হোতার সাঁকো পর্যন্ত যাওয়া যায়। এবং বিলের ধারে একটা নির্জনতম জায়গাও আছে। ঐ জায়গায় বসে বসে খাওয়া যাবে। এবং মার এত দামী খাবার সে চুরি করেছে বলে, কিছুই বলবে না। তিনটে চাদর বিক্রি করে উদাসবাবু যা টাকা পাবে তার সিকিভাগ মার। দু' আনা পাবে রিনতি। ঐ দু' আনা দিয়ে সে সহজেই ওদের জন্য মোটা সুতোর চাদর কিনে দিতে পারবে।

রিনতি বলল, নে খা। সে ভাগ ভাগ করে দিল।

জায়গাটা যথার্থই নির্জন। বড় একটা অশ্বত্থ গাছের পরেই জঙ্গলটা আরম্ভ হয়েছে। শহরের পাকা রাস্তা কাশিমবাজারের দিকে গেছে। দু-পাশে পাটের আড়ত। আড়তের পেছনে যে বড় জঙ্গলটা রয়েছে এখন তারা সেখানে কলাপাতা নিয়ে বসে গেছে। রিনতি ওদের তিনজনকে তিনটে করে কচুরি দু টুকরো করে আলুর দম খেতে দিল।

গোপাল বলল, এরে কয় ভোজন। লিখে রাখ বলে যে খারাপ কথা উচ্চারণ করল সেটা ভদ্রলোকের সাহিত্যে অচল। সুতরাং কথাটা লিখে রাখা গেল না। লিখে রাখলে বোঝা যেত স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র মানুষকে কত বেশি অধিকার দিয়েছে।

বিনতি বলল, মুখ খারাপ করবি না গোপাল। সমঝে কথা বল।

বিশু ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গেল। বলল, আমি কিছু বলেছি!

—বলিস নি বলবি।

—তুই থাকলে খারাপ কথা বলি!

—বলিস। তবে এখন আর বলবি না। মা বলেছে আমি বড় হয়ে যাব এখন। বড হলে মন্দ কথা শুনতে নেই। খারাব হয়ে গেলে মার কোন আশা থাকবে না। উদাসবাবু বলেছে, আমাকে পড়াবে। বই কিনে দেবে। বইয়ে কোন খারাপ কথা লেখা থাকে না।

—আমাদের কথা লেখা থাকে না?

—হেই গেলরে ধম্মের ঘোড়া, বলে কিনা বইয়ে আমাদের কথা লেখা থাকে না! তুই বে আস্ত বই চোখে দেখেছিস। আমি দেখেছি। উল্টে পাল্টে দেখেছি। আমাদের আরতিদি, উরে মার বাবুর বাড়ির দিদি লুকিয়ে একটা বই আনিয়েছিল। বইটা খুলে দেখি নেংটোরে।

রিনতি বলল, গোপাল তুই ফেব খারাপ কথা বলবি...।

—নেংটো কথাটা খারাপ নারে রিনতি। বিশু তুই বল, কথাটা খুব খারাপ! গুরুজন কারে কয়, গুরুজন হল গিয়ে মা বাবা। বাবা সেই যে একটা ঠাকুরের গান গায় না? গানে কথাটা আছে। গুরুজনেরা গায়। নেংটা কথাটা আমরা বললে রিনতি তোর কষ্ট হবে কেন? তুই এত কষ্ট দিয়ে কি করবি? আমরা যদি বলি, ন্যাংটা হয়ে তুই নাচ খুব খারাপ কথা হবে! তুই ন্যাংটা থাকলে খারাপ হবে কেন রিনতি।

বিশু বলল, রিনতিরে তুই যে সোনার আংটি। সোনার কোন

'সূর্য ক্ষেপে গিয়ে বলল, হারামজাদারা যে খাওয়ার জোগাড় তাই পাচ্ছে...ই বাকিটুকু রামখিস্তি। উচ্চারণ করা যায় না বলে লেখা গেল না।

তখন রাস্তায় সার-সার গরুর গাড়ি যাচ্ছে। ট্রাক যাচ্ছে পাট বোঝাই হয়ে। শহরের বাজারে যাচ্ছে। কোথা থেকে আসে, কারা খায় তার কিছুই জানে না এরা। বড় হতে হতে শুধু দেখেছে বড় হাহাকার খাবারের। খাবার বাদে পৃথিবীতে তারা আর যা আবিষ্কার করেছে তার নাম মুঘলেই আজম, আরও সব বই, ছবি বলে মানুষে, ওদের ছবি দেখার সৌভাগ্যটা খারাপ না। কেমন সুন্দর শহর বাড়ি ঘর, পাহাড়ের দৃশ্য, মারামারি খুনোখুনি—নেশার মত লাগে। খেতে যদি নাও পায় দুঃখ থাকে না। ছবি বাদ গেলে ওদের তিনজনেরই কষ্ট উথলে ওঠে। চুরি-চামারিটা একটা বিদ্যার মতো মনে করে থাকে। যে যে-ভাবে পারে ফল পাকুড় আনাজ তুলে আনে, এবং বাজারে বিক্রি করে দিয়ে আসে। ওতে আজকাল আর কুলোয় না। এই যে শীতটা এবারে এত জবর পড়বে তারা বুঝতেই পারেনি। বিশুটা চুলে আজকাল চিরুনী দেয়। শহরের দোকানগুলির সুন্দর আয়নায় প্রতিবিম্ব ভেসে উঠলে নিজেকে দেখে নেয়। এবং বিশুটাই একমাত্র জামাকাপড়ে বাবুদের মতো থাকতে চায়। হলে কি হবে পারে না। সবার জন্য সমান, কেউ বেশি না কম না এবং বড় হতে হতে হাফ-প্যান্টের পকেটে সে একবার এক প্যাকেট সিগারেট লুকিয়ে রেখেছিল। সূর্য দেখেছিল পকেট ভারি বিশুর। লুকিয়ে-চুরিয়ে খাচ্ছে না তো! সে হাত দিয়েই অবাক। সিগারেট। চোখ বড় বড় হয়ে গেছিল। ওরা একটা আশ্চর্য জগতের সন্ধান পেয়ে সারাদিন সিগারেট ফুঁকেছিল নদীর চরে। বনে জঙ্গলে রাস্তায় যেখানে কেউ নেই তারা সেখানে। এবং এই করে আলাদা মজার খবর পেয়ে যেতেই এখন তারা বিড়িটিড়ি খায়। তার জন্য পয়সা লাগে। এত পয়সা তিনজনে রোজগার করতে পারে না। প্যান্ট সার্ট কবেকার তারা মনে করতে পারে না। গায়ে কিছু থাকলেই হল। শীতটা

জব্বর পড়ে যেতেই ওরা বুঝতে পারল, কষ্টটা দূর করার মতো সম্বল তাদের নেই। সারা রাত শীতে গাড়ি বারান্দায় কারু, কখনও কোন পরিত্যক্ত ভাঙ্গা আবাসে, চটের নিচে খড় বিছিয়ে ছেঁড়া কাঁথা কম্বল যা পেয়েছে তার ভেতর এই তিন বেওয়ারিশ বাচ্চা বড় হচ্ছিল। একবার বিশু বাপের খুপরি ঘরে গেছিল থাকতে। সূর্য গোপাল সঙ্গে। বাপ গুণধর সূর্য, গোপালকে দেখেই ক্ষেপে গিয়েছিল। গুণধর লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল সূর্য, গোপালকে। ছেলেটাকে বে-জম্মার বাচ্চারা নষ্ট করে দিচ্ছে।

সামান্য খেয়েই ঢেকুর তুলল তিনজন। বেশ একটা ভোজের মত। শীতকালটাতে এমনভাবেই চলবে। বিশু মাঝে মাঝে বাপ ঘরে না থাকলে বাড়ি যায়। একবার তালা টানতেই খুলে গিয়েছিল। পাশে হরিপদর ঘর। রিকসা চালায় শহরে। বাবা বাড়ি না থাকলে হরিপদর বৌ চোখে চোখে রাখে সবকিছু। মোট তিনবার গুণধরের টাকা চুরি গেছে। যা কিছু রেজকি গুণধর এই দু-পয়সা পাঁচ পয়সা, ভিক্ষায় যা পায় সঞ্চয়ের কড়ি টোফায় রেখে দেয়। আর তিন-তিনবারই ওটার মাল কড়ি চুরি গেছে দেখে গুণধর সতর্ক থাকে আজকাল। বেড়াটা শক্ত করে বাতা দিয়ে বেঁধেছে। ঝাঁপের দরজায় কার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে লোহার শেকল লাগিয়েছে। এবং আজকাল বাপ গুণধর তালা মেরে যায় বলে বিশুর ঘরটার প্রতি আকর্ষণ একদম কমে গেছিল। কিন্তু কিসে কি হয়, কখন মনে পড়ে যায় মার মুখ সে মার খোঁজে চলে যায়। বলা যায় না তার জন্য মা-টা আবার ফিরেও আসতে পারে। আর যখন যাওয়া হল দেখা যাক—কি আছে ঘরটাতে—বাপ তো সেয়ানা, বেমক্কা তালা ঝুলিয়ে দু'পায়ে দু'রকমের জুতা পরে বের হয়ে গেছে। তবু বাপের ঘরবাড়িতে তার অধিকার, হরিপদর বৌ হরণ করে নেবে সে সয় না। সে বাপের লাউ গাছটায় ভাঙ্গা মাটির কলসিতে জল দিতে দিতে ফন্দি আঁটে। মাঝে মাঝে কখনও সেই সুযোগ মতো তালা ভেঙ্গে বেড়া ফাঁক করে খুপড়ি ঘরটাতে হামা দিয়ে ঢুকতে পারলেই বাপের ধনদৌলতের

খোঁজ পেয়ে যায়। এবং তিন তিনবার সে একরকমভাবেই চুরি করে নিয়ে গেছে বাপের রেজকি পয়সা। সেবারও ভেবেছিল কিছু পাবে। ঝাঁপের দরজা ঠেলে ইঞ্চি চারেক শরীরটা গলাতে পেরেছিল, তারপরই কেমন হড়কে সে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না ভেতরে কেউ আছে। কিন্তু হায় টোফায় কিছুই নেই। টোফা ভর্তি রুটি হোটেল-ফোটেলের বাসি পচা মাংস জিলিপি প্রায় সে মাথায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সব। এবং বাপের বুদ্ধি দেখে সে তাজ্জব। এত খাবার যখন, তখন তারাও তো পারে সকলেই পেট পুরে খেতে। খাবারের সমস্যাটা বিশু একদিনে বিলকুল সমাধান করে ফেলল। বাড়ি বাড়ি অথবা হোটেলের দরজায় হাত পেতে শুধু বসে থাকা। চলছিল ভালই—কিন্তু হারামী এই রিনতিটা। ভিক্ষা করবি কিরে। মানুষের বাচ্চা না তোরা। মানুষের বাচ্চা ভিক্ষা করলে ভগবান রাগ করে। চুরিচামারি করে খা। ইজ্জতের কথা তুলতেই সূর্য, গোপালও রিনতির পক্ষ নিয়েছিল। খেটে খা। কাজ নেই তো খই ভাজ। তবু হাত পেতে দান নিস না। দান নিলে পাপ হয় জানিস।

রিনতি বলল, নে এবারে হাত ধুয়ে আয়।

সামনেই বিলের জল টল টল করছে। তবু ওরা কেউ হাত ধুতে গেল না; প্যাণ্টে হাত মুছে ফেলল।

রিনতির রাগ হল ভারি।—তোরা বড় নোংরা। বললাম হাত ধুতে আর প্যাণ্টে মুছে ফেললি!

ওরা গ্রাহ্য করল না। রিনতির সব কথাই শুনতে হলে ওরা বাবু মানুষের ছা হয়ে যাবে। রিনতি সব সময় চায়, ওরা ভাল থাকুক। ভাল থাকার জন্য রিনতির বুদ্ধি বিবেচনা ওদের চেয়ে অনেক প্রবল। ওরা বেশ এখন সব কিছুতেই বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছে। ডালপালা ভেঙ্গে ওরা সবাই মিলে কিছুক্ষণ সমস্বরে গান গাইল। হিন্দি গান, থোড়া হাঁটকে থোড়া বাঁচকে—এবং ওরা এ-ভাবেই যখন লাফিয়ে লাফিয়ে সদর রাস্তায় এল, দেখতে পেল একটা লোক চাদর

মুড়ি দিয়ে গাছতলায় বসে আছে। লোকটা এ-শহরে ইদানি আমদানি হয়েছে। বিশেষ করে তাদের পাড়ায় কদিন ঘুর ঘুর করেছে। থুতনিতে দাড়ি। গোঁফ ঝুলে আছে। এক রাশ চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। একবার দেখলেই লোকটাকে মনে রাখা যায় সূর্য দেখেই বলল, আরে ঐ লোকটা একদিন ফাঁকা দেয়াল দেখে নিবিষ্ট মনে কি সব হাবিজাবি লিখে যাচ্ছিল। ওদের চারজনকে দেখেই বলেছিল, পড়তে পারিস।

ওরা ঘাড় নাড়িয়ে বলেছিল, না, জানি না।

—পড়তে জানিস না! খুব খারাপ কথা। বই লেখা হয় দিনে কত জানিস!

কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ওরা।

—আমি একটা বই লিখছি!

—বই!

—হ্যাঁরে বই। ফাঁকা দেওয়াল পেলেই লিখে যাচ্ছি। কৃষ্ণনগরে তিন লাইন লিখে রেখে এসেছি। তারপর লোকটা আরও অন্য অনেক জায়গার নাম করেছে। সব তাদের মনে নেই। দু'লাইন চার লাইন করে লেখা তার অনেক গাঁ গঞ্জ শহরে দেয়ালের গায়ে ফুটে আছে। মানুষ একদিন ঠিক পড়বে। শহর গ্রামগঞ্জ যেখানে যা পেয়েছে লিখে রেখে এসেছে। কিছু না পেলে গাছে। বৃক্ষের শাখায় লেখা আছে। বাগানের মধুবাবুর জঙ্গলে লেখা আছে। মধুবাবুর জঙ্গলে কথাটা মনে ছিল তাদের। এখানে হোতার সাঁকোর নিচে বট গাছের গোড়ায় একটা শানে আজও কিছু লিখতে লিখতে ওদের দিকে তার চোখ পড়ে গেল। আরে তোরা?

রিনতি বলল, বই লিখছেন?

—লিখেছি, বলে সে হরফ গুণে বলল, এখানে সতেরটা অক্ষর আছে। অক্ষর বুঝিস।

সূর্য একটু উবু হয়ে বসল।—কৈ দেখি?

—অর্থ বুঝিস?

সূর্য দু'হাতের ওপর গাল রেখে বুড়ো মানুষের মতো খুব মগ্ন হয়ে দেখল, এটা তুমি উ লিখেছ।

—ঐ তো পারিস।

বিশু বলল, আমাদের সূর্যটাই লেখাপড়া জানে। খুব ওর বিদ্যে। সসাগরা ধন্যি মানুষ।

রিনতির সহ্য হল না কথাটা। সে বানান করে পড়ার চেষ্টা করল। সূর্যর পাশে সেও উবু হয়ে বসে পড়তে লাগল, উ দয় আকারে দা 'স' দীর্ঘ-ই কারে সী দন্তন্য। কি হল যেন, বলেই রিনতি মাথায় টোকা মারল একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ উদাস।

বিশু বলল, তোর মাথা। তারপর সেও হাঁটু গেড়ে বসল। রিক্সা ট্রাক গরুর গাড়ি যাচ্ছে, অনবরত ধুলো উড়ছে, ওদের মুখ এবং চুল লাল ধুলোয় ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। রিনতির চুলের বিনুনিতে রোঁয়া রোঁয়া সব ধূসর ময়লা। রিনতি জানেই না ওর মাথায় কখন কাগে হেগে রেখেছে। সে নুয়ে পড়তেই বিশুর মনে হল ঐ উদাস ছাড়া রিনতির মাথায় এখন আর কিছু নেই। তিনটে শাল, কাল শীতের শালওয়ালাকে ভড়কি মেরে চরকি ঘুরিয়েছে সেটাও এখন উদাসবাবুর হেফাজতে চলে যাবে। কাজেই রিনতির আর দোষ কি! সে এবার রিনতি না বলে বলল, রিন্টি। রিন্টিও ইস্কুলে পড়েছে দাদা।

দাদা কথাটা খুব ভাল লাগল লোকটার। একজন উ চিনতে পেরেছে, একজন সবটাই বানান করতে পেরেছে—শুধু সবটা মিলে যা হয় তা ঠিক বলতে পারেনি। সে তাই এবার একটা ইট দিয়ে জোরে জোরে ঘসে ঘসে বড় বড় হরফে লিখে গেল। বলল, এখন দেখত পড়তে পারিস কি না! সূর্য উ-তেই ঠেকে থাকল। রিনতি সবটা বানান করতে পারল কিন্তু পড়তে পারল না। তখন লোকটা উঠে ওদের পাশে গোঁজ হয়ে বসে ফিস ফিস গলায় বলল, লিখেছি উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়।

গোপাল বলল, সে কি রে বাব্বা।

সূর্য বলল, বড় আচানক কথা।

বিশু কিছুক্ষণ চোখ বুজে বলল, আমার বাপ গুণধর একতাবা বাজায়। উদাসীন মাঠে বেহালা বাজায় কেউ শুনিনি তো দাদা। গুল মারছেন কেন! মারব লেঙ্গি।

গুল আমি মারছি নারে। সত্যি কথাই বলছি। দেখবি সবই সত্যি হবে। সত্যি কথা কে না শুনতে চায়। রিনতি বলল, ওদেব কখনও ভাল হবে?

—ভাল আলবৎ হবে।

—ওর নাম সূর্য। ওর মা ছিল। গত সালে শীতে মরে গেছে। কেউ নেই।

—কেউ না থাকলে কি হয়েছে! হাত পা চোখ আছে। মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু দরকার নেই। রিনতির কাছে লোকটা সাধু সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য একটা কথা লিখে রেখেছে—শানে—উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়। কথাটার মধ্যে রিনতির সেই কষ্টটা নড়ে চড়ে ওঠে। বিশ্বাস প্রবল হয়। ওর ভাবনা এই অপোগণ্ড তিনজনকে নিয়ে। সে বলল, বাবাজী আপনি ভারি ভাল মানুষ। ওদের দেখে বলে দিন তো মানুষ হবে কি না।

লোকটা বলল, তোমার নাম কি?

—আমাকে মা রিন্টি ডাকে। ওরা ডাকে রিনতি।

—রিন্টি, রূপকথার আংটি। আংটি তুমি কার, যার হাতে আছি তার।

বা সুন্দর কথা তো। রিন্টির গাটা কেমন শির শির করে উঠল। বলল, আর লিখবেন না?

—না আজকের মতো লেখা শেষ। ধান্দায় বের হতে হবে। বলে পেট বাজিয়ে দেখাল।

—খাবেন?

—খাব না তো বলিনি।

রিনতি বলল, ইস একটু আগে বললে কচুরি আলুরদম খাওয়াতে পারতাম।

কচুরি আলুরদমের কথায় লোকটার জিভে জল এসে গেল। কচুরি আলুর দম এখনও পাওয়া যায়!

সূর্য বলল, যা বাব্বা! তাও খবর রাখ না, আর গুল মারছ বই লেখ।

—অনেক খবরই আমরা রাখি না। তুই খবর রাখিস ঝিনাইদতে তেল বিক্রি হয়।

—সব জায়গাতেই হয়। ঝিনাইদতে শুধু হবে কেন?

—সে তেল আর এ-তেল এক নয়রে। তেলের দাম আলাদা, তেল কেনার আদব কায়দা আলাদা, মাখার কায়দা আলাদা।

—আর কি বিক্রি হয়?

—মরা মানুষের ছাল বিক্রি হয়।

রিনতির পিত্তি জ্বলে গেল। মাথা খারাপ আছে লোকটার। বলল, বাবাজীর মাথায় গণ্ডগোল নেইত!

—গণ্ডগোল থাকলে আলুর দমের কথায় জিভে জল আসে?

লোকটা জিভ বের করে দেখাল। জলে টস টস করছে জিভটা। ভীষণ লাল। ঠিক কুকুরের জিভের মত। তারপর উঠে দাঁড়াল। গায়ে ময়লা চাদর, ছেঁড়া লুঙ্গি। অনেক দিন ধরে লোকটা স্নান-টান করে না। চুলে জট ধরে যাবার মতো। দাড়ি টাড়ি রেখে বিশুর বাবার মতো হয়ে গেছে।

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, এখানে এখনও সূর্য ওঠে দেখছি। এইসব কথা শুনতে খারাপ লাগে না। লোকটা অদ্ভুত সব কথা বলছে। কোথায় যেন ভাল লাগে। এবং রিনতি বলল, কোথায় যাচ্ছ? তোমার বাড়ি কোথায়! কে আছে তোমার? এতগুলি প্রশ্ন তাকে এমনভাবে অনেকদিন কেউ করেনি। সে রিনতির দিকে তাকাল। এবং লম্বা হয়ে হাত পা মেলে দিল বাতাসে। তারপর ঢোক গিলে বলল, কচুরি আলুর দম খাব। এখানে যখন এখনও পাওয়া যায় ছাড়ি কেন?

ওরা লোকটাকে নিয়ে বেশ মজা ভোগ করছিল। গোপাল কি ভেবে লোকটার লুঙ্গি ধরে টান মারল। প্রায় খুলে যাচ্ছিল লুঙ্গি,

কোনরকমে ধরে ফেলল লুঙ্গিটা। বলল, সব মানুষ নষ্ট হয়ে গেলরে। তোরা এত ভাল থাকলি কি করে!

বিশু চুল টেনে ধরল গোপালের—হারামিপনা করছিস কেনরে। ও-তো ভাল লোক আছে।

রিনতির কষ্ট হচ্ছিল। সেই কষ্টটা আবার বুক বেয়ে উঠছে। কতদিন না খেয়ে আছে কে জানে। রাস্তায় কত লোকজন! একটা লোক এক ঝুড়ি মুরগির ডিম নিয়ে যাচ্ছে। দু'জন লোক বাজার করে ফিরছে। পালং শাক আর বাঁধাকপি ঝোলা [illegible] মুখ বার করে রেখেছে। ভাঙ্গা বাড়ি ঘর, নতুন দালান কোঠা, তেলেভাজার দোকান আর মানুষজন চলছে অথচ একটা মানুষ এই গাছপালার মধ্যে অন্নহীন। রিনতি বলল, আমার সঙ্গে যাবে? খেতে দেব।

বিশু বলল, কি খাওয়াবিরে? আমরা খাব না।

রিনতি ওদের কথায় কর্ণপাত করল না। কিন্তু লোকটা বলল, লেখা বাকি কত। কতজন ভাল মানুষ আছে শহরে আমি জানি। গুণে দেখেছি দুশ তেত্রিশ—তোরা চারজন মিলে দুশ' সাঁইত্রিশ। দুশ' সাঁইত্রিশ হাজার লক্ষ ভাল মানুষ ভারতবর্ষে বড় হয়ে উঠছে। দেখবি একটা কিছু হবেই। নষ্ট মানুষেরা বেশিদিন আর নেই।

রিনতি বলল, যাবে আমাদের সঙ্গে? তোমার ভ্যানর-ভ্যানর শুনতে আর ভাল লাগছে না। লোকটার মুখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে আর একটা কথাও বলল না, হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকল। রিনতি, বিশু, গোপাল, সূর্য দৌড়েও ওর নাগাল পেল না। খুব বড় বড় পা ফেলে ঠিক সূর্যকে বগলদাবা করার মতো লোকটা ছুটছে।

॥ ৩ ॥

রিনতি চুপি চুপি খুব সতর্ক পা ফেলে উঠোনে উঠে এল। না, মা এখনও ফেরেনি। সে দেখল, বিনিমাসি গা খুলে কলতলায় স্নান করছে। হাতে পায়ে সাবান মাখছে। বিনিমাসির পাশের ঘরে

আলোদি। আলোদি এখনও ঘুমোচ্ছে। সারারাত আলোদির ঘরে হল্লা হয়েছে। তিনটে মাতাল সারারাত কি যে করে গেছে। জানালায় মুখ রেখে একবার দেখতে ইচ্ছে হল আলোদিকে। সবাই আলোদিকে হিংসা করে। ভাল খায়, সাজে ভাল, চুলে গন্ধ তেল মাখে, আর রুজ লিপিস্টিক মেখে যখন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে তখন বাবুদের মেয়েরা পর্যন্ত লজ্জা পায়। খুপরি ঘরগুলির মধ্যে আলোদিকেই তার বড় বেশী ভাল লাগে। আলোদির ফুট-ফরমাস সে খাটে। কোন কোন দিন আলোদি সিনেমায় তাকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। এবং আলোদির ধরাবাঁধা বাবু নেই। যেমন মার আছে, বিনিমাসির আছে—মাতো আবার সকালে বাবুদের বাড়ি কাজ করে। বিকেলেও যায়। উদাসবাবু ভারি কিপটে লোক—কি যে আছে, উদাসবাবু পোড়া বিড়ি খায় পর্যন্ত তবু উদাসবাবু না এলে মার ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে খুবই টানাটানির কথা বলে। মা উদাসবাবুকে কোন কষ্ট দিতে চায় না। দয়া করে যে উদাসবাবু এখনও আসে এতেই মা ভীষণ খুশী। রিনতির মনে হয়, না জানি উদাসবাবু শেষ পর্যন্ত লোটাকম্বল নিয়ে এখানেই চলে আসে! যা স্বভাব মানুষটার। আর মাও তখন খুশী হয়ে না ভেবে বসে, যাক একটা লোক তো থাকল। কম কি। যা দিনকাল! আর মানুষজন বড় বেশি চোর বাটপাড় হয়ে উঠেছে। তাতে করে উদাসবাবুর মতো একটা লোক পাশে থাকা ভালো। মার এখন উদাসবাবুই সম্বল।

আলোদির জানালা বন্ধ। আলোদি সকাল সকাল স্নান করে নেয়। শীত গ্রীষ্ম মানে না। তারপর মটরদা বাজার ফিরতি কলাপাতায় ফুল এনে দিলে, ঠাকুরের ফটোতে দিয়ে উবু হয়ে প্রণাম করে। মটরদার ঠাকুমা বুড়ি থাকে শেষের ঘরটায়। সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। এই খুপরি ঘরের ভাড়া তুলে যা আয় তাতে চলে যায় দু'জনের। আলোদির সঙ্গে মটরদা কথা বলে না। আলোদি পয়সা দেবার সময় বলে, এই থাকল। ফুল বেলপাতা লাগবে। এখন অবশ্য ফুল বেলপাতাও

বলতে হয় না, এই থাকল বললেই হয়ে যায়। মটরদাকে দিয়ে আর কোন কাজই আলোদি করায় না। আলোদির খাওয়া-দাওয়া যা কিছু রাতে। মক্কেলদের পয়সায় সব আসে। চুল পাট করে গোবিন্দ বসে থাকে দরজায়। ফিটফাট বাবু। যে-ঘর থেকে ডাক আসে সে তারই দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে টাকা-পয়সা নেয়। এবং দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে। গোবিন্দ আসে পাঁচটা বাজলে। তখন আর মটরদা বাড়ি থাকে না।

ফুলপিসির ঘরটা বিনিমাসির লাগোয়া। সামনের ছুটো দাঁত সোনা দিয়ে উঠতি বয়সে কেউ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। এখন পড়তি বয়স। তবু সাজতে জানে। গোবিন্দ ফিকিরবাজ, সে বোঝে কাকে দিয়ে কি করানো যাবে। কমতি পয়সার বাবুরা ফুলপিসির খদ্দের। একবার ফুল পিসি একটা লোকের টাকা-পয়সা ছিল না বলে জামা-কাপড় খুলে রাখতে চেয়েছিল। তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হামলা। গোবিন্দ সবদিক তখন সামলায়। রোয়াব ভীষণ। পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে। পুলিশকে হাত করার ফন্দি-ফিকির তার সব জানা। এবং বাড়িটাতে রিনতিই একমাত্র বালিকা, সে বড় হচ্ছে।

রিনতি দরজা খুলে চাদরটা দড়িতে ভাঁজ করে রাখল। সকালে শীতের রোদে ঘুরে ঘুরে বেশ গরম লেগে গেছে। সে দরজার পাশে এসে দেখল, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। বিনিমাসি ঘরে ঢুকে যাবার সময় বলল, রিনতি সদর বন্ধ করে দে। কুকুর বেড়াল ঢুকবে। রিনতি দৌড়ে গিয়ে সদর বন্ধ করে দিয়ে এল। উঠোনে শীতের রদ্দুর। বুড়ি তামাক পাতা মুখে দিয়ে বসে আছে। ঝিমুচ্ছে। ঘরে মটরদা খুন্তি দিয়ে ভাজা-ভুজি উল্টে দিচ্ছিল, তার শব্দ আসছে। সে একবার ঝাঁপের দরজায় উঁকি মারল। মার আসতে ছুপুর হয়ে যায়। বাবুদের উচ্ছিষ্ট খাবার-দাবার আনার লোভে দেরি করে ফেরে। একটা বড় কলাই করা থালায় ভাত, তরকারী যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে মা তুলে নেয়। ওদের ছু'জনের পেট ভরে যায়। বিকেলে কিছু আসে না। কটা রুটি সম্বল করে মা ফিরে আসে। উদাসবাবু

এলে মুড়ি মটরভাজা ফুলুরী হয়। সবাই মেখে তখন একসঙ্গে খায়। তার বিছানা বারান্দার একপাশে করে দেওয়া থাকে। উদাসবাবু চকিতে পা তুলে বসলে সে আর ঘরে ঢুকতে পারে না। আগে রাগে অভিমানে চোখ ফেটে জল আসত রিনতির। এখন সয়ে গেছে সব।

কি ভেবে দরজাটা বন্ধ করে দিল রিনতি। জানালার কাছে গেল। ময়লার গাড়িগুলি ফিরে যাচ্ছে। কাক উড়ছিল। শকুন দুটো একটা গাছের মগডালে বসে আছে। পচা দুর্গন্ধটা শীতের সময় বেড়ে যায়। উত্তরের শীতে গন্ধটা সারাটা সকাল আকাশে-বাতাসে ভুরভুর করে। নাকে সব সয়ে গেছে। এরই মধ্যে খায় দায় ঘুমোয়। দক্ষিণেব হাওয়া বইতে শুরু করলে গন্ধটা আর থাকে না। তখন রিনতির মনে হয় বড় সুসময়। নদীতে সাঁতার কাটতে চলে যায়। সঙ্গে যায় সূর্য-বিশু-গোপাল।

রিনতি তোষকের নিচ থেকে চাদর তিনটে টেনে বের করে এবার খুলে দেখল। মা আজ রিনতিকে ভীষণ আদর করবে। এবং স্নান-টান করিয়েও দিতে পারে। হাতে পায়ে তেল মাখিয়ে দিতে পারে। মাথায় চিরুনী দিতে পারে। চুল সাবানে ঘসে, সুন্দব ফ্রক গায়ে দিয়ে আজ আবার দেখতে পারে সে কত বড় হয়েছে। তার বড় হওয়া নিয়ে উদাসবাবুর সঙ্গে কি সব সলা হয়। সে শুনতে পায় না। খুব নিচু গলায় মা উদাসবাবুকে বলে, পোড়ারমুখী যে কবে বড় হবে?

সে বুঝতে পারে মার কপাল তার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে। মাঝে মাঝে শুনতে পায়, সে কান খাড়া করে রাখে, কম্বলের নিচ থেকে মুখ বার করে শুনতে পায় মা আর উদাসবাবুর কথা।

—রিনতির মুখ আমার কি মিষ্টি!

উদাসবাবু হা হা করে হাসে। মজা! মজা।

এই দুটো শব্দই তার কানে আসে। বুকটা কেঁপে ওঠে রিনতির। কি মজা, কিসে মজা সে ভেবে পায় না।

এবং তখনই মনে হয় সদর দরজায় মার গলা। মা খাবার থালা হাতে নিয়ে ঢুকছে। কলাপাতায় ঢাকা। এই সময়টার জন্য রিনতি

কখন থেকে যেন অপেক্ষা করে থাকে। মার হাত থেকে সে থালাটা নামায়। কলাপাতা তুলে দেখে মা আজ কি কি নিয়ে এসেছে। সে দুটো একটা আলুর টুকরো পটল ভাজা, মাছের হাড় তুলে মুখে ফেলে দেয়। আহা কি সুগন্ধ, কি সুস্বাদু খাবার! তখন চানের তাড়া, কলতলা থেকে দু'ঘটি জল ঢেলে একটা গামছা পেঁচিয়ে ঘরে চলে আসে। কতক্ষণে খেতে বসবে, সে মার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। আজ আবার আরও বড় সুখবর—মা এলেই দেখাবে, সেই কখন থেকে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে চাদর তিনটে নিয়ে। থালাটা নামিয়ে রাখল, কলাপাতা তুলে দেখল না—বরং সে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল। বলল, মা ছাখ ছাখ! ছাখ না। তিনটে চাদর।

—চাদর কি রে!

—হ্যাঁ মা। বিশুরা তিনটে শাল চুরি করে রেখে গেছে।

—পূর্ণিমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বলল. সত্যি?

—এই যে ছাখ না!

—আর ব্যাস। কি হবেবে বিনতি!

—হিস্‌স শুনতে পাবে।

পূর্ণিমা চাদরগুলি নিয়ে প্রথমে পাড় দেখল, জমিন দেখল।

তারপর ফিসফিস গলায় বলল, কোত্থেকে এনেছে।

—শালয়ালার কাছ থেকে।

—ওরা কত নেবে বলেছে

কত নেবে তাতো জানে না রিনতি। শুধু তিনটে চাদর চাই মোটা সুতোর। শীতে কষ্ট পাচ্ছে বলে রিনতি ওদের চাদর গায়ে দিয়ে আসতে বলেছিল। তাই বলে এমন দামী শাল, কত দাম হবে রিনতি জানে না, তবু রসিকবাবুর মতো মানুষের গায়ে সে এ-রকমের শাল দেখেছে। রসিকবাবুর চালের আড়ত আছে, আখের মাড়াই আছে, দুবিঘে জমির ওপর চক মেলানো বাড়ি, দাসী, বাঁদী চাকর-বাকর গাড়ি সব আছে রসিকবাবুর। সেই থেকে রিনতি বুঝেছে খুবই

দামী জিনিস। ও চাদর গায়ে দিলে ধোলাই খাবে বিশুরা। ধোলাই খেলে কার না কষ্ট হয়।

পূর্ণিমা ফের রিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কত নেবে বলল ?

রিনতি কত বলবে বুঝতে পারছে না। স্মৃতির চাদরের দামই সে জানে না। যাহোক অন্তত এই তিনটে চাদবের বদলে আবার তিনটে চাদর কেনার পয়সা তাব চাই। সে বলল, বিশু তো বলেছে, দাম খুব। উদাসবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখ না।

পূর্ণিমা ভাবল, এই নিয়ে আর কিছু এখন বলা ঠিক হবে না। হাতে যখন এসে গেছে তখন একটা কিছু হিল্লে হবেই। সন্ধ্যায় উদাস-বাবু এলে দেখাবে। এবং এই থেকে মোটা একটা টাকা পাওয়া যাবে ভেবে পূর্ণিমা মেয়েকে আদর করে ডাকল, রিন্টিরে চান করে আয়। খিদে পায় না।

রিনতি দেখল, মা চাদর তিনটে সন্তর্পণে ভাঁজ করে পেঁটরায় ভরে রাখছে। সারা সকাল রিনতি বাড়ি ছিল না, থাকেও না, টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, এখানে সেখানে বাজারে, নদীর পাড়ে এবং কোথায় যে না চলে যায়। ঐ তিনটে বিচ্ছুর সঙ্গে রিনতির কবে থেকে ভাব। এবং ঐ তিনটে বিচ্ছু আছে বলে সময়ে অসময়ে বড় উপকারে আসে। তবু পূর্ণিমাব ভয় রিন্টির শরীর বড় বাড়ন্ত। কে কখন কি করে বসবে এখন থেকেই রিন্টির শরীবটাকে মেজে ঘসে পেতল কাঁসার মতো ঝকঝকে করে না রাখলে কখন ফাটাফুটি ভেসে উঠবে—অযত্নে কি না হয়। মরচে পড়ে যায়, দাগ ধরে রায়। ঐ তিনটে বিচ্ছুর সঙ্গে রোদে জলে ঘুরে শুঁটকি মেরে যেতে পাবে। এইসব ভয়ের জন্যই পূর্ণিমা বিনিকে বলে যায়, দেখিস বিন, রিন্টি যেন বাড়ি থেকে বের না হয়। বিনিমাসি জর্দা মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে রাখে। কি বলে সবটা বোঝা যায় না। রিনতি বুঝতে পারে বিনিমাসির এত সময়ই নেই। কে কার গোঁসাই, কে কার খবর রাখে। মরণ। বিনিমাসির মুখ-ঝামটা। বিনিমাসির হিংসে খুব। এবং রিনতি টের পায় বিনিমাসির কোন

অনিষ্ট না করলে বড় একটা আজকাল নালিশ করে না। বলেও না, তুমি গেলে দিদি, মেয়েও পাড়া চলাতে বের হল।

বরং আজকাল বিনিমাসিকে দেখেছে রিনতির পক্ষ নিয়ে কথা বলতে। মরুকগে—কে কাকে দেখে! পয়সা খাবে তুমি আর নজরে নজরে রাখব আমি। আরও বিনষ্ট হয়ে গেলে বিনিপিসি মনে মনে খুশী হয়, রিনতি সেটাও বুঝতে পারে। পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া হয়ে গেলে রিনতির, বিনিমাসির সবচেয়ে বেশি মজা। কারো একটুকুন ভাল দেখলেই বিনিমাসির চোখ টাটায়।

রিনতি ঘটি নিয়ে কলতলায় যাচ্ছিল, পূর্ণিমা তখন ডাকল, রিন্টি দাঁড়া।

পূর্ণিমা একটা টিনের কৌটা থেকে চুরি করে আনা বাবুদের গন্ধ সাবান বের করে বলল, সারা শরীরে তোমার রাজ্যের গু। মাথায় কিসে হেগেছে। চুলের কি দশা।

রিনতি হাত পেতে বলল, সাবানটা দাও। আমি নিজেই পারব।

—তুই পারবি না। আমি মাখিয়ে দেব।

—রিনতি বলল, আমি পারব দাও না।

পূর্ণিমা কিছুটা অভিযোগের সুরে বলল, তুমি পারলে তো আমার হয়েই যেত সব। সে মেয়ে যদি হতে তবে কি আর কপালে এত দুঃখ থাকে! পোড়াকপালী আর কাকে বলে!

রিনতি বুঝতে পারে অপচয় হবে ভেবে মা তার হাতে সাবানটা দিচ্ছে না। এছাড়া কি মা শরীরে সাবান মাখিয়ে দেবার সময় লক্ষ্য রাখে শরীরে কিছু হচ্ছে কি না। মার লোভী চোখ দেখলে এমনই মনে হয় তার। তখনই গুটিয়ে যায়। তেল মাখিয়ে দেবার সময় হাঁটুর ওপর এমন চেপে ধরে যে, মনে হয় জোরজার করে মা তাকে বড় করে দেখতে চায়। দিনের পর দিন আর গতর খাটিয়ে পারছে না। হাতের কাছে রোজগারে মেয়ে থাকলে, পা ছড়িয়ে দোক্তা পান খেতে খেতে মা হয়তো একদিন উদাসবাবুর সঙ্গে তীর্থ করতে চলে যাবে। এ বাড়িতে তীর্থের গল্প হয়—নবদ্বীপের রাসে গতবার মা বিনিমাসি ঘুরে

এসেছে। এর চেয়ে দূরে বামাক্ষেপার শ্মশান কোথায় আছে, সেখানে যাবে বলেছে—উদাসবাবুর কাছে দু' টাকা ধার রয়ে গেছে রাসের মেলা বাবদ। ঋণ রেখে তীর্থে যেতে নেই। তাই ও দু টাকা শোধ না দিয়ে মা আর বামাক্ষেপার শ্মশানে যাচ্ছে না। যেন রিনতি বড় হলে এ দু টাকা ধার থাকত না। আলোদির বাবার মতো মাও বলত, রিনতিরে তুই তো রূপকথার আংটি। একই কথা আজ সেই লোকটাও তাকে বলে গেছে।

বিশু বলত, আংটি তুমি কার?

রিনতি বলত, যার হাতে আছি তার।

এখন মার হাতে, তার পর তোর হাতে।

—রিন্টি তুই আমার হাতের সত্যি হবি!

—বড় হই আগে।

রিনতির পাকা পাকা কথায় গোপাল বলত, ওরে রিন্টি সোনার আংটি তোরে আমার চাই।

সূর্য বলত, আমি বৃক্ষ হয়ে থাকব, তুই পাখি।

এমন পাকা কথায় রিনতি জোরে জোরে হাসত। বলত, তোদেরও কিছু হয়নি আমারও না। বড় হলে দেখা যাবে। পাখির কথা কেমন মনে থাকে।

এবং রিনতির তখনই হুঁস হল মা তাকে কলতলায় হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রক খুলে নিয়েছে গা থেকে। রিনতির লজ্জা লজ্জা করে। সে বুকের ওপর একটা গামছা ফেলে বাইরে মার সঙ্গে বের হয়ে এল। এ বাড়িতে এখন পুরুষ বলতে মটরদা। মটরটা ঘর থেকে খুব কম বের হয়। কোন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকে আড্ডা দিতে দেখে না। এবং এই জন্য মটরদাকে রিনতির খুব ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। আর এই যে বুকে গামছা দিয়েছে, সেও মটরদার জন্য। যেন মটরদা না ভাবে মেয়েটা মায়েদের মতোই হচ্ছে।

কলতলায় কেউ নেই। ফুলপিসির দরজা বন্ধ। যে যার ঘরে প্রায় এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সূর্য নদীর পাড়ে হেলে গেলেই

দরজা জানালা খুলে যাবে সবার। টেবিলে আয়না নিয়ে বসবে। চুলে চিরুনী দেবে। টিপ পরবে। সারাটা বাড়িতে কেমন উৎসবের সাজ লেগে যায়। এবং সে এই সময়টাতেই শিস শুনতে পায়, দূরে কারা তাকে ডাকে।

রিনতি কলতলায় এলে পূর্ণিমা এক ঘটি জল সর্বাঙ্গে ঢেকে দিল। তারপর সাবান ঘসতে থাকল। মাথায় সাবান ঘসে দিতে থাকল। এক মাথা ঘন চুলে পূর্ণিমা হাত দিয়ে সুখে গলে গেল। কি চুল! ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, রিনতির কপাল কি সুন্দর, নাক মুখ সাজিয়ে রাখতে পারলে যেন এখনই লাখ টাকা দামে বিক্রি হয়ে যাবে। পূর্ণিমা অবশ্য ভাবতেই পারে না, বিক্রি করে এককালীন টাকা নেবে, না ঘরে রেখে সুদ খাবে। এইসব প্রশ্ন মনের মধ্যে পূর্ণিমার কুট কুট করে কামড়াচ্ছিল। এবং যত গন্ধ সাবান ঘসে দিচ্ছে, তত রঙ খুলে যাচ্ছে, ময়লার পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে এবং এক হলুদ রঙ, ঠিক হলুদ নয়, একেই বুঝি বলে কাঁচা সোনার রঙ, মেয়েটার শরীরের চামড়া মসৃণ এবং তেল চুক চুক করছে। ভাল ঘাস পাতা সব্জি দিতে পারলে আরও কি না জানি হত।

রিনতি তখনও তার গামছাটা বুকে আকড়ে।

রিনতি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ও লাগছে, তুই মা না ডাইনী।

—কি হয়ে আছে!

—থাকুক। আমার লাগে না বুঝি। বলে রিনতি এক দৌড়ে পূর্ণিমার হাত থেকে ছিটকে বের হয়ে গেল।

পূর্ণিমাও ছুটে এল ঘরে। টানতে টানতে কলতলায় নিয়ে গেল। দুম দুম কটা কিল মেরে বসিয়ে দিল মেয়েকে। তারপর ঘটি ঘটি জল ঢেলে দিল। গা মুছিয়ে দিল। রিনতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নড়ছে না। রোদে প্রায় যেন উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোনরকমে রিনতি গামছাটা কোমরে জড়িয়ে রেখেছে। তেল মাখা শেষ হলে ধোয়া প্যান্ট পরিয়ে দিল। ধোয়া ফ্রক গায়ে দিয়ে দিল। দেখলে কে বলবে রিনতি পূর্ণিমা বলে একটা ঠিকা ঝির মেয়ে।

সাফসুতরো করে খেতে দিল রিনতিকে। বলল, ঘরের বার হলে পা খোঁড়া করে দেব। ঘুমোও।

একেবারে বাবুদের বাড়ির মতো। কিন্তু রিনতির চোখে ঘুম আসে না। বাইবে কেউ যেন শিস দিয়ে ডাকে। রাস্তায় ওবা কত না কিছু করে বেড়াচ্ছে। স্বাধীন—যেখানে যখন খুশি চলে যেতে পারে বিশুরা। আজ বিষ্ণুপুরে পৌষেব মেলা। মা কালীর থানে কত পয়সা—বিশু, গোপাল, সূর্য ঠিক চলে গেছে। এবং সেই ঝম ঝম করে যেখানে পয়সার বৃষ্টি হচ্ছে, বিশু, সূর্য, গোপাল সেখানে ওৎ পেতে আছে। তারপর পয়সা হাতে এলে ফুলুরি কচুরি জিলিপি খাবে। সেও খেতে পারত। ঠিক করাই ছিল দু'দিন আগে, মঙ্গলবার বিকেলে রিনতিকে নিয়ে তারা মেলা দেখতে যাবে। আজ সেই দিন। সকালে কারো মনেই ছিল না কথাটা। এখন শুয়ে শুয়ে রিনতির এ-সব মনে হচ্ছে।

তখনই পূর্ণিমা বলল, কিরে ঘুমোলি।

—না। ঘুমব না।

—ঘুমিয়ে শরীর ভাল কর মা। যার শরীর নেই দুনিয়ায় তার কিছুই নেই।

মা মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর কথা বলে।—তোর ভালোর জন্যই বলছি। আমি আর কদিন।

রিনতি কতটুকুন আর মেয়ে। তবু সব বোঝে। বাড়িটার সব কিছু সে টের পায়। রাতে, ঘরে ঘরে কি হয় সব সে জানে। মাঝে মাঝে যখন সবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, মার দরজাও, তখন সে উঠে বসে। ফাঁক-ফোকরে উঁকি মারলেই চোখ আটকে যায়। ওর শরীরটা কেমন ঘিন ঘিন করতে থাকে—অথবা আশ্চর্য এক কৌতূহল এই জীবন নিয়ে।

চোখ বুজলেই সব দৃশ্যগুলি চোখে ভেসে ওঠে রিনতির। ওক উঠে এল। রিনতির তখনই বিশুর বাবার সেই গানের গলা শুনতে পায়, সমসার ভিষম ব্যাপার। রিনতি ভয়ে কেমন কুঁকড়ে গুটিয়ে যায়।—

আমাকে নিয়ে যা, তোরা আমাকে কোথাও নিয়ে চলে যা। বুক বেয়ে রিনতির সেই কষ্টটা আবার উঠতে থাকে। সে শুয়ে থাকে। একা গোপনে ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

॥ ৪ ॥

গলির মোড়ে এসেই যা স্বভাব উদাসবাবুর, একবার চারপাশটা দেখে নেওয়া, দেখে নিয়েই, কেমন গোপন এক খেলা, টুক করে ঢুকে যায় গলিটাতে—পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে, যেন নিশ্চিত হওয়া গেল—বিড়িটায় দুটো সুখটান মেরে সদরে এসে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট একটা আলো থাকে সদর দরজায়। কেমন ভূতের মতো লাগে নিজেকে। খুব সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যায়। কোন দিকে তাকায় না। সোজা পূর্ণিমার দরজা গলে ভিতরে ঢুকলেই স্বস্তি। দরজা বন্ধ করার আগে পূর্ণিমার অকালপক্ক মেয়েটা কোথায় দেখে। ওটাকে দেখলেই উদাসবাবুর কেমন গা জ্বালা করে। পূর্ণিমার ওপর রাগ হয়। কি দরকার ছিল এমন একটা মেয়ে বিয়োবার। সংসারে কি কাজে এল। যুবতীর যৌবন হরণ করে নিয়ে একটা শুঁটকি মাছের মত এখন পূর্ণিমা। তখনই দেখল মেয়েটা কোণায় বসে কি খুট খুট করছে। খুব ভালোমানুষের মতো উদাসবাবু বলল, রিনতি তোর মা কোথায় রে?

রিনতি বলল, জানি না। রিনতি তাকাল না। গোঁফে পাকা চুল দেখলেই আজকাল রিনতির রাগ বাড়ে। এবং মনে হয় গোঁফে পাকাচুল হলেই সমসার বিষম ব্যাপার হয়ে যায়। লোকের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। এবং এ-বাড়িতে সে যা দেখে থাকে, যারা রোজকার খদ্দের সবারই গোঁফে একটা দুটো পাকা চুল থাকে। গোঁফ না থাকলে মানুষের বুঝি এসব বাড়তি সখ গজায় না। একমাত্র আলোদির ঘরে মাঝে মাঝে ষণ্ডা মতো কিছু মরদ এসে থাকে। দাঁড়ি গোঁফ কামানো। মাতাল। মাতাল মানুষ দেখলেই রিনতির থুথু ওঠে মুখে। এবং এই যে লোকটা এখন তক্তপোষে পা তুলে বসে

আছে, জেবের ভিতর ঠিক মাকালী মার্কা একটা কিছু সযত্নে রেখে দিয়েছে, সে ঘর থেকে না বের হলে ওটা বের করবে না—এসব জানে বলেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঘরে সে ঠায় বসে থাকবে। মার-লাথি-ঝাঁটা খেলেও নড়বে না।

তখনই পূর্ণিমা প্রায় আদুল গায়ে উঁকি দিল। সন্ধ্যায় স্নান করার স্বভাব পূর্ণিমার। সারাদিন খাটাখাটনির পরে গা ধুয়ে ঘরে আসে। ঘরে ঢুকলেই রিনতিকে বের হয়ে যেতে হয়। কোন অজুহাত খাটে না। আজ অবশ্য তার তিনটে চাদরের জন্য অন্যরকম হতে পারে। সহজেই মা রাগ নাও করতে পারে। বসে আছে বলে, মা হয়তো বলতে পারে—রিনতি যা তো মোড়ের দোকানে। মুকসিপাতি জর্দা দিয়ে দুটো পান নিয়ে আয়। আর কি বলবে, বলতে পারে—সে বসে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। মাথা গোঁজ করে রেখেছে। কেমন জেদ তার ভেতরে—বিকেল থেকেই মা তাকে এই ঘরে আটকে রেখেছিল। বের হতে দেয়নি। কাজে যাবার সময় শেকল তুলে দিয়ে গেছিল। সূর্য, বিশু খবর রাখে। মা কাজে বের হয়ে যেতেই, ওরা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিস মেরেছিল। রিনতি জানালায় উঁকি মেরে ইশারা করেছিল হাতে। কাছে এলে বলেছিল, তোরা যা। আমি যেতে পারব না। দরজায় শেকল তোলা আছে।

সূর্য কেমন মুখ গোমড়া করে বলেছিল, ঢুকে খুলে দি। বের হয়ে আয়।

—না। মা মারবে তবে।

তারপর এসেছিল গোপাল, জানালা দিয়ে লাফ দে না।

—না। মা মারবে।

বিশু বলেছিল, ধুস তোর মা না পান্তা বুড়ি। ওটাকে তুই ভয় পাস।

রিনতি বলেছিল, না, মারবে।

তারপর ওরা রিনতিকে এক খণ্ড আখ দিল খেতে এবং আখটা রিনতি জানালায় দাঁড়িয়ে খেয়েছিল। একটা শশা দিল খেতে।

রিনতি সেটাও খেয়েছিল। শেষে বলেছিল ওরা, মেলায় আর তবে যাব না। তুই না গেলে মেলায় গিয়ে কি হবে ?

রিনতির চোখে জল এসে গেছিল।

তখন উদাসবাবু কুড়িটা পয়সা টিপে টিপে বের করল পকেট থেকে। পূর্ণিমার হাতে দিল। পূর্ণিমা তখন কাপড় ছেড়ে মাত্র আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁতে ফিতে আটকে চুল বাঁধছিল। পয়সা কুড়িটা নিয়ে বাড়িয়ে দিল রিনতির দিকে। বলল, কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না।

রিনতির চোখ জ্বালা করতে থাকে। সে কেমন ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুমি আমার চাদর তিনটে উদাসবাবুকে দেবে না। দেবে না বলছি।

পূর্ণিমা অন্য সময় হলে ঠাস করে গালে চড় কষিয়ে দিত।—কিন্তু তিনটে চাদর, এবং ভারি দামে বিক্রি হবে—এত বড় একটা সুখ তার কপালে আজ লেখা ছিল, সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। খুব অমায়িক হয়ে গেল পূর্ণিমা। বলল, যা রিন্টি এক দৌড়ে যাবি, এক দৌড়ে আসবি। লক্ষ্মী মেয়ে।

রিনতি পয়সা কটা নিয়ে সত্যি এক দৌড় দিল। এবং বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কিছুটা। বিশু ওরা কাছে কোথাও যদি থাকে। সে আমবাগানের ভেতর ঢুকে একটা শিস দিল। এবং এই শিসের চৌহদ্দির মধ্যে ওরা থাকলে ঠিক টের পাবে। কোন্ দিক থেকে শিসটা কান পেতে শুনবে—রিনতি ওদের ডাকছে। পর পর কটা শিস দিয়ে বুঝতে পারল, এ পাড়ায় এখন ওরা নেই। ডেরায় ফিরে যেতে পারে। অথবা শহরের পথেঘাটে, বাইস্কোপের হলের পাশে, খাগড়া বাজারে ঘোরাঘুরি করতে পারে। কিংবা প্যারেডের মাঠে চলে যেতে পারে। দৌড়াতে পারে। শীত নিবারণের জন্য দৌড়াতে পারে। নদীর পাড়ে আগুন জ্বেলে আকাশ রাঙিয়ে দিতে পারে। সেন বাবুদের নারকেল বাগানে ডাব চুরি করতে পারে। কত কিছুই মনে হল রিনতির। একবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল

সূর্য। খুব ঠেঙ্গিয়েছিল বাগানের মালি পুরন্দর। ঠেঙ্গানি খেয়ে জ্বর হয়েছিল—এবং বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকার সময় রিনতি গোপনে সেবা-শুশ্রূষা করেছে। বার্লি করে খাইয়েছে। কাগজি লেবুর রস আর বার্লি।

তখন পূর্ণিমা বলল, আজ খুব ভাল দিন।

উদাসবাবু বলল, এ-কথা কেন বলছ পূর্ণিমা ?

—অনেক টাকা।

—ধুস টাকা। টাকায় উদাসবাবু—বলেই সুন্দর মিহি একটা খিস্তি ঝাড়ল উদাস।

পূর্ণিমা বলল, ফুটানি রাখ। বড় বড় বাতই পাড়লে সারা জীবন। তোমায় এটা করে দেব, তীর্থ করাব, কলকাতায় নিয়ে যাব।

—হবে হবে। দেশের এই হাল হবে কে জানত পূর্ণিমা। কীট পতঙ্গের মত পিল পিল করে জনসংখ্যা বাড়বে কে জানত পূর্ণিমা। লোক না খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে কে এমন জানত পূর্ণিমা। দেশের নেতারা ফেরেববাজ হয়ে যাবে কে বিশ্বাস করত পূর্ণিমা। সব আবার ঠিক হয়ে গেলে তোমারও কলকাতা যাওয়ার বাসনা পূর্ণ হবে পূর্ণিমা। আমার শপথও রক্ষা হবে।

পূর্ণিমা মুখে পাউডার ঘসতে ঘসতে বলল, আর হয়েছে।

উদাসবাবু বলল, অত উদাসীন হলে চলবে কেন। হতাশ হলে চলবে কেন ? জনসংখ্যা বাড়ছে বলেই তো তোমাদের এত কষ্ট।

পূর্ণিমা ঠিক বোঝে না উদাসবাবু কি বলতে চায়। উদাসবাবু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অনেক কিছু জানে। খবর রাখে। বিয়ে থা করেনি। বোনের কিছু পোষ্য আছে। তাদের খাওয়াতে হয়। ঠিক খাওয়ানো বলা চলে না, যখন যা পারে দেয়। নিজে একটা ঘিঞ্জি গলিতে অন্ধকূপের মতো ঘরে পড়ে থাকে। রাত হলে রিকসা চেপে বেড়াতে বের হয়। তারপর অন্ধকার হলে এই গলিটায় ঢুকে পড়ে। উদাসবাবুর কথা হচ্ছে, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে মানুষের সব কিছু করার অধিকার থাকে। উদাসবাবু ভারি বিদ্বান মানুষ।

বিদ্বান মানুষকে সম্মান করতে হয়—পূর্ণিমা উদাসবাবুর অনেক সুন্দর কথা সে জন্য মুখস্থ করে ফেলেছে।

উদাসবাবু তক্তপোষের উপর পা তুলে বসেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শীত নিবারণ করছে। শীতটা একটু বেশি। মাঝে মাঝে হাত কচলে হাত গরম রাখছে। মাঝে মাঝে দরকার মতো ডান হাঁটু বাঁ হাঁটু নাচাচ্ছে। অর্থাৎ উদাসবাবুর একটা না একটা অঙ্গ সব সময়ই নড়ছিল। উদাসবাবু চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। যখন কিছুই নড়ে না তার তখন কানটা নাচে। আগে পূর্ণিমা হেসে ফেলত। রিনতি হেসে গড়িয়ে পড়ত। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেলে যা হয়, কেউ আর এখন হাসে না। কিছু নড়ছে না, চুপচাপ উদাসবাবু বসে আছে কখনও ভাবা যায় না। কিছু না নড়লে শেষ পর্যন্ত গোঁফ জোড়া নড়ে। আর, না নড়লে উদাসবাবু কেমন একটা ওরাং ওটাং হয়ে যায়।

পূর্ণিমা এ-সময় একটু সাজে। উদাসবাবু আর একটা বিড়ি ধরাল। কিছু ভাজাভুজোর ঠোঙ্গা এবং কালী মার্কা, বোতলটা তক্তপোষের নিচে। এ সময়টা উদাসবাবু ট্যারচা চোখে পূর্ণিমাকে দেখে বিড়িতে সুখে টান দিয়ে কেমন গলে যাবার মতো খুব কাতর গলায় বলে, যৌবনে কোথায় ছিলে হরিণী। কিছুই তো আমার জন্য রাখনি। সব চুষে খেয়েছে লোকটা।

পূর্ণিমার সব সহ্য হয়ে গেছে। রিনতির বিছানা বারান্দার পাশে একটা খোপের মত ঘরে। যতক্ষণ না ঘুমায় রিনতি ততক্ষণ টুকটাক কথাবার্তা। আর উদাসবাবু অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসে শহরের, সেইসব গল্প। যেমন উদাসবাবুই এসে খবরটা দিয়েছিল, কেল্লা ফতে-—ইন্দিরা ভোটে হারছে। যেমন উদাসবাবুই বলেছিল, মানুষ আবার তার স্বাধীনতা ফিরে পেল।

পূর্ণিমা বলেছিল, কি গজাল তাতে।

—কি গজায়নি বল ?

—তোমার কালী মার্কা সোনার জল ভরে গেল!

—আরে জল ফল বুঝি না, এখন আমরা আবার স্বাধীন। কথায় কথায় আর জেলে পুরতে পারবে না।

—ক দিন জেল খাটলে!

—আমি জেলে যাব কেন?

—কে যায়!

—চোর বাটপাড় যায়।

পূর্ণিমা বলত, তুমি গেলে না কেন? চোর বাটপাড় কে নয়!

—অপকর্ম কিছু করিনি তো।

—এটা সুকর্ম!

—আর মানুষের তো একটা কিছু চাই। টাকা-পয়সা কুলোয় না বলে, তোর মত মেয়েমানুষের মুখে, ক্ষেপে গেলে চোদ্দগুষ্টি তুলে তখন গালাগাল। এবং পাত্রটা এগিয়ে দিলেই ঠাণ্ডা—আহা জীবন-যৌবন বিফলে যায়। কি হায় লভিনু সংসারে। আরে একটা নতুন বি-এ পাশ সহকারী শিক্ষয়িত্রী এসেছে স্কুলে। বি-এ পাশ। আজ-কালকার বি-এ পাশ একটা লবডঙ্কা। শাশ্বতী বানান ভুল লেখে আমি একটা মেট্রিক জিটি—তিরিশ বছর ধরে ছাত্র ঠ্যাংগাচ্ছি, তুই কিনা মেয়েছেলে আমার ভুল ধারস। হি হি হি।

উদাসবাবু বলল, রত্নটি কোথায়?

পূর্ণিমা বলল, বারান্দায়।

—সাড়াশব্দ নেই।

—আটকে রেখেছিলাম।

—কেন, কেন?

—ঐ ছোঁড়া তিনটে খুব জালাচ্ছে।

—ঐ মানে সারমেয়র শাবকেরা।

পূর্ণিমা বুঝতে পারল না।

—আরে সাধুভাষা বোঝ না?

পূর্ণিমা বলল, না।

—কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চার সাধুভাষা হল গে সারমেয় শাবক।

—ঐ হল গে। পূর্ণিমা ডাকল, রিনতি এনেছিস ?

রিনতি দরজার বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—যা শুয়ে পড়গে। রাত হয়েছে। পূর্ণিমা দরজাটা সামান্য ঠেলে দিল। এবং রিনতি দেখেছে মা-টা কখনও দরজা একেবারে বন্ধ করে না। প্রথমে একটা পাট ঠেলে দেয়। আস্তে আস্তে যেন কথা বলতে বলতে এই শীত ঢুকছে বলে, অথবা আলো আসছে বলে অথবা পাশের ঘর থেকে সরগোল উঠছে বলে যেন দরজা সামান্য ভেজিয়ে দেওয়া। রিনতির ঠোঁট কেমন ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে। তার বাপটা যে কী ? কোথায় থাকে, আছে কিনা বেঁচে, বেঁচে না থাকলে, মা কপালে সিঁদুর পরে কেন ? বাপের কথা বললেই কেমন খেঁকিয়ে উঠার স্বভাব। তখন রিনতি গোপনে কাঁদে—মা মানুষের এমন হয়, ভগবান আমার মা-টাকে ভাল করে দাও ভগবান। আমার বাবাটা কোথায় বলে দাও ভগবান।

তারপর রিনতি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। এবং জলের অতলে ডুবে যাওয়ার মতো টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। সে বেশিক্ষণ কোন কষ্টই ধরে রাখতে পারে না। কারণ সে জানে সকাল হলে তার অবাধ স্বাধীনতা। ঘরদোরের কিছু কাজকর্ম মা তার জন্য রেখে যায়। সেটা করতে হয়। রাতে উদাসবাবু চলে গেলে মা তাকে তুলে নিয়ে চকিতে শুইয়ে দেয়। সকালে সে উঠে দেখতে পায় ঘরে শুয়ে আছে। মার ওপর তখন তার রাগ থাকে না। মার গালাগালি কখনও সে ঘুম চোখে শুনতে পায়।—এই রিন্টি ওঠ। ভিতরে চল। উদাসবাবু মাঝে মাঝে আসে। ঠিক রোজ আসে না। উদাসবাবু এলেই মার ওপর মনটা ঘেন্নায় ভরে যায়। আর সকালে মার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এ-মা অন্য মা। মা তাকে কত ভালবাসে। এমন সব হিজি-বিজি কথাবার্তা তার মাথার মধ্যে গজ গজ করছে এখন। বাইরে রোদ উঠে গেছে। চাদর তিনটের টাকা আজ পাওয়া যেতে পারে,

নাও যেতে পারে। এখন উদাসবাবু আর মার ইচ্ছে। সে উঠে পড়ল। তার জন্য বাসি খাবার রেখে যায় হাঁড়িতে। হাত মুখ ধুয়ে সব কটা রুটি খেয়ে ফেলল। রাতে মা তাকে কিছু খেতে দেয়নি। খুব খিদে পেয়েছে। সব কটা রুটি খেয়ে ঢক ঢক করে জল খেল। আর মাঝে মাঝে শিস শুনতে পাবে ভেবে কান খাড়া করে রেখেছিল। কিন্তু কোথাও কিছু না। সব ফাঁকা। আলোদি রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। এবং পাশের দরজায় বুড়ি হাঁকছে ও মটর বাজারে যা। বিনি-মাসির দরজা বন্ধ। ফুলপিসির ঘরে তালা ঝুলছে। ফুলপিসি মাঝে মাঝেই তালা ঝুলিয়ে উধাও হয়ে যায়। আসে তিন চার দিন পর। কখনও এক হপ্তা। একবার এক মাস পর ঘুরে এসেছিল। সঙ্গে তখন কত কিছু নিয়ে আসে। ফুলপিসিকে কারা কিছুদিন পর পর কোথায় নিয়ে যায়। দেশ ঘোরার গল্প যখন করে তখন রিনতির মনে হয়, সবচেয়ে ফুলপিসির কপাল ভাল। বড় হয়ে সেও ফুলপিসির মত হবে।

রিনতি জানালায় উঁকি দিল। না, পাত্তা নেই কারো। সে এবার শেকল তুলে দিল দরজায়। তালা দিয়ে দিল। চাবিটা আলোদির কাছে রেখে বলল, মা এলে দিও।

আলো বলল, সাত সকালে কোথায় বের হচ্ছিস ?

— আসছি।

আসছি বলে সেই যে ছুট দিল রিনতি, কেউ আর তার নাগাল পেল না প্রথমে সে গেল বিশুদের ডেরায়। নদীর পাড়ে। তাল-পাতা দিয়ে একটা ডেরা বানিয়ে নিয়েছে ওরা। পাশে কয়লার ডাই। কাঁচা কয়লা মাড়িয়ে সে ঘরটায় উঁকি দিল। ওরা নেই, শুধু খড়ের গাদা। এই খড়ের মধ্যে ওরা শীতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। ছুটো ছেঁড়া কম্বল এক পাশে পড়ে আছে। একটা কুকুর তখন সেই কম্বলে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ওরা বের হয়ে গেছে কুকুরটা যায়নি। কুকুরটা এখানেই থাকে। রিনতিকে দেখে একবার চোখ মেলে তাকাল। তারপর চেনাজন দেখে চোখ বুজে ফেলল। রিনতি তখন বলল, ওরা কোথায়।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করল দুবার তারপর ফের মুখ গুঁজে দিল।

রিনতি ডাকল, তু তু।

কুকুরটা উঠে দাঁড়াল।

নদীর পাড় ধরে রিনতি ছুটল, কুকুরটাও পেছনে পেছনে।

চার পাশে এখন পৃথিবীতে কত খবর। এবং এই শহরে এত সব দালান কোঠা মানুষজন গাড়ি ঘোড়া যে রিনতির সব দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। সব কিছুই মনে হয় নতুন, অন্য এক জগৎ। সে জগতে কিভাবে যাওয়া যায় তার জানা নেই। সেই বাড়িটার মতো ফাঁকা বাড়ি আর কোথাও নেই। একবার যাওয়ার সময় পাঁচিলে উঁকি দিতেই দেখল, গীর্জার ফাদার লনে পায়চারি করছে। বড় পবিত্র মনে হচ্ছিল আজ আবার বাড়িটা। রিনতি একটা গরুর গাড়ির ওপর পা দিয়ে পার হয়ে গেল রাস্তাটা, দুটো মোষ ডিঙিয়ে গেল, ভট্চাজপাড়ায় গলির মোড়ে ওরা থাকতে পারে। সে রাস্তা পার হতে গিয়ে থেমে গেল—প্যাঁক প্যাঁক করে কেবল রিকসো যাচ্ছে আসছে। বাজারে যাচ্ছে, হাসপাতালে যাচ্ছে, অফিস কাচারি যাচ্ছে, ইস্কুলে কলেজে যাচ্ছে কেউ বসে নেই। কেবল রিনতির সময় কাটে না। বিশু, সূর্য, গোপাল সঙ্গে না থাকলে তার সময় বড় মনে হয় লম্বা। খুব একা এবং পৃথিবীটাকে খুবই খারাপ জায়গা বলে মনে হয় তার। আর ওদের আবিষ্কার করে ফেললেই—মনে হয় সুখ কি সুখ! সব কিছু দেখে শুনে বেড়িয়ে মিষ্টিপাতা পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে সে তখন নিজেকে অপ্‌সরা ভেবে থাকে। বিশুদের হাতে কখনও কখনও পাঁচ দশ টাকা থাকে। কেবল খায় তখন। যা পায় সামনে সবই কিনে খেতে থাকে। সঞ্চয় নেই, জামা-কাপড় নেই, কিছুরই ঠিকঠাক নেই। যখন যেখান থেকে যা পায়, পেলে কেবল খায় আর বাইস্কোপ—মোগল-ই-আজম দেখা হল না। কবে দেখাবে বিশু কে জানে!

রিনতি মোড়ের পানের দোকানটায় দেখল নিতাইদা পান সাজিয়ে রাখছে। বিশু আগে এখানে ফাই ফরমাস খাটত। জল এনে দিত, রাস্তা ঝাঁট দিত। জল ছিটিয়ে দিত রাস্তায়। বদলে নিতাইদা ওকে

এক কাপ চা খাওয়াত। খুব সদয় হলে একটা পাঁউরুটি দিত সঙ্গে। সে বলল, অ নিতাইদা বিশুকে দেখেছ।

নিতাইয়ের এখন ব্যস্ত হাত। কে বলল, কে ডাকল দেখার সময় নেই। অফিস কাছারির সময়, পান বিড়ি সিগারেট যে যা চায় দ্রুত দিয়ে দিতে হচ্ছে। কোন হাত-কামাই নেই। ওর হাত পা মায় মাথা একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। রিনতি বলে একটা মেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে ও বুঝবে কি করে!

রিনতি বলল, অ নিতাইদা সূর্য, বিশু এদিকে এসেছিল?

নিতাই কাজ সারতে সারতে চোখ তুলে দেখল সেই গেছো মেয়েটা—সূর্যদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—এবং আজ নিতাইয়ের চোখ কেমন আটকে গেল। সাফ সুতরো, চুল ঝাঁকড়া, একেবারে সতেজ, এবং তার কেমন লোভ হল দেখে—বলল, আরে রিনতি!

—সূর্যকে দেখেছ?

—নাতো।

—কোনদিকে যে গেল! রিনতি চলে যাচ্ছিল।

নিতাই বলল, ও রিনতি কোথায় যাচ্ছিস?

—ওরা যে কোথায় গেল!

—যাবে কোথায়। দাঁড়া না। একটু জল তুলে দিবি!

রিনতি বলল, সময় নেই নিতাইদা।

—পান খাবি।

—পরে এসে খাব।

রিনতি মানুষের কথাবার্তা থেকে সব টের পায়—মানুষের মধ্যে কি যে থাকে! চোখ দেখলেই বোঝে বাপের বয়সী মানুষেরাও ঠিকঠাক নেই। তার তখন সব কিছু লাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। থুথু মুখে উঠে আসে। সূর্য, বিশু, গোপাল সে-সবে নেই। ওরা কেমন অন্য রকম। রিনতি সঙ্গে থাকলেই খুশি। খুব বেশি খুশি হলে বলবে—রিনতিরে তুই আমাদের সোনার আংটি। আর সেই উদাসীন লোকটা—যে একটা বড় বই লিখে যাচ্ছে। গাঁয়ে গঞ্জে

শহরে কোথায় না গেছে লোকটা। বড় একটা ফিরিস্তি দিয়েছিল—সেই লোকটা বলেছিল, বিকেলে ওদের পাড়ায় যাবে। বলেছিল, ও রিন্টি তুই তো রূপকথার আংটি। শেকল তুলে না আটকে রাখলে—সেই লোকটার সঙ্গে কাল ঠিক দেখা হত। কোথাকার কোন দেয়ালে আর কি কি লিখল সব বলত। মা-টাই যত নষ্টের গোড়া। এত সাফ সুতরো কেন মা রাখতে চায় সেতো সব বোঝে। চারা গাছে জল সার দিয়ে যাচ্ছে। বড় হলে ফল পাবে।

রিনতি তারপর আবার দৌড়াল। দু-পাশে বই-এব দোকান, মনিহারি দোকান, চালের আড়ত ফেলে মোড়ের সাঁকো পাব হয়ে গেল। সাঁকোর নিচে শহবের বড় নর্দমা—পাশে ডোম মেথরদের বস্তি। বস্তিটার ও-পাশে একটা খোলা মাঠ আছে, কোনকাবণে বড় কিছু দাঁও মারলে ওরা ওদিকটায় ঘুরে বেড়ায়। রিনতি ওদিকটায় গিয়েও দেখল নেই। সত্যি রিনতি আর পাবছিল না। কাল থেকে সে ওদের না দেখে আছে, এখনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, আব কোথায় খুঁজবে—যদি বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গোপাল, সূর্য কখনও বাস যাত্রীদের মোটঘাট তুলে দেয়। বিশ-পঁচিশ পয়সা ওতে হয়। যা হয়, যে যা দেয় ওরা তাই হাত পেতে নেয়। সিনেমা হলটা পার হয়ে গেল সে। রামবাবুর ডাক্তারখানা পার হলেই বড় স্কুল, টাউন হল, প্যারেডের মাঠ, কাশীশ্বরী বিদ্যালয় তারপর সোজা পূবে একটা রাস্তা গেছে। শহর থেকে বের হবার মুখেই বাস-স্ট্যাণ্ড। রিনতি এখানে এসে একদিন দেখেছিল গোপাল একটা বাসের গা ধুইয়ে দিচ্ছে। আজও সে ভেবেছিল, ঠিক কাউকে না কাউকে কিছু করতে দেখবে এখানে। তা ওরা কিছু করতে না পারলে চুরি চামারি করে। তাও না করতে পারলে নিরম্বু উপবাস থাকে।

এবং রিনতি জানে এই শহরে বিশুদের মতো ছেলেরা এ-ভাবেই বড় হয়ে উঠছে। দিন দিন সংখ্যা বাড়ছে। বিশুদের সঙ্গে ঐ তো সেদিন চার-পাঁচটা ছেলের মারদাঙ্গা হয়ে গেল। গোপালের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিল। ঘটকবাবুর মেয়ের বিয়েতে উচ্ছিষ্ট খাবার এঁটো

পাতা নিয়ে ঝগড়া দু দলে। কুকুর তাড়িয়ে ওরা যে-যার মতো খোরায় তুলে নিচ্ছিল, আর সেই সময় আস্ত তিনটে পানতোয়া, সূর্য ঝাঁপিয়ে তুলে আনার সময়ই দেখল, অন্য দলের একটা ষণ্ডা ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর। ধস্তাধ্বস্তি। তারপর মারামারি—এবং ওদের একটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল বিশু। ওদের একজন গোপালের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছিল। ঠ্যাংটা গোপালের এখনও ঠিক হয়নি, গোপাল এখনও জোরে দৌড়াতে পারে না। দুঃখে রিনতি বলেছিল, তোরা এঁটো পাতা চাটিস না। চুরি-চামারি করে খাগে। কোন পাপ নেই। লোকে খাওয়ার জন্য কি না করে। আর তোরা চুরি-চামারিটাও করতে পারবি না। সেই থেকেই ওরা আর ও-লাইনে নেই। রিনতির ওরা এত বাধ্য, অথচ কোন পাত্তাই নেই। সে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হেঁটে যাচ্ছে শহরের আর কোথায়—কিংবা যদি সেই নদীর চরে বাবলা বনের পাশে থাকে, না কি শ্মশানে গেছে—শ্মশানে তো কোন বড় মানুষের মড়া যাবে বলে কথা নেই। তবে যা শীত আর উত্তুরে হাওয়া সেনবাবুর মা টেসে যেতে পারে। শীতের সময় সব বুড়ো মানুষেরা মারা যায় সে দেখেছে। পাতা ঝড়ে যাবার মতো আর কি।

তখনই দেখল রিনতি, সূর্য সরকারি খামারের কাঁটাতার ডিঙিয়ে এদিকে আসছে। বগলে একটা ব্যাগ ভরতি কড়াইশুঁটি।

রিনতি ডাকল, সূর্য।

সূর্যর কালো মুখটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বলল, ধর। দৌড়ে চলে যা। লোক আসছে।

রিনতি ব্যাগটা হাতে নিয়ে প্রথমেই একটা বাসের আড়ালে চলে গেল। তারপর খালের নিচে, জল নেই, বলে সে দৌড়ে গেল কিছুটা। রাস্তা থেকে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। সে তারপর আরও কিছুদূর গিয়ে ধোবি মাঠে উঠে গেল। কটা গাধা চরছে। ধোবারা সব কাপড় কাচছে। পাখি উড়ছে আকাশে। গাছের নিচে ফৌজদারি মামলার আসামীকে নিয়ে দুজন পুলিশ। দূরে সরকারি-বাবুদের কোয়ার্টার এবং এ-সবের মধ্যে যখন মনে হল রিনতির, আর

ধরা পড়ার ভয় নেই, তখন বসে গেল। দু হাঁটুর ফাঁকে ব্যাগ খুলে দেখল, কি আছে। সামনে একটা বড় জলা। ও যে এদিকটায় এসেছে সূর্য ঠিক খেয়াল রেখেছে। সুতরাং নিশ্চিন্তে দুটো একটা কড়াইশুঁটি ব্যাগ থেকে তুলে রিনতি খেতে থাকল। একেবারে ডাঁসা কড়াইশুঁটি—সবুজ আর কি সতেজ।

দুটো লোক দৌড়ে আসছে খামারের ভেতর থেকে। সরকারি খামারের সাদা বাড়িটা থেকে হৈ চৈ উঠেছিল। এত সতর্ক থেকেও রেহাই নেই। হৈ চৈ শুনেই গোপাল গড়াগড়ি দিয়ে আখের খেতের ও-পাশে চলে গিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। বিশুটা কোন্ দিকে গেল সূর্য বুঝতে পারছে না। বুকটা ধুকপুক করছিল। আসল মাল তার হাতে। সে এ-ভাবে বের হয়েই রিনতিকে দেখতে পাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভগবানেরই কাজ। ঠিক সময়ে রিনতিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। লোক দুটো দৌড়ে আসছে ওকে ধরার জন্য। সে খুব সাধু পুরুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধরে দেখুক না। ওর হাত পা খালি। গরীব মানুষ সে, কিছু বললেই এমন হাউ মাউ শুরু করে দেবে, লোক দুটো তখন পালাতে পথ পাবে না।

লোক দুটো এসেই সূর্যকে ঘিরে ধরল, এই খেতে ঢুকিছিলি কেন?

সূর্য বলল, আমি না আমি না।

—আবার মিছে কথা বলছিস। চল, বলেই ওর হাত ধরে টানতে থাকল।

—আমি না বলছি।

—আর দুটো কোথায়, শালা খরগোসের বাচ্চা, মনে কর কিছু টের পাই না।

সূর্য বলল, বলছি তো আমি না!

—হোমান্দির পো, তবে কে ঢুকেছিল!

—আমি কি করে বলব, কে ঢুকেছিল!

—আগে চল ত, তারপর দেখা যাবে। বড়বাবুর কাছে নিয়ে ফেলি, তখন···

—আমাকে টানা-হেঁচড়া করছেন, কেন! আমি না বলছি!

ট্যারা লোকটা একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। ভুল-ভাল হয়ে যেতে পারে। দেখি পকেট।

সূর্য পকেট উল্টে দেখাল।

ট্যারা লোকটা বলল, তোর হাতে কি ছিল একটা—ওটা কৈ।

সূর্য দু হাত তুলে বলল, ওটা গাছে।

লোক দুটো ওপরে গাছের ডাল দেখতে থাকল। তারপর সূর্য হেসে দিল, বলল, দাদা কি দেখতে কি দেখেছেন—আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

লোক দুটো তারপর খুব সতর্ক করে দিয়ে বলল, জানিস অফিসের বড়বাবুর কাছে রিপোর্ট গেছে—রোজ খামার থেকে আখ চুরি হয়, কড়াইশুঁটি চুবি হয়, ফুলকপি, বাঁধাকপি চুরি যাচ্ছে।

সূর্য একেবারে হাঁ। তারা তো এই প্রথম খামার থেকে কড়াইশুঁটি তুলে নিয়েছে। খামারে কত খরচ করে সবকার ফলন বাড়ায়—আর সব পোকা-মাকড়ে খেয়ে নেয়। সে হা-হা করে হেসে দিল। বলল, পোকামাকড় খুব বেড়েছে দাদা।

লোক দুটোর গায়ে খাকি জামা কাপড়। সূর্য বলল, তোমাদের পেটে যায়! ভুঁড়ি মোটা হয়ে গেছে। লোকদুটো নিজেদের ভুঁড়ি দেখে সত্যি ঘাবড়ে গেল। এমন ভুঁড়ি নিয়ে এই একটা রোগা-পটকা রাস্তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেলে বড়বাবুই হয় তো পর পর হ্যাচ্য দিতে থাকবে। লজ্জায় পড়ে যেতে পারে বড়বাবু। আর কাউকে ধরতে না পেরে একটা ভিখারী ছাওয়ালকে! তোদের হিম্মত আছে। সুতরাং আপাততঃ লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য লোকদুটো যেন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে গেল, কারা যে চুরি করছে—কিছু রাখা যাচ্ছে না। এত বেড়া, এত পাহারা তবু চুরি যাচ্ছে।

সূর্য বলল, আপনারা করেন কি!

—কি করি আবার তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। শালা পতঙ্গ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

সূর্য বলল, আচ্ছা দাদু আর কিছু বলব না। ওরে গোপাল উঠে আয়। বিশু…ও… বলেই একটা শিস দিল। দূর থেকে ওদেরও শিস শোনা গেল। সংকেতে কে কোথায় আছে জেনে নিয়ে সূর্য গোল চোখে তাকাল। বলল, তা হলে যাই। তারপরই এক লম্বা দৌড়। ট্যারা লোকটা ভড়কে গিয়ে বলল, ধর ধর ধর। কে আর কাকে ধরে! সূর্য পগার পার।

॥ ৫ ॥

সেই উদাসীন লোকটা এই শহরের দেয়ালে নানারকমের কথা লিখে রাখছিল। যখন যা মনে আসছে লিখে রাখছে। এক জায়গায় লিখল—তেলের দাম চৌদ্দ টাকা। হাতের কাছে একটা ইঁটের টুকরো ছিল—ওটা দিয়েই সে লিখছে। আর শীতে কাঁপছে। দয়া পরবশে একটা দোকানী তিনটে বাসি ফুলুরি দিয়েছিল, পেটের ভেতর তারা এখন দাহ্য পদার্থের কাজ করছে। সবই অভ্যাস। এবং অভ্যাসবশে সবই সয়ে যায়। সারাদিন আর কিছু না হলেও চলবে। দ্বিগুণ উৎসাহে সে এখন তার শেষ কাজ করছে।

পৃথিবীতে মানুষের কত কিছু করার থাকে। সে এটা বড় লেটে বুঝেছে। পৃথিবীতে মানুষ সব সময়ই কিছু করার জন্য জন্মায়, বড় হয়, মরে যায়। লিখে রাখল সে, মানুষ মরে যায়। খুবই নতুন কথা মনে হয় তার। এবং এই কথাটা সেই প্রথম পৃথিবীতে আবিষ্কার করেছে ভাবল। মানুষ মরে যায়। ইঁটের একটা দিক খসে গেছে। দেয়ালের চুন খসে যাচ্ছে। মানুষ মরে যায় লিখতে গিয়ে দেখল মরে কথাটা স্পষ্ট হচ্ছে না। এবং মরে কথাটাকে সে বড় বড় করে বেশ গভীর করে লিখে রাখল। মরে যায়—খুবই সুন্দর কথা। মরে যায় মানে শেস হয়ে যায়—তারপর বলল, শেষ হয়ে যায় তবু তেলে ভেজাল দেয়। তেলে ভেজাল দেয় কথাটাও লিখে রাখার মত। মানুষ মরে যায় যেখানটায় লিখল, তার ঠিক নিচেই লিখে রাখল, তেলে ভেজাল দেয়।

উদাসীন লোকটা এরপর কিছুক্ষণ নিজের হস্তাক্ষর দেখতে দেখতে কেমন বিমুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ জানেই না সে কত দামী দামী কথা অলক্ষ্যে লিখে যাচ্ছে। যখন দেখবে তখন সামাল দেবার সময় আর থাকবে না। হুড়মুড় করে সব জ্বলে উঠবে। দাউ দাউ করে ধ্বসে পড়বে সব। চুরি চামারি ঠগবাজী সবই আগুনের মাথায় নাচানাচি করবে। বলেই সে খুব তৃপ্তির সঙ্গে মুচকি হাসল।

এই দেয়ালে ছুটো লাইন লেখা গেল। একটা লাইন হচ্ছে মানুষ মরে যায়। অন্য লাইনটা হচ্ছে তেলে ভেজাল দেয়। লম্বা দেয়ালে, পুলিশ ব্যারেক হবে, কি না হবে অত দেখার সময় তার নেই। সে দেয়ালের নিচে বসে একটু বিশ্রাম নেবে ভাবল। আজ সকাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এই নিয়ে সে আট লাইন লিখেছে এই শহরে। আরও দশ বারো লাইন লিখে শহর পরিত্যাগ করবে ভেবেছে। তারপর লালবাগ, জিয়াগঞ্জ তারপর খোসবাগ নবাবগঞ্জ তারপর মাঠ গাছ-পালা-পাখির গায়ে লেখা দরকার। কোনটা কবে করবে ঠিক করতে পারছে না। এত কাজ একজনের ওপর দিলে হয়! তার ভারি রাগ হল ? এক হাতে অত কাজ করা যায় না। আমি বলেই করে যাচ্ছি। তাকে খুবই অহঙ্কারী দেখাল। যার এত দায়িত্ব তাকে কিছুটা তো অহঙ্কারী দেখাবেই। সে এবার পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। মাথার ওপর সেই ছুটো লাইন—মানুষ মরে যায়। তেলে ভেজাল দেয়।

এই শীতকালটাই তার কাছে মারাত্মক। শীতের কূট বুদ্ধির সঙ্গে সে কিছুতেই পেরে ওঠে না। সারারাত তাকে প্রায়ই দৌড়াতে হয় রক্ত গরম রাখার জন্য। কখনও সুযোগ পেলে কাঠ খড় পুড়িয়ে আগুন তৈরি করে। এবং আগুনের পাশে বসে থাকে। কাঠ-খড় পুড়ে গিয়ে আংরা হয়ে যায়। ঘুস-ঘুসে আগুনের উত্তাপ চাদরের মধ্যে লটকে থাকে। বুক পেট গরম—এক মনোরম উষ্ণতা শরীরে—সে সেই ফাঁকে রাতের ঘুমটা সেরে নেয়। সময় কত জানে না, ওটা ঘণ্টা মিনিটে সে ভাগ করতে চায় না—মনে হয় মানুষের জন্য এই সামান্য

উষ্ণতাই যথেষ্ট। রাগ অভিমান নেই। যতটুকু ঘুমানো গেল। তারপর আবার উঠে দাঁড়ায় এবং দৌড়ায়। এবং যেখানে যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে তার সন্ধানে এত ব্যস্ত যে মনেই হয় না রাতটা খুবই বড়। ঠিক একটা কুকুরের মত সুঘ্রাণ পায় সে। শহরের কোথায় কত দূরে এঁটোপাতা পড়ে আছে নাক টানলেই টের পাওয়া যায়। সুতরাং সে যথার্থই স্বাধীন। তার গণতান্ত্রিক অধিকার কেউ হরণ করতে পারছে না। পৃথিবীর আর কোন দেশে তার মতো স্বাধীন নাগরিকের বাস আছে সে জানে না। দেশগুলি এবং লোকগুলির জন্য তার মাঝে মাঝে ভারি কৃপা হয় সে লিখে রাখে—এই আমাদের দেশ, সনাতন ভারতবর্ষ। এখানে আপনি খুশী মত বসবাস করতে পারবেন। অধিকাংশ জায়গা উষ্ণ অঞ্চল। পৌষ মাঘ নামে দুটো মাস আছে। এই মাস দুটোকে শীতকাল বলে। শীতকালে গাঁয়ে গঞ্জে ঘোবার চেয়ে শহরে ঘোরা ঢের বেশী আরামদায়ক। জনবহুল বলে নিশ্বাসে বাতাস গরম থাকে। আর এমন সব এঁদোগলি ভগ্ন প্রাসাদ এবং জরাজীর্ণ আবাস মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যার মধ্যে মানুষ অনায়াসে শীতের উত্তুরে হাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। এখানে প্রকৃতি মানুষের প্রতি খুব সহৃদয়। বর্ষাকালটা আজকাল কিছুটা বিড়ম্বনা দেয়। কখনও খুবই বর্ষা আবার কখনও খরা। বর্ষার সময় খরা অঞ্চলে চলে যেতে পারেন। শুধু মরুভূমির মাঠ মাইলের পর মাইল। এবং এখানে মানুষের শরীর কাঠির মতো, কারণ শরীরে অধিক মেদ থাকা কোন স্বাধীন মানুষের পক্ষেই সুবিধাজনক নয়। তাতে বেশি দৌড়ানো যায় না। লম্ফ ঝম্প করা যায় না। হৃদ রোগের আক্রমণ ঘটে না। রক্তচাপ কমও থাকে না বেশিও থাকে না। স্বল্পাহারে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। এই দেশটার জন্য আমার এত মায়া যে মাঝে মাঝে মানুষ মরে যায় মনে হলে রেললাইন ধরে হেঁটে যেতে ইচ্ছে হয়। একটা মানুষ এবং রেলগাড়ীর খণ্ডযুদ্ধের ছবিটা ভেসে উঠলেই বুকটা কাঁপে। গাড়ী দেখলেই সুবোধ বালকের মতো হাত

তুলে বলি, যাও হে বাছা। বেঁচে থাকার মত মানুষের আর বড় কিছু নেই।

শীতে উদাসীন মানুষটার হাত পা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। দু ঠ্যাং বিছিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। রোদ উঠেছে। রোদে তাপ উত্তাপ নেই। পাতলা জলের মত কেমন নিরীহ গোবেচারা রোদ। সে হাত পাকিয়ে বলল, বাবা রোদ আর একটু গরম হও। হাত পাগুলি সেঁকেনি। কিছুই তো করতে দিচ্ছ না। দুটো লাইন মাত্র এখন লিখে রাখা গেল। অবশ হাতে আর কত করা যায়। সে রোদে হাত পা মেলে একটা মাকড়সার মতো দেয়ালে সেঁটে থাকল। মাথার ওপর লাইন দুটো লেখা, মানুষ মরে যায় তেলে ভেজাল দেয়। তার ইতিমধ্যে আরও কত কথা লিখে রাখার কথা ছিল— কুয়াশার মধ্যে কথাগুলি পড়ে যাওয়ায় আর ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে না। একটা কথা শুধু মনে আছে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। বেশ সুন্দর কথা। হাত পা গরম হলেই লিখে রাখবে। তারপরই কেমন কুয়াশা, বেঁচে থাকার মতো···শেষে কি-! শেষ কথাগুলি আর মনে করতে পারছে না। মনে করতে না পারলে তো জীবজন্তু হয়ে যাওয়ার কথা। সে কি তবে আর মানুষ নেই, জীবজন্তু হয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার···না, কিছুতেই শেষ কথাগুলি আর তার মনে আসছে না। বাঁচা মরা কি সমান মানুষের? জানি না। কে যে তার সঙ্গে কথা বলে! সুঘ্রাণ উঠছে কেন, মাংসের গন্ধ ম-ম করছে। পাশে সরাইখানা, ডাক্তারখানা, ওটাকে কি বলে, শিক্ষায়তন! ওটা কি একটা বাস! ওগুলি কি, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী—সে তো সবই জানে—সবই টের পায়, মনে রাখতে পারে—তবে মাঝে মাঝে কথাগুলি কুয়াশার মধ্যে চলে যায় কেন? সে নিজেকেই বলল, তুমি একটা ছাগল।

সে নিজেই আবার হাসল। থুতনিতে দাড়ি, চুল লম্বা, ছেঁড়া তালিমারা লুঙ্গি, তিনটে সার্ট গায়ে—কোথায় কবে কিভাবে পেয়েছিল—হ্যাঁ মনে আছে, সেই একটা বড় শহরে, শীতে কুঁকড়ে পড়েছিল একটা জানালার নিচে—ভদ্রমহোদয়া দুঃখে কাতর হয়ে তার

স্বামীর পুরানো তিনটে ছেঁড়া সার্ট তাকে দান করেছিল। মহোদয়া বড়ই ভাগ্যবতী। মানুষের দুঃখ চোখে সয় না। জানালার নিচে এহেন দৃশ্য তার পক্ষে হজম করা কষ্টকর ছিল। সুতরাং এমন সুন্দর দেশ—কি বিচিত্র দেশ, নদী-নালা শহর ঘর বাড়ি শস্যক্ষেত্র এবং বিবাহ প্রজনন থেকে সুকৌশলে তার মতো মানুষদের জন্ম, দিন দিন তারা সংখ্যায় বাড়ছে। গাড়ি ঘোড়া ইঁট কাঠ, বাতায়ন বীথি সুচারু কৌশলে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ঢেঁড়া পেটানো—সে এবার হাতে হাত ঘসল। হ্যাঁ টের পাচ্ছে ওটা তার নিজেরই হাত। সে গালে হাত রাখল—হ্যাঁ বুঝতে পারছে এটা তার নিজেরই গাল। এতক্ষণ সবই মনে হয়েছিল অপরের। কোন অনুভূতি ছিল না এতক্ষণ। গালে হাতে পায়ের আঙ্গুলে নাকে কপালে অনুভূতি ফিরে আসছে। খুবই মজা লাগছিল তার। সে আবার তার গাল, পায়ের আঙ্গুল এবং কপাল ফিরে পাচ্ছে। বড়ই সৌভাগ্যবান সে। কটা মানুষের এমন সৌভাগ্য হয়েছে জীবনে। হারিয়ে গেলে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার হয় না। সব আবার সে ফিরে ফিরে পায়। সে চিৎকার করে বলল, মার কৈলাশ।

সে আনন্দে দু হাত তুলে দিল ওপরে। তারপর উঠে দাঁড়াল। রোদে সামান্য তাপ যখন আছে তখন হাঁটা যাক। দঙ্গল বেঁধে মানুষজন অফিস কাছারিতে যাচ্ছে। রিক্স প্যাঁক প্যাঁক করছে। বেলা বেশ হয়ে গেছে। কাল সেই ছোঁড়াগুলো তাকে যেতে বলেছিল—কোথায় সেটা—হ্যাঁ মনে পড়ছে শহরের ওটা উত্তরের দিক। ওখানে অনেক রাজরাজড়ার ভগ্ন প্রাসাদ আছে। রাজরাজড়ারা কোথায় এখন খুঁজে দেখলে হয়। ওরা বুঝি জানত না মানুষ মরে যায়। আহা সে কেন আরো একশ বছর আগে এ শহরটায় আসতে পারে'নি। দুঃখে সে বিমর্ষ হয়ে গেল। তাহলে সে লিখে তখনও রাখতে পারত— মানুষ মরে যায়।

তার এখন দুটো ডিগবাজি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোন গাছে চড়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কত রকমের ইচ্ছে যে গজায় শরীরে।

হাত-পার মতো গজাতে চায়—শরীরে লটকে থাকতে চায়। তারপরই সে বলল, ওম শান্তি! এত কিছু শরীরে গজানো ভাল না। তাতে চিত্ত শুদ্ধি থাকে না। সংযম অনুশীলন করতে হয় এবং সংগচ্ছদ্ধং তারপর কি—প্রার্থনা সভায় সেই বড়দির মুখ—কি সুধা পারাবার! যেন পৃথিবীতে তাঁর একটাই কাজ, প্রার্থনা সভায় ওম শান্তি উচ্চারণ।

সে একদিন প্রশ্ন না করে পারেনি। শিক্ষার ইতিহাস নামক বিষয়ে একটা ক্লাস নিতে এসেছেন বড়দি। বুনিয়াদী কলেজের প্রিন্সিপাল, খদ্দর পরেন এবং শিক্ষায় স্বাবলম্বন এবং কর্ম মাধ্যমে শিক্ষা এইসব বিষয় ছিল প্রশিক্ষণের অন্তর্গত। সে-ত বেশ মনে করতে পারে সব। প্রশ্নটা যেন কি—প্রশ্ন! মাথায় টোকা মারল একটা—না মনে পড়ছে না, এত গুলিয়ে ফেললে যে শেষ পর্যন্ত কি হবে! বেশ তো সব সে মনে করতে পারছিল—ওম শান্তি এবং সেই শব্দ উচ্চারিত হলে সে গড় গড় করে ঘোড়ার গাড়ি হয়ে গেল। হাটু মুড়ে বসল। ঘোড়ার মত কদম দিতে থাকল। তার যখন কিছুই মনে থাকে না, এমন কি সেদিনের প্রশ্নটা, যার জন্য কিউমিলেটিভে তাকে বড়দি ফেল করিয়ে দিয়েছিল এবং যার ফলে সে আর চাকরি পায়নি, প্রেমিকা পলাতক, এ-সবের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্যন্ত ঘোড়া হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। লাল রঙ ঘোড়ার। মুখ লম্বা, কান খাড়া, লেজে গুচ্ছ লোম। এত সব নিয়ে একটা ঘোড়া হওয়া সত্যি সোজা কথা না। সে বরং কিছুটা ঘোড়া কিছুটা মানুষ হয়ে থাকবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে হাঁটতে থাকল এবার এবং কিসে হোঁচট খেতেই প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল, সে বলেছিল, আচ্ছা বড়দি ঘোড়া ঘাস খায়।

জটিল তত্ত্ব নিয়ে বড়দির মাথাটা বোধহয় গরম ছিল। শুধু বললেন, বোস। আজে বাজে কথা বলবে না।. মন দিয়ে শোন। সে মন দিয়ে শুনতে শুনতে সত্যি উদাস হয়ে গেছিল। শিক্ষার এত বড় হাতিয়ার থাকতে দেশটা এত অশিক্ষিত থাকে কেন—বারবারই যখন এটা ভাবছিল তখনই বড়দি আবার ক্লাস রুমে হাঁকলেন, এই রমেন জানালায় কি আছে?

—আকাশ আছে বড়দি।

—আর কিছু নেই? খুব গম্ভীর গলায় বললেন বড়দি। বোঝাই যাচ্ছে খুব চটে যাচ্ছিলেন।

সে বলেছিল, আছে।

তিনি দুম করে বই বন্ধ করে দিলেন। বললেন, কি ভেবেছ?

—ভাবছিলাম ঘোড়া ঘাস খায় কি না?

—ঠিক আছে ওটা পরে ভেব। এখন নোট নাও। বড়দির কৌশলটা সে ধরতে পারেনি। বাকি নটা মাস বড়দি তাকে এড়িয়ে চলত। অন্য দাদারা তার সাহস দেখে খুব উৎসাহ দিত। আর বুনিয়াদি কলেজের ভাই-বোনেরা বলত, আপনার যে মাঝে মাঝে কি হয়! আপনি এত জানেন, আর এটা কেন ভুলে যান ওদের হাতে কিউমিলেটিভ বলে একটা মারাত্মক অস্ত্র আছে।

তখনই কেন জানি তার মনে হল, সেতো সবই মনে করতে পারে তবে আর হাফ-ঘোড়া হয়ে থাকবে কেন। সে একটা সোজা মানুষ সে এবার কিছুটা পথ বুক ফুলিয়ে হেঁটে গেল।

তখনই রিনতি আবিষ্কার করে ফেলল, আরে ওই ত সেই লোকটা ওর হাতে কড়াই শুঁটির ব্যাগ। সে ডাকল, এই যে এই যে।

রমেনের মনে হল চেনা গলা—গতকাল এই গলায় কেউ যেন বলেছিল, আর একটু আগে এলে না কেন, তোমাকে কচুরি আলুর দম খাওয়াতে পারতাম তবে। ওর জিভ টস টস করতে থাকল। সে ভাল মানুষের মত চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, সেই মেয়েটা ছুটে আসছে। কাছে এসে বলল, কি গেলে না ত?

—যাব যাব। যাবরে খুকী!

—তুমি কাল রাতে কোথায় ছিলে?

—কাল রাতে?

—হ্যাঁ কাল রাতে।

—শহরেই ছিলাম। গাছপালা দেখে বেড়াচ্ছি।

—আর কিছু লেখনি?

—লিখেছি। অন্তত একজন পাওয়া গেছে যে, তার বই-এ কি লেখা হচ্ছে জানার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব। তার পাঠক। সে বলল, এস। তারপর পুলিশ ব্যারেকের কাছে রিনতিকে নিয়ে যেতে থাকলে সূর্য, গোপাল, বিশু দৌড়ে এল—কোথায় যাচ্ছিস রিনতি? ব্যাগটা দে।

রিনতি ব্যাগটা রাস্তায় রেখে হাঁটতে থাকল। ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল না। রিনতি দেওয়ালের কাছে গেলে দেখল—ওপরে লেখা—মানুষ মরে যায়, নিচে লেখা—তেলে ভেজাল দেয়। লোকটার মুখে আশ্চর্য আত্মতৃপ্তির হাসি। রিনতির কেন জানি চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যায় উদাসবাবু পান চিবুতে চিবুতে এল। লক্ষ্মীবার। পূর্ণিমা এ-দিনে লক্ষ্মীব্রত করে থাকে। প্রসাদ দেয় একটা করে বাতাসা। দেওয়ালের তাকে তারকেশ্বরের ফটো। পাশে লক্ষ্মীর পট। নিচে ছোট পেতলের ঘট বসানো। কিন্তু বারান্দায় উঠে দেখল উদাসবাবু, ঘরে শেকল তোলা। পূর্ণিমা এ-সময়ে কখনও কোথাও যায় না। দরজায় শেকল তোলা দেখে হকচকিয়ে গেল। তা ভালই হল, বলা যাবে, এসে দেখি শেকল তোলা—কি করি কিছুক্ষণ দেখে চলে গেছি। চোরাইমালের টাকার আধাআধি ভাগ উদাসবাবুর। বাকিটা সে নিয়ে এসেছিল পূর্ণিমাকে দেবে বলে, সেই পূর্ণিমার ঘরেই শেকল তোলা। রিনতিকেও দেখল না—যা একখানা জাহাঁবাজ মেয়ে কোথায় ঘুরছে কে জানে! যেন শাপে বর হল উদাসবাবুর—গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে কিছুদিন কেমন হয়। অবশ্য পার পাবে না। পূর্ণিমা ঠিক ওর আস্তানায় চলে যাবে। উদাসবাবু এটা পছন্দ করে না। ইজ্জতের ব্যাপার—পাড়ায় লোক দেখলে কি ভাববে। সুতরাং কি করবে বুঝতে পারছিল না। দরজার পাশে সেই ডবকা ছুঁড়িটা

দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দের আসেনি। উদাসবাবু একবার চোখ তুলে ভাবল দেখি টোকা মেরে বাজে কি না। তারপর পলক পড়তে না পড়তেই সদরে পূর্ণিমা। খুব হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকছে। উদাসবাবুর আর বাজিয়ে দেখা হল না। একগাল হেসে বলল, কোথায় গেছিলে!

—কোথায় আর যাব। মরতে গেছিলাম। আমার মরণ হয় না কেন বাবা তারকেশ্বর!

খুবই রণচণ্ডী। উদাসবাবু একটু ঘাবড়ে গেল। সে বলল, কী হয়েছে!

পূর্ণিমা আঁচল সামলে দরজার শেকল নামিয়ে ভেতরে ঢুকল। সে উদাসবাবুকে দেখল না। ঘরে ঢুকে তারকেশ্বরের ফটোর নিচে কপাল ঠুকতে থাকল।

কপাল ফাটবে। উদাসবাবু ঘরে ঢুকে বলল, বলবে তো—না বললে বুঝি কি করে!

পূর্ণিমা কপাল ফাটবে ভেবেই হয়ত আর কপাল ঠুকল না। থম মেরে বসে থাকল।

উদাসবাবু পকেটে হাত দিয়ে বলল, তোমার টাকাটা।

পূর্ণিমা কেমন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর টাকা!

এত বৈরাগ্য হজম হবে না। উদাসবাবু উঠে কাছে গেল। উবু হয়ে বসল।—ইস কি করেছ। কপাল ফুলে উঠেছে।

পূর্ণিমা কপালে হাত রেখে বুঝল সত্যি ফুলেছে। মাথায় রক্ত উঠে গেলে তার কিছু মনে থাকে না। সে আয়নায় এবার মুখটা দেখতে থাকল। কাল বাবুদের বাড়ি গেলে কর্তা-মা ঠিক প্রশ্ন করবে, তোর কপালে কিসের দাগরে। পূর্ণিমা তারপরই বলল, কই দাও! সে উদাসবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—খুব বেশি পাওয়া গেল না।

—কত দিল।

—নবীন সাহাকে চেন?

—না বাপু চিনি না। টাকা গুণতে গুণতে বলল, অমা, এ-কটা টাকা।

উদাসবাবুর ইচ্ছে হল, খুব একটা রাম খিস্তি ঝাড়ে। শুধু শিক্ষকতা করে বলেই পারে না। যেমন সে বলতে পারত, সারা জীবনে এত টাকা দেখেছিস···

—তা কি করি বল। নবীন সাহা বলল, মাস্টারমশাই চোরাই মালের দাম এমনিতেই হাফ হয়ে যায়, তা শালগুলি মন্দ না। শ'-খানেক টাকা কম হবে। পুরো দাম দিলে লোকে কি বলবে বলুন। পঞ্চাশ টাকা করে নিয়ে যান। তা তোমার তিন পঞ্চাশ কত হয় বল!

—কি জানি বাপু কত হয়!

—কিছুই জান না—তোমাদের যে কি হবে! দেড়শ টাকা হয় বুঝলে!

—কই এখানে ত তুমি আমাকে তিন কুড়ি পনের টাকা দিলে।

—আধাআধি।

—না উদাসবাবু আধাআধি কর না রিনতি এমনিতেই চটে লাল হয়ে আছে—অ আমার রিনতিরে।

—কি হল। এমন করছ কেন?

—রিনতিকে খুঁজে পাচ্ছি না উদাসবাবু।

—বলছ কি!

—সত্যি বলছি। বাড়ি থেকে রেগেমেগে কোথায় চলে গেছে। দুপুরে ফেরেনি, সন্ধ্যা হয়ে গেল ফিরল না। তা তুই দুদিন পর সোমত্ত মেয়ে বনে যাবি, এখন তোর ঘুর ঘুর করলে চলে।

—ফিরে আসবে ঠিক।

—সারাটা দিন কিছুই খায়নি। আমার রিনতি রে।

না সত্যি পারা গেল না। আজ তবে আসি।

পুর্ণিমা কেমন অবাক চোখে তাকাল। টাকাটা!

—দিলাম তো'।

—ও দিলে হবে না।

—কত দিতে হবে।

—আরও কুড়ি দাও।

—না, বেশি চাইছো আমার গচ্চা গেছে অনেক। আধা-আধিতে হয় না। জানাজানি হলে, ধরা পড়লে এ শর্মাই পড়বে।

—ও কেউ জানবে না বাবু। তুমি আর কুড়িটা টাকা দাও তোমার মায়ের দিব্যি, বাপের দিব্যি—দাও। নইলে রিনতি আমার একটা চুল আস্ত রাখবে না। উদাসবাবু বলল, দিলেই ত খরচ করে ফেলবে। থাক না আমার কাছে।

পুর্ণিমার কথাটা মন্দ লাগল না। এই একটা মাত্র মানুষ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে।

বলল, তুমি বস একটু। দেখে আসি গঙ্গার ধারটা।

—ওখানে গিয়ে কি করবে?

—ওদের একটা ডেরা আছে। ওখানে যদি থাকে।

—ঠিকই আছে। ভাববে না। এল বলে!

—আমি কি অত ভাবি—মটর বলল, সব মেয়ে চালান হয়ে যাচ্ছে বাইরে। ওদের দিয়ে সব করায়।

—হ্যাঁ দিনকাল খুব খারাপ। মানুষ তো স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বাধীন মানুষ সবই করতে পারে।

—তা আইন নেই। ওদের শায়েস্তা করতে পারে না সরকার।

—স্বাধীনতায় হাত দেওয়া হবে না তবে! উদাসবাবু এবার লম্বা একটা বোতল বের করে বলল, রাখ। চাদরের নিচে এটা লুকিয়ে রেখেছিল। বলল, চানাভাজা এনেছি। মন্দ না। খুব খাস্তা।

পুর্ণিমা বলল, তুমি বস। আমি আসছি? আমার মনটা খোঁচাচ্ছে। মটর ভয় ধরিয়ে দিয়েছে বড্ড। ও নাকি কাগজে দেখেছে, রিন্টির মতো মেয়েদের চালান করে দেওয়া হচ্ছে। এত পইপই করে বলি, ও রিনতি তুই বড় হয়ে যাবি—যাস না মা অদ্দুরে, তোর নাক মুখ মা বড় টানে মানুষকে—লোভ-লালসা তো ভুর ভুর

করছে। তা মেয়ে আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল – রিনতিরে তোরে নিয়ে কত আশা!

—আঃ কী হচ্ছে। উদাসবাবুর কথায় কেমন সম্বিত ফিরে পেল পূর্ণিমা।

—রিনতি তো তোমার এমন কত দিন করেছে! একবার তো দু রাত এলই না।

তখন কি রিনতির উঠতি বয়স—ও আমার রিনতি রে।

— না উঠি। আর পারা গেল না!

উদাসবাবুর কথায় পূর্ণিমার সম্বিত ফিরে এল। সে কখন রিনতির নামে বিলাপ শুরু করে দিয়েছে খেয়ালই নেই। বিলাপ করার মতো কিছুই হয়নি; তবু বিলাপটা গলার কাছে এসে আজকাল পূর্ণিমার আটকে থাকে। ফাঁক পেলেই ফস করে উঠে আসে। এতটা ভাল না। সে চোখের জল মুছে বলল, না বাবু তুমি যেও না। বড্ড একা হয়ে যাব। ভয় লাগে।

উদাসবাবু এবার বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন। সারাদিন পর এই একটু সময়—যা তার জীবনের সব। সারাটা দিন সে বড় ব্যস্ত থাকে। সকালে উঠেই চা খাবার করতে হয়। বিড়ি কিনতে হয়। জামা কাপড় কাচতে হয়, দাঁত মাজতে হয়—একজন মানুষের যে কত কাজ! পাঁড়েজীর হোটেলে ছুটো নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয় বাস ধরতে। দশটার বাস ধরতে পারলে ঠিক এগারটায় স্কুলে পৌঁছানো যায়। না পেলে এক ঘণ্টা লেট। সময়টা বড় বিশ্বাসঘাতক। প্রায় দিনই সে এত হন্তদন্ত করেও দশটার বাস ফেল করে। তখন কর্তব্য-কর্মে অবহেলা নামক একটা জন্তু তার মাংস কামড়ে খায়। স্কুলে সে জাঁদরেল মাস্টার। সহজ ব্যাকরণ তার মুখস্থ। সমাজ ব্যবস্থা ঠিকঠিক নেই বলে তার মত মানুষকে একটা পচা ইস্কুলে পড়ে থাকতে হচ্ছে। এবং এই নিয়ে মাঝে মাঝে সে ইস্কুলের হেড-টিচারের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেয়। বোঝেই না কত কপালগুণে উদাস শর্মা একটা শহর থেকে বনজঙ্গলের মধ্যে ইস্কুল করতে আসে।

বাস রাস্তা থেকে আধ মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে হয়? একটা মুসলমান পাড়া, একটা উদ্বাস্তু পল্লী পার হয়ে তার ইস্কুল। রাস্তায় লোকজন বড় বেশি হেগেমুতে রাখে। মোরগগুলির উপদ্রবই তাকে বেশি নাজেহাল করে। কুক্কুটের মাংস হিন্দুরা খায় আজকাল। তার বমি পায়। যেভাবে বিস্টা থেকে পোকামাকড় ধরে ধরে খায় এবং তাকে দেখলেই ঠোকরাতে আসে তাতে করে ফৌজদারী আদালতে যাওয়া যেতে পারে। সে একটা হাতে লাঠি রাখে আজকাল। এতে তার শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই লাভ হয়। যখন যেভাবে দরকার লাঠির সদ্ব্যবহার সে করে চলে—কখনও মোরগ ঠোকরাতে এলে লাঠি নিয়ে সে তাড়া করে যায়। বৃষ্টির সময় জলকাদা ভাঙতে হয়, লাঠিটায় ভর দিয়ে হাঁটে। গু-মূত দেখলে লাঠিতে ভর দিয়ে লাফ মারে। সাপ-খোপের উপদ্রব্যের সময় লাঠিটা বড়ই তার প্রিয়জন। লাঠি এবং বগলে ভাঙ্গা ছাতা এ দুটি সম্বল করে উদাসবাবু এই আধ মাইল রাস্তা হন হন করে হেঁটে যাবে তাতে—কিন্তু পারে না, বিশ্বসংসারে তার প্রতিপক্ষ যে কত—এবং ইস্কুলে গিয়ে সে হাঁক পাড়ে ও শনে, ও লাটু, ও মীরা, কে আছিস, জল দে। পাতকুয়ো থেকে জল তুলে দিলে—উদাস-প্রায় হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ফেলে। তখন ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করেই এদিকটায় থাকে না। উদাসবাবু না সাধু বাবাজী তখন ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যি দ্বন্দ্ব লেগে যায়।

বিদ্যালয়ে পৌঁছে প্রথম দায়িত্ব পালন জাতীয় সংগীত। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে যায়। সুবোধবাবু সুকুমারবাবু রমা নীতি হেড টিচারের পাত্তা থাকে না। সবাই যে যার সময়মত আসে। সুতরাং অন্ততঃ জাতীয় সঙ্গীত সময়মত গাওয়া না হলে ইস্কুলের বদনাম। জাতির বদনাম। তিনি সবাইকে জড় করে জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে দিলে কোন্‌দিকে কে যে গান গেয়ে যায় খেয়াল রাখতে পারে না। তখন উদাসবাবুর মরণ, এই একসঙ্গে গা। হল না। আবার। আহা জনগনমন—ওরে বানের জলে সব ভেসে গেলরে—ধর ধর। আবার আবার ধরতে হয়—আবার গোড়া থেকে। একটা হল্লার মতো লাগে।

তারই মধ্যে উদাসবাবু চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। গানের মর্মার্থে হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। কখনও অশ্রুপাত ঘটে। জনগণমনঅধিনায়ক — সে নিজেই তখন অধিনায়ক। উদাসবাবু সময় মত ইস্কুলে যেদিন না যায়, সেদিন ছাত্ররা সব মাঠে হল্লা করে। জাতীয় সঙ্গীত এক নং হয়ে গেলে, ঘণ্টা পিটিয়ে একটু পোষ্টাফিসের দিকে চলে যায় উদাস। পটলবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে খুব। ইস্কুলের নীতির সঙ্গে সামান্য প্রেম টেম হচ্ছে। এই নিয়ে কতদূর কি এগোল—পাশে বসে ফিস ফিস কথাবার্তা—সুকুমারবাবু এসে দেখেন—ছেলেরা মাঠে হল্লা করছে—তখন জাতীয় সঙ্গীত দুই নং। এসেই সবাইকে জড় করে অন্ততঃ গানটা গাইয়ে দেওয়া হেড-টিচারের ইচ্ছা। নির্দেশ, যিনি আগে আসবেন, তিনিই ছাত্রদের দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াবেন। সুকুমারবাবু আগে এসে গেছেন ভেবে জাতীয় সঙ্গীত দুই নং শুরু হয়ে যায়। তাঁর কত কাজ, জমির চারাগাছগুলি কত বড় হয়েছে একবার দেখে এলে হয়। তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে জমির চারাগাছ দেখতে চলে যান। সুতরাং উদাসবাবুর মনে হয়, কোন কোনদিন জাতীয় সঙ্গীত ছয় নং পর্যন্ত হয়ে থাকে। ছ-জন ছবার গেয়ে ইস্কুলের কাজ শুরু করলে পড়াশোনার আর কোন বিঘ্ন থাকে না। হেড-টিচার নিজের এত জমিজমা এবং রাজনীতি বিষয়ক গোলক-ধাঁধার মধ্যে আছেন— যে, তাঁর সময়ই নেই সব দেখার। তিনি আসেন দয়া করে, যান দয়া করে। সই করেন দয়া করে। বড় বড় কথা বলেন দয়া করে। তাঁর দয়ার অন্ত নেই। তাঁর শিক্ষক সমিতি আছে, তাঁর বক্তৃতা আছে, তাঁর সমাজসেবা আছে, তাঁর ইনস্যুরেনসের এজেন্সি আছে, তাঁর মুদিখানা আছে, তাঁর এক বউ একগণ্ডা ছেলেমেয়ে এত সব নিয়ে বেচারার পক্ষে কিছু করাও কঠিন। কেবল একটা বিষয়ে হেড-টিচার উদাসবাবুর চেয়ে খাটো—ব্যাকরণ কৌমুদীটা তাঁর পড়া নেই। পড়া নেই স্বীকার করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, উদাস শর্মা বুঝতে পারে না। সবার তো সব থাকে না। কিন্তু সেটা নিয়েও ধন্দ লাগিয়ে দিয়েছে। হেড-টিচার ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্র

মাঝে মাঝে আওড়ে বলেন, বুঝলেন, উদাসবাবু বিদ্যাসাগর তুমি দয়ার সাগর বিখ্যাত ভুবনে, মাইকেলের সেই পংক্তি দুটি মনে আছে উদাসবাবু।

—খুব আছে। ।

—সেই দয়ারসাগরের কথা ভাবুন। গলদ রাখবেন না মনে। কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

উদাসবাবুর সবই কপাল। এক দয়ার-সাগরে শেষ নেই, আবার তার ওপর বিদ্যাসাগর। হেট-টিচার শালা বেজন্মার বাচ্চা। তুমি এখন দুটোই হয়ে গিয়ে উল্লম্ফন দেবে বুঝি। তুমি এখন দয়ারও সাগর, বিদ্যারও সাগর। সুকুমারবাবু হাঁ করে বলেন তখন, তা যা বলেছেন! তারপরই উদাসবাবুর মনে হয়, দুনিয়াটাই কেমন বড় বেশি হামবড়াভাবে ভরে গেছে। বিদ্যা বিনয় দান করে। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। হেড-টিচারকে ভয়ংকরীতে পেয়ে গেছে। বিদ্যা বিনয় দান করে—সে তাকিয়ে হতবাক, পূর্ণিমা গালে হাত দিয়ে ভাবছে। সে উঠে বসল, বলল, বুঝতে পার!

সহসা পূর্ণিমা চোখ তুলে তাকালে, বলল, বিদ্যা কি করে?

—আমার মাথা-ব্যথা খুব বেশি। মেয়েটাকে আর আস্কারা দিও না।

—আমি আস্কারা দিই!

—তা না হলে বের হয় কি করে? বুঝলে বিদ্যা বিনয় দান করে। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ কার লেখা জান।

—ও উদাসবাবু তোমার কি ভীমরতি হয়েছে।

—বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ যে দিলাম, বললাম রিনতিরে পড়াও—মাতগতি ফিরতে পারে, তা করলে না। এখন ঠেলা সামলাও। ভেবে কি হবে?

শীত বেশ প্রচণ্ড পড়েছে। উদাসবাবু বললেন, লাগাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাতগুলা কন কন করছে।

—রিমতিটা এল না।

—এসে যাবে। বলে গ্লাসে কালীমার্কা ঢেলে দিয়ে বলল বিদ্যাসাগর মশাইর জীবনে কত ব্যথা এখন বুঝতে পারি পূর্ণিমা।

—বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর কেন করছ? সেটা কি বস্তু উদাসবাবু।

উদাসবাবু গলায় ঢেলে বললেন, কিছুই জানলে না পূর্ণিমা কেবল ঝিগিরি করে গেলে! বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের অথার।

পূর্ণিমা বলল, অথার মানে?

—মানেটাতো বলতে পার। অথার জান না! অথার মানে যিনি বই লেখেন তাকে আমরা অথার বলি। বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয়ের অথার। কত বড় কাজ সে তুমি বুঝবে না পূর্ণিমা। জীবন কত বড় বুঝবে না ওকে ছোট রাখতে নেই। সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। বড় কাজ যে কজনা করে! ছোট কাজ সবাই করতে পারে। তুমি পার হেড-টিচার পারে আমি পারি। কিন্তু বর্ণপরিচয় লেখা—সেটা আর কেউ পারবে না। সত্যি বলছি পারবে না। তোমার দিব্যি রিনতির দিব্যি আর কেউ না। আমিও না।

উদাসবাবুর এই ঝামেলা। সারাক্ষণ বকবক করে। মাস্টার মানুষ যেখানে যা ভাল কথা লেখা থাকে মুখস্ত করে রাখে। তারপর রাস্তাঘাটে, একটা কুকুরের সঙ্গে মোকাবিলা হলেও সেই কথা। শুধু উগলে দেয়। হজম করতে পারে না। পূর্ণিমা যে ঝি গিরি করে সেও সেটা বোঝে সুতরাং উদাসবাবুর কথায় পূর্ণিমার চৈতন্যে ঘা দিল না। কেবল বারান্দায় কেউ উঠে আসে কি না দরজায় খুট শব্দ হয় কিনা, এবং কখন রিনতি চলে আসবে এই ভেবে বিছানায়ও উঠে যেতে পারছে না। দরজা বন্ধ করতে পারছে না। তার কিছুই ভাল লাগছে না। কি ভেবে বলল, তুমি বস উদাসবাবু, একটু দেখি।

উদাসবাবু হা হা করে উঠল। একা যাবে না। আমি আছি। সঙ্গে যাব। দেখি।

—যাবে, লোকে দেখবে না।

—লোক! লোক শব্দটি বড়ই অদ্ভুত। বলে তিনি চানা মুখে দিলেন আবার খেলেন। বললেন, তুমি যাও পূর্ণিমা—একা খেয়ে কি সুখ! বড়ই অদ্ভুত। এই লোক ভূলোক, ত্রিলোক শব্দগুলি মানুষকে ভারি ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।

পূর্ণিমার আবার ভেতর থেকে শোক উথলে উঠেছে। সহসা বিলাপ করার মতো কাতরে উঠল—রিনতি রে!

উদাসবাবু গোমড়া চোখে তাকাল—রিনতি ছাড়া বুঝি কেউ নেই! ধুস্ শালা উঠি!

—কে আছে বাবু! উঠবে কেন!

—কেন এই শর্মা।

—তোমার কত সমেস্যা বাবু, আমার সমেস্যা বুঝবে না। ত্রিলোক, ভূলোক, গোলোক, মুল্লুক নিয়ে আছ, আমার মত ঝির দরকার শুধু একটা সময়ে আর, কি দরকার বল বাবু?

উদাসবাবু পায়ের পাতা নাড়াতে থাকল ফর ফর করে কানের পাতা দুটো নড়ছে। সামান্য বিচলিত ভাব। সংসারে এটা যে কত বড় তাও পূর্ণিমা কী করে বুঝবে! দয়া দেখাই তাও খোঁটা। ধুস আর আসব না। পয়সা খসিয়ে বিড়ম্বনা। মুখ ঝামটা। এত সব একসঙ্গে ভেবেও বিচলিতই রয়ে গেলেন। কি জবাব দেবেন বুঝতে পারছিলেন না।

॥ ৭ ॥

কাঁকড়া বিছের মতো শীতটা শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মানুষজন সন্ধ্যা হতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা করে দিচ্ছিল। উত্তুরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টগুলি আলো দিচ্ছিল। মানুষজনের গায়ে শীতের শেষ সম্বলের মতো গরম জামাকাপড় যার যেটুকু আছে সব পরে প্রচণ্ড গতিতে হাঁটছে। হাঁটলে

শীত কমে যায়। রমেন এটা জানে বলেই বেঁচে আছে। হাঁটলে শরীরের রক্ত গরম হয় সে এটাও আজকাল জীবন দিয়ে টের পেয়েছে। সেজন্য শীতের সঙ্গে তার একটা লড়ালড়ি হয়। সারা রাত সে আর শীত। দুজনই দুজনের প্রতিপক্ষ। সে মুঠো তুলে হাওয়ার মাথায় ঘুসি মারে। শীত তখন ঝাপটা মেরে তার হাত কনকনে ঠাণ্ডা করে দেয়। বেশ চলে এভাবে, যখন আর পেরে ওঠে না, খড়ের গাদা অথবা আগুনের ফুলকি কোথাও পেলে চুরি করে নিয়ে আসে। নিশুতি রাতে সে একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। শুধু রাত, জ্যোৎস্না, কখনও অন্ধকার, কখনও শীতের পাতা নড়ে, কুকুর ডাকে, কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যায় এবং জোনাকিরা জ্বলতে জ্বলতে ফস্ করে চোখের সামনে এসে নিভে যায়। সবচেয়ে সেই আকাশ, এবং নক্ষত্রমালার নিচে সে আগুনের ফুলকি, মরাকাঠে ঘাসপাতায় জিইয়ে রাখে। আবার নিভে যায়, সে উবু হয়ে ফুঁ দেয়। আবার নিভে যায়, সে উবু হয়ে দু হাতে ভর করে ফু ফু ফু ফু না আর নেই। আবার ফু। ঐতো ফুলকিরা চিড়বিড় করে ফুটছে। ফু ফু ফু ফু। ছুটছে। ফু ফু ফু ফু ফু ···ফুটছে ফুটছে ফুটছে। তারপরই ফের ফস করে জ্বলে উঠলে সে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। ঘাসপাতা চাই। ঘাসপাতা চাই এবং তখনই মনে হয় কোথাকার সব বেওয়ারিশ ছেলের দল গুঁড়ি মেরে আসতে থাকে। সব শহরের মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওরা গুঁড়ি মেরে আসতে থাকে। যে যার যেটুকু সম্ভব ঘাসপাতা নিয়ে আসে। ফেলে দেয় সেই আগুনের ফুলকিতে। আগুন, আগুন—কি লেলিহান তার জিহ্বা দাবানলের মতো গাছের মগডাল ছুঁয়ে দেবে এবার। একবার একটা বড় অশ্বত্থ গাছে আগুন লেগে গেছিল। গাছটা পুড়ছে। সে রাতেই হাওয়া। এবং পরে সে মাস পার হলে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখেছিল, গাছটার কাণ্ডটা রয়েছে, এবং ঘুসঘুসে আগুনে কাণ্ডটা শুধু জ্বলছে, মানুষেরা যায়, দেখেও দেখে না। একটা গাছ, বড় অশ্বত্থ গাছ জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে গেল, জঠরে অদৃশ্য আগুন—বোঝা যায় না তার দাবানলে ভূমণ্ডল

কতটা বিনাশ হতে পারে। বুঝতে পারে না। অর্বাচীন মানুষেরা দেখেও একটু ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেয় না। আগুন নেভাবার কারো স্পৃহা নেই। কেবল অফিস-কাছারি, বাজার হাট, জঠরে আগুন, সে গাছের হোক মানুষেরই হোক—জঠরে আগুন আছে বলেই, আগুন মানুষকে খায়। আগুন মানুষকে খায় কথাটা লিখে রাখার মতো।

প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচবার জন্য সে এমন সব কথা ভেবে থাকে। শরীরের রক্ত দ্রুত হাঁটলে গরম হয়, আগুন জ্বাললে শীত নিবারণ হয়, আর অন্যমনস্ক থাকলে শীতের কষ্ট চলে যায়। সে একটা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা বলে গেছিল, রাতে আগুন জ্বালব, তুমি বাবু এস। ওদের মধ্যে একটা মেয়েও আছে। বেশ একটা দল আজকাল সে শহরে, গঞ্জে আবিষ্কার করে বুঝতে পারছে, তার না খেয়ে মরার আর একদম ভয় নেই। যে করে হোক শীত থেকে তারা তাকে বাঁচাবে, ক্ষুধায় অন্ন দেবে। তখনই দেখল, নদীর পাড়ে আগুন জ্বলছে। অন্ধকারে দূরের আগুনটাই এখন তার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। সে দৌড়ে যেতে চাইল। কিন্তু হাত পা বড়ই দুর্বল। সে জোরে দৌড়াতে পারে না। প্রায় সে কখনও হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর ফাটল পার হয়ে যখন পৌঁছাল, গলা শুকিয়ে কাঠ।

আগুনের চারপাশে বিশু সূর্য গোপাল। মাঝখানে রিনতি। শীতের ঠাণ্ডায় মানুষ কাবু। কুকুরেরা পর্যন্ত শীতে পালিয়েছে। তবু একটা কুকুর নির্জন বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করছে। এত বড় একটা শহর আছে নদীর পাড়ে বোঝাই যায় না। কি ঘুটঘুটি অন্ধকার! অদূরে শ্মশান। সেখানেও আগুন জ্বলছে। এবং এ-সময়ই রিনতির কান খাড়া হয়ে উঠল। ঘন ঘন শব্দ। কেউ যেন এগিয়ে আসছে। টলতে টলতে। লোকটার আসার কথা। লোকটার জন্য তারা মটরশুঁটি বিক্রি করে খাবার এনেছে। ওরা চারজন পেট ভরে খেয়েছে। এবং বাকিটা রেখে দিয়েছে লোকটার জন্য। এবং লোকটা পথ চিনতে ভুল করবে বলে বিশু বলেছিল, আজ না হয় তোমার বইটা নাই লিখলে।

লোকটা বলেছিল, সময় চলে যাচ্ছে।

—আমরা তোমার খাবার আনতে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে চল।

—সময় নেই।

—তোমার খিদে পায় না।

সে জামা তুলে পেট দেখাল।

—তুমি তো না খেয়ে মরে যাবে।

লোকটা হেসেছিল।

বিশু বলেছিল, নদীর পাড়ে আমরা থাকি। লেখা শেষ হবে কখন?

—দিনে দিনে শেষ করতে হবে।

—রাতে থাকবে কোথায়?

—এই পৃথিবীর কোন গাছতলায়।

—গাছতলায় থাকবে কেন। আমাদের ডেরায় চলে এস, শুতে পাবে, খেতে পাবে। আমরা আগুন জ্বেলে রাখব। অন্ধকারে আগুন জ্বলতে দেখলে টের পাবে, কাছেই আমাদের ডেরা।

রিনতি দেখল সেই লোকটার মতো কেউ আসছে। রিনতি বলল, ঐতো এসে গেছে।

সূর্য লাফিয়ে উঠে গেল। লোকটার জন্য সে খুবই টান বোধ করছে। লোকটা যে এক সময় খুব মান্যগণ্য মানুষ ছিল, চেহারাতে সেটা বোঝা যায়। বলল, বাবু এসে গেছ তবে!

এই ঠাণ্ডাতেও লোকটার নিদারুণ পিপাসা। বলল, জল আছে?

—জল আছে না আবার! কি করবে জল দিয়ে।

—খাব।

গোপাল এক দৌড়ে মাটির ঘড়া নিয়ে নেমে গেল নদীতে। জল নিয়ে এল।

রিনতি বলল, আগে কিছু খাও বাবু।

লোকটা বলল, আগে জল খাই।

কী ঠাণ্ডা! ওরা আগুন উসকে দিল। লোকটা বসে পড়ল আগুনের পাশে। তারপর আগুনের মধ্যে দুটো হাতই সেঁধিয়ে দিল। বরফ হয়ে আছে হাত পা। আগুনটাকে ভারি ম্যাড়ম্যাড়ে মনে হচ্ছিল তার। লোকটা চিৎকার করে বলল, ওরে আগুন কি জ্বলে না!

—জ্বলছে তো।

—তাপ উত্তাপ নাই কেন।

—জল খাও।

লোকটা ঢক ঢক করে জল খেতে থাকল। এবং হাত পা আগুনে সেঁকে নিচ্ছে। গরম হচ্ছে না। এত শীতেও মানুষের তেষ্টা পায়। মানুষের কত রকমের যে কষ্ট।

সূর্য শ্মশান থেকে কিছু পোড়া কাঠ এনে ফেলে দিয়ে বলল, কত আগুন চাই। যা লাগবে বলবে। তোমার জন্য আমরা সব করব। তুমি কেবল লিখে যাবে। মানুষ মরে যায় খুবই সত্য কথা না বাবু!

—মানুষ মরে যায় সত্যি কথা না!

—হ্যাঁ বাবু তুমি ঠিকই বলেছ মানুষ মরে যায়।

গোপাল বলল, আমার বাবাটা যে কোথায় গিয়ে মরে গেল।

—ঠিকানা দিয়ে যায়নি।

—ঠিকানা আর কোথায় রেখে গেল! রেখে গেলে তো খুঁজেই আনতাম।

—মরে গেছে ঠিকানা রেখে যায়নি সে কেমন কথা বাপু!

—সেইত! ঠিকানা রেখে গেলে যে আবার ধরে আনব। বাপের আর ইচ্ছে নেই বলেই হয়ত ঠিকানা রেখে যায়নি। কি জানি আবার যদি ধরে নিয়ে আসি?

লোকটা গুম মেরে থাকল। গোপালকে বড় বড় চোখে দেখল। নাক বেয়ে পোঁটা ঝরছে। সর্দি কাশি ওর লেগেই আছে। তা এই শীতে একটু পোঁটা পড়বে সে যেন ধন্বন্তরির মতো বিষয়টি ভেবে

দেখছে। তখনই রিনতি ভেরা থেকে শালপাতায় নিয়ে এল, আটখানা কচুরি এক খুরি আলুর দম। বলল, খাও বাবু।

—আহা, হা হা হা। খাবার। হা হা খাবার। বড়ই সুস্বাদু। বড়ই লোভনীয়। হা হা হা খাব। দে খাই। তোরাও খা। একসঙ্গে খাই। মানুষ মরে যায়। মানুষ তেলে ভেজাল দেয়।

ওরা সমস্বরে বলল, আমরা খেয়েছি।

—তোরা খেয়েছিস তালে। তোরা এখনও তবে খাস। খাওয়া শব্দটি বড়ই মধুর। মনে হয় না, খাওয়া বেঁচে থাকা বড়ই মধুর। বলেই লোকটা এক সঙ্গে গোটা চারেক কচুরি মুখে ঠেসে দিল, আলুর দুটো বড় টুকরো। মুখে ধরছে না, বুড়ো আঙুলে গুঁজে দিচ্ছে। যেন তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করতে না পারলে কেউ কেড়ে খাবে।

রিনতি বলল, গলায় আটকে যাবে। ও কি করে খাচ্ছে দ্যাখ।

সূর্য বলল, ওটা কি করছ বাবু!

গোপাল বলল, ওরে সর্বনাশ। লোকটা চোখ উল্টে দিচ্ছে দ্যাখ। কাসছে, কেমন বিষম খেয়েছে। চারপাশে সব খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে—দু হাত তুলে দিচ্ছে দু দিকে—সটান পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কাসতে কাসতে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে—এবং কেমন এক বিসদৃশ চেহারা। ওরা চারজনই ভয় পেয়ে গেল। মুখে জল ঢেলে দিল, তবু চোখ দুটো উল্টেই রেখেছে। রিনতি উবু হয়ে নাকে মুখে ফুঁ দিতে থাকল।

লোকটা তবু চোখ উল্টেই আছে। নড়ছে না। হাত পা আল্গা করে দিয়েছে। রিনতি হাত ধরতেই বুঝল, একেবারে ঠাণ্ডা শরীর। সে তাড়াতাড়ি কান পেতে বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনে বলল, বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। শীতে মরে যাবে মানুষটা হয় না! তাড়াতাড়ি আগুনের পাশে ওরা ধরাধরি করে লোকটাকে বসাল। তবু চোখ উল্টে আছে। ওরা হাতে আগুন সেঁকে লোকটার গালে কপালে লাগাতে থাকল। তবু চোখ উল্টে আছে। ওরা লোকটার চারপাশে আগুন জ্বেলে দিল। ঠাণ্ডায় অসাড় মানুষটা তবু চোখ উল্টে আছে। ওরা আর কি করবে বুঝতে পারল না। সূর্য বলল, ধর।

ওরা ধরে ফেলল।

সূর্য বলল, তুলে ধর।

ওরা সকলে হাত-পা ধরে তুলে নিল। প্যাঁকাটির মত শরীর। শুধু হাড় কখানা মটর মটর করছে। এই শরীর নিয়ে লোকটা কি লিখবে! রিনতি ডাকল, ও বাবু চোখ উল্টে দিলে কেন!

কোন সাড়া নেই।

সূর্য বলল, বই লেখা শেষ না করেই মরে যাবে।

এবারে লোকটার চোখ নেমে আসতে থাকল।

বিশু বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমরাও লিখব।

লোকটার চোখ দুটো এবার আরও নেমে আসতে থাকল।

গোপাল বলল, তুমি আমাদের ক খ লেখা শেখাবে। দু দিন পর তোমার আর তখন অন্য কাজ থাকবে না।

—আমরা শিখে নেব। তখন তোমার ছুটি।

লোকটা এবার হাই তুলল একটা, হাঁচি দিল দুটো এবং লোকটা হাত নেড়ে ইসারায় তাকে বসিয়ে দিতে বলল।

রিনতি তখন বলল, রাক্ষসের মত খাচ্ছিলে কেন?

সুবোধ বালকের মতো মুখ করে রিনতিকে দেখল লোকটা।

রাক্ষসের মতো খেতে গিয়েই বিপত্তি।

লোকটা এবার নিজের বুকে হাত রাখল। কষ্ট হচ্ছে। রিনতি লোকটার বুক ডলে দিতে থাকল। নামছে। বেশ নেমে যাচ্ছে। এবং নেমে গেলেই লোকটা কথা বলতে থাকল, আর কৈ!

রিনতি বলল, খেয়ে সহ্য হয় না যখন, আর খেয়ে কাজ কি!

লোকটা হাঁ করে দেখাল, জিভ লাল। খেয়ে সহ্য হয়। এখন কোথায় পড়ে আছে বাকি চারটে কচুরি আর আলুর দম, রিনতি আগুন থেকে কয়েকটা খড়কুটো জ্বেলে চার-পাশটা দেখল। পড়েই আছে—সামান্য বালি লেগেছে। তবু দু হাতে সাফ করে খেতে দিল লোকটাকে। সবটা দিল না। প্রথমে একটা কচুরি দু ভাগ করে আধখানা কচুরি আধখানা আলুর টুকরো। মুখে দিয়ে বলল, চিবোও

বাবু। আরও চিবোও। আরও আরও। গলায় আটকে গেলে বিপত্তি হবে। রিনতির কথা ফেলতে পারছে না। রিনতি যা যা বলছে লোকটা তাই করছে। এবং শেষ পর্যন্ত রিনতি চারটা কচুরি আলুর দম খাইয়ে বলল, এবারে জল খাও। সে এবার হাত দিয়ে শরীর দেখল, বুকে গরম বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। আগুনের পাশে বসে থাকতে থাকতে সারাটা শরীর গরম হয়ে উঠছে। এবং আবার সেই স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গেল। লোকটা বলল, তোরা ছিলি বলে এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম। শেষে বলল, তবু মানুষ মরে যায়।

তখনই শহরে আলো জ্বলে উঠল। শহরে আজকাল প্রায়ই রাতে আলো থাকে না। কে মজা করে এই আছে এই নেই খেলা খেলছে। কত সমস্যা মানুষের। এবং আড়তদার সুখলাল, ডালে ভুসি মেশাচ্ছিল, তেলে তার্পিন অয়েল, জিরের মধ্যে ঘাসের বীচি। দারোগাবাবু তামাক খাচ্ছে। কত সমেস্যা। বাড়িঘর হচ্ছে সব—ইঁট কাঠ যাচ্ছে, ইমারত উঠছে, গাছের পাতা নড়ছে, ছেলের বৌ মরছে, শ্বাশুড়িকে ধরে বৌ পেটাচ্ছে, সিনেমা-বাইস্কোপ—হেমা-মালিনী সঙ্গম হেথায় কি নেই বলছে—কত সমেস্যা মানুষের।

লোকটা বলল, ছুটছে।

হঠাৎ ছুটছে বলায় সূর্য বলল, কে ছুটছে বাবু।

—মানুষ ছুটছে।

—তা ছুটুক, এতে তোমার আমার কি। রিনতি ধমক দিল লোকটাকে। তুমি এখন বিশুদের ডেরায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাক। কাল আবার সকালে দেখা হবে।

—আর কোথাও যাব না?

সূর্য বলল, না।

—তা হলে বইটা শেষ হবে কি করে!

রিনতি বলল, সে দেখা যাবে বাবু, তুমি এখন ঘুমোও গে।

লোকটা রিনতির কথামতো উঠে দাঁড়াল। বিশু খড়কুটো জ্বালিয়ে ডেরায় এল। সব বিছানা কাঁথা খড় গাদাগাদি। দুটো তিনটে

শ্মশানের কুকুর আগেই জায়গা দখল করে ফেলেছে। রিনতিদের পোষা কুকুরটাও আছে। অন্য পাশে বিশু গোপাল সূর্য এবং লোকটা থাকবে। তখন রিনতি লোকটাকে একটা কাঁথা বিছিয়ে দিল। বলল, শুয়ে পড়। শুয়ে পড়লে আরও দুটো কাঁথা দিয়ে শরীর ঢেকে দিল। এই কাঁথা লেপ তোষক কোন্ মড়ার কেউ জানে না। কেবল বিশু বলতে পারে সব। সেই ঘরবাড়ির জিম্মাদার। এবং রিনতি তারপর বলল, আমি যাইরে।

সূর্য বলল, এগিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়া।

—ধুস। বলে সে অন্ধকারে দৌড় লাগাল। আর চিৎকার করে বলল, কাল সকালে যাস। আমার পিঠে আজ আছে। এবং তখনই শহরে হল্লা, সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে— আকাশে কি ভেসে যায়—নীল মতো একটা বাতি আকাশে ভেসে যাচ্ছে অনেক উঁচু দিয়ে। লোকে কি সব বলাবলি করছে! এবং হল্লা শুনে পূর্ণিমা ধড়মড় করে উঠে বসল। উঠে পড়ে দেখল সদর খোলা—রিনতিরে! বলে আবার বিলাপ জুড়ে দিল। যা সময়, বিপদ-আপদের ভয়ে পূর্ণিমার বড় শংকা। হল্লা শুনে ওর বুক কেঁপে উঠছে। যদি রিনতির কিছু হয়। বাইরে এসে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য—এবং সে লক্ষ্য করছেই না বাড়ির অন্য সবাই উঠোনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে আকাশে কি দেখছে!

উদাসবাবু অগত্যা বাইরে বের হয়ে এল। এবং বুঝতে পারল— ওটা উপগ্রহ। মানুষ কিনা পারে। মুখে উদাসবাবুর বিজ্ঞানের জয়যাত্রায়, হাসি ফুটে উঠল। বেশ মাতাল, তবে উদাসবাবু মাতলামি পছন্দ করে না। শরীর টলছে, তবু সে বুঝতে পারে পূর্ণিমা ওকে একরকম ঠেলে ফেলে দিয়েছে—ধম্মে সইবে না। এবং উপগ্রহ দেখে কিছুটা যেন সে উত্তেজনা সামলে নিয়েছে। উঠোনে সব অন্য মেয়েরা। সে ওদের পারতপক্ষে ছোঁয় না। বেশ্যা মেয়েদের বড়ই ঘৃণা উদাসবাবুর। টাকা পয়সা থাকলে পূর্ণিমাকে ভাল জায়গায় তুলে নিতে পারত। অথচ সনাতন শিক্ষার কদর নেই। কদর থাকলে

একটা ঝাড়ুদারের সমান অন্তত মাইনে দিত না সরকার। সব বড় বড় বুলি। উদাসবাবুর যে কি মনে হয়—এখন তো পূর্ণিমা কোথায় গেল দেখা দরকার। সে গা বাঁচিয়ে সদর ঠেলে বের হয়ে দেখল, একা পূর্ণিমা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। কেউ ফিরছে কি না লক্ষ্য করছে।

তখন উদাসবাবু পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ওটা উপগ্রহ।

পূর্ণিমা বলল, কি হয় ও দিয়ে।

—কতকিছু হয়। হাওয়ার গতি প্রকৃতি জানা যায়। ঝড় হবে কিনা জানা যায়। এক দেশ থেকে আর এক দেশে খবর পাঠানো যায়। চাঁদে মানুষ গেল—এই উপগ্রহ অভিযানে মানুষের কত কল্যাণ।

পূর্ণিমা বলল, মানুষের কত সমেস্যা।

উদাসবাবু এটা দেখেছে, কিছু বললেই পূর্ণিমার এক কথা মানুষের কত সমেস্যা। রিনতিরে রিনতি। সে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যেতে থাকল।

—কোথায় চললে।

—মরতে গো বাবু। আমার অমন লকলকে মেয়েটা।

উদাসবাবু বলল, মন স্থির কর পূর্ণিমা। অত অস্থির হলে হয়!

ঘণ্টা বাজল কোন কারখানায়। আটবার শব্দ হল। রাত আটটা। তখনই উদাসবাবু বলল, মঙ্গলগ্রহে প্রাণ আছে জান?

—সেটা কি আবার?

—আরে প্রাণ, প্রাণ থাকে না আমাদের।

—অঃ।

—সেই প্রাণ আছে মঙ্গলগ্রহে।

পূর্ণিমা ডাকছে, রিনতিরে!

—উপগ্রহ থেকে মঙ্গলগ্রহ—মানুষ কি না পারে।

—রিনতির যদি কিছু হয় তোমার উপগ্রহের ঠেলা বের করে দেব উদাসবাবু।

বড় দজ্জাল মেয়েমানুষ। ভাল কথা কানে তুলবে না। এখন কোথায় যাই। উদাসবাবুর কেন জানি মনে হল, পূর্ণিমাই সত্যি! মানুষের কত সমস্যা। সে বলল, পূর্ণিমা যাই তবে।

—যাও। আটকে রেখেছে কে?

—আমি আর আসব না।

—এস না। মাণিকবাবু আমায় খোঁজ করছিল।

শালা মাণিক, মিষ্টি বেচে বলে এত আস্পর্ধা। টাকার গরম।

—রিনতিরে রিনতি। বলতে বলতে নদীর পাড়ে এসে নামল। উদাসবাবু তখন বলল, কেউ নেই। বলেই পূর্ণিমাকে সাপটে ধরল। আর পূর্ণিমা একটা ঝ্যারাং মারল দু হাতে। ছিটকে উদাসবাবু দু হাত পিছুতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বলল, পূর্ণিমা তোমার পাপ হবে। আমি যদি সদ্ ব্রাহ্মণ হই, তোমার পাপ হবে।

পূর্ণিমা ডাকল, রিনতিরে রিনতি!

উদাসবাবু পিছু পিছু তবু হাঁটছে। কুকুরের মতো হাঁটছে। হাঁটছে। পাশে এসে বলল, অন্ধকারে একা আর কতদূর যাবে।

পূর্ণিমা ডেরার কাছে এসে ডাকল, রিনতিরে রিনতি!

ডেরা থেকে বিশু বের হয়ে বলল, মাসি!

—রিনতি কোথায়

—জানি না মাসি!

—তোরা জানিস না তো কে জানবে!

গোপাল ভয়ে ভয়ে বলল, বিকেলে দেখেছি।

—কোথায় দেখেছিস?

—এই নদীর পাড়ে।

—এখন কোথায়?

—-জানি না মাসি।

লোকটা তখন কাঁথা ফাতা ঠেলে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে বাইরে এল। কিম্ভূত চেহারার মানুষ, পূর্ণিমা দেখে ভয়ে টসকে গেল।

উদাসবাবু বলল, পূর্ণিমা অন্ধকারে দেখছ কি দাঁড়িয়ে।

লম্ফের আলোতে লোকটার অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। পলকা পাটকাঠির মতো দুলছে। শুকনো হাড় জিরজিরে চেহারার মানুষ না মানুষের ছায়া বোঝা ভার। গাছ পাতার মতো নিথর। পূর্ণিমাকে দেখেই যেন বলল, রিনতি খুব ভাল মেয়ে বাছা।

পূর্ণিমা বলল, তুমি দেখেছ বাছা।

—রিনতি এই চলে গেল।

—কোথায় ?

সে তো জানি না।

—আমার রিনতির কিছু হলে তোমাদের জেলে দেব বাছা।

উদাসবাবু আরও গম্ভীর গলায় বলল, সব কটাকে ধরে প্যাঁদানো দরকার। সংসারে আর মানুষ পায় না রিনতি! যত খারাপ লোকের সঙ্গে ওঠা বসা। তোমার আর মান সম্মান থাকল না পূর্ণিমা।

লোকটা যেমন টলতে টলতে বের হয় এসেছিল, তেমনি ঢুকে গেল ভিতরে। কুকুরগুলি বের হয়ে এসেছিল, লোকটার সঙ্গে ডেরার মধ্যে ফের ঢুকে গেল। গোপাল সূর্য বিশু পূর্ণিমা চলে গেলে পাছা ঘুরিয়ে নাচতে থাকল—ও আমার রিন্টি রূপ কথার আংটি…। উদাসবাবু দূর থেকে শুনে খচে গেল—শালা সব বেজন্মার বাচ্চা। তুমি কিছু ভেব না, রিনতির জন্য ভেব না। আর দুটো বছর কাটিয়ে দাও। ভাল মানুষজন দেখে ওকে বসিয়ে দেব।

পূর্ণিমা যেতে যেতে তখন বিলাপ করে কাঁদছে—ওরে রিন্টি, কোথায় গেলিরে! অভাগীর পোড়াকপালে কি না জানি আছেরে! অরে রিন্টি, আমার সখের সোনার আংটি …।

ঘরে ফিরে পূর্ণিমা দেখল রিনতি বারান্দায় মাথা গুঁজে বসে আছে। পূর্ণিমা বুকে বল ফিরে পেয়েই তেড়ে গেল, পোড়া-কপালী কোথায় ছিলি বল!

উদাসবাবু দার্শনিক গলায় বলল, যেতে দাও। ও নিয়ে আর মাথা গরম কর না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভাল। দিনকাল

খুবই মন্দ যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না। কখন কি হবে বলা যায় না।

অন্য ঘরগুলিতে তখন দরজা বন্ধ। একটা ঘর থেকে লোক বের হয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে দুজন লোক ঘরে ঢুকবে বলে লাইন দিয়ে আছে। একটা বেতের মোড়ায় বসে আছে বাড়িউলি। খক খক করে কাসছে আর চারিদিকে সতর্ক নজর। চোখে দেখতে পায় না। কেবল থেকে থেকে হাঁকছে, ও মটর এলি! এবং মটর না আসা পর্যন্ত দাওয়ায় বসে থাকবে। এ-সময়টায় মটর বাড়ি থাকে না। বেশ রাত করে ফেরে! তবু কি যে আছে বুড়ির, কিছুক্ষণ পরপরই হাঁক, ও মটর এলি! পূর্ণিমার গলা শুনে বলল, পূর্ণিমা রিনতি এয়েছে।

—হ্যাঁ মাসি।

—কোথায় গেছল!

—মরতে।

বুড়ি বলল, ও বাছা গাল দিও না। মরলে তোমার চলবে কি করে, আমার চলবে কি করে! উদাসবাবুর গলা পাচ্ছি।

উদাসবাবু ধরা পড়ে গেল। ওর ধারণা সে খুব চুপি চুপি আসে। কেউ টের পায় না। রোজই তার মনে হয় নামটা বুড়ি ভুলে যাবে। সবই ভুলে যায়। কিছুই মনে রাখতে পারে না, পূর্ণিমা এমন বলেছিল উদাসবাবুকে। এখানে ভয়ডরের কিছু নেই। কাক পক্ষী জানে না, কে আসে কে যায়—কিন্তু বুড়ির কাছে উদাসবাবুর গলার স্বরটাও চেনা। উদাসবাবু ঘরে ঢুকে বলল, বুড়ি রাম হারামী পূর্ণিমা। তুমি বলেছিলে সব ভুলে যায়—কৈ ভোলে না তো!

পূর্ণিমা বলল, তুমি এবার যাও। আমার মন ভাল নেই উদাসবাবু। ও রিনতি ঘরে আয়।

—তোমার কি মায়া দয়া নেই পূর্ণিমা!

—না।

—ঠিক আছে। বলেই ব্যাঙের মতো দু-লাফে ঘরের বাইরে বের হয়ে বলল, কাল আসব?

—না।

—মন ভাল থাকবে না বুঝি!

—শরীর ভাল থাকবে না।

—তবে?

—শরীর ভাল হলে।

—সে তো……

—হিসেব করতে হবে না। ও রিনতি ঘরে আয় বলছি। আর রিনতি উঠে যেতেই আলোতে উদাসবাবু রিনতির মুখ দেখে ফেলল। পরী, আস্ত একখানা ডানা কাটা পরী। কতদিন পর এই পরী দর্শন। সাফ সুতরো করে দিয়েছে দুপুরে পূর্ণিমা—উদাসবাবু কি করে টের পাবে। সাফ সুতরো করে রাখলে এই পরীর দাম লক্ষ টাকা। লক্ষ টাকা, লাখ টাকা, লাখ টাকায় কত টাকা—সে এক মুহূর্তে হিসেব করতে পারল না। কেমন গোলমালের মধ্যে পড়ে গেল। এবং এত গোলমাল মাথায় নিয়ে রাস্তায় বের হলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। তার চেয়ে আর একটু বসে যাওয়া ভাল। লাখ টাকার হিসেবটা পূর্ণিমার সঙ্গে যোগ বিয়োগ করে বুঝে নেওয়া দরকার। সে ঘরে ঢুকে তক্তপোষে বসে পড়ল। বলল, আমার মাথাটা ঘুরছে পূর্ণিমা। একটু বসব।

পূর্ণিমা চকিতে তাকাল উদাসবাবুর দিকে। চোখে সামান্য বিরক্তি। খলের কখনও ছলের অভাব হয় না। আসলে কোন রকমে পূর্ণিমার ভেতরে একটু দুঃখটুঃখ জাগিয়ে দেওয়া। কৃপাপ্রার্থীর মতো মুখ করে রাখলেই পূর্ণিমা আর এখন গলে যাচ্ছে না। শরীরটা তাতে খারাপ। ভাল মন্দও বুঝতে চায় না। তখনই উদাসবাবু বলল, লাখ টাকায় কত টাকা পূর্ণিমা।

—লাখ টাকা।

—হ্যাঁ, অঙ্কটা বোঝ। ঐ অঙ্কটা মাথা গুলিয়ে দিয়েছে।

—মাথায় তোমার কত রকমের অঙ্ক থাকে উদাসবাবু?

—এখন এক রকমের একটাই অঙ্ক—লক্ষ টাকা। তুমি লাখ টাকা পাচ্ছ।

—অঃ উদাসবাবু গরীব বলে ঠাট্টা করছ!

—ঠাট্টা না, ঠাট্টা না সত্যি। তুমি পাচ্ছ।

তারপরই উদাসবাবু বলল, রিনতি যা তো পান নিয়ে আয়। দুটো পান। একশ বিশ জর্দা। মনে থাকবে তো। একশ বিশ। মনে রাখিস। এবং রিনতি চলে গেলে, হিসেবটা বুঝিয়ে দিলে পূর্ণিমারও মাথা ঘুরতে থাকল। বলল, অঃ উদাসবাবু, তুমি পারবে তো! এবং যখন রিনতি ফিরে এল, দেখল দরজা বন্ধ। সে দুবার ডাকল, সাড়া পেল না। এটা তার আরও হয়েছে। সে পান দুটো নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। উদাসবাবু এবং মা কি যেন শলাপরামর্শ করছে গোপনে। গোপনে কিছু হচ্ছে টের পেয়ে রিনতি আবার হাঁটু মুড়ে বারান্দায় বসে পড়ল। লোকটার কথাই সত্যি—মানুষের কত সমস্যা। লোকটার কথা না, উদাসবাবুর কথা, না মা বলে থাকে কথাটা রিনতি এ মুহূর্তে আর মনে করতে পারছে না। ওর মাথাটাও মানুষের সমেস্যার কথা ভেবে কেমন ঘুরতে থাকল।

॥ ৮ ॥

লাখ টাকার হিসেব মাথায় ঢুকে গেলে মানুষের মাথা আর ঠিক থাকে কি করে। উদাসবাবু সারারাত ঘুমাতে পারল না। পূর্ণিমা সারারাত ঘুমাতে পারল না। রিনতি সকালে উঠে দেখল, মা কেবল হাই তুলছে। কাজে বের হবার নাম করছে না। বেলা না হতেই উদাসবাবু একটা ব্যাগ হাতে করে চলে এল। এবং ঘরে ঢুকে এক এক করে অত্যাশ্চর্য সব জিনিস বের করে রাখল মেঝেতে। রিনতি অবাক। একটা ডিম, একটা কলা, পাঁউরুটির প্যাকেট একটা, দু টুকরো মাছ এবং সব্জী কতকটা। পূর্ণিমা সব বুঝে নিচ্ছে। রিনতির খাবার তালিকা তৈরি করে দিল উদাসবাবু। সকালে ডিম কলা

মাখন রুটি, দুপুরে মাছ ডাল ভাত সঙ্গে সব্জি, বিকেলে একটা কমলালেবু, রাতে মেটের ঝোল রুটি। রিনতির একটারই অভাব। শরীর পুষ্ট নয়। লাখ টাকা রোজগার করার জন্য রিনতির শরীর পুষ্ট করে তোলা দরকার। এবং এ-জন্য উদাসবাবু পূর্ণিমার সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করে গেছে বোধহয়।

পূর্ণিমা বলল, ডিম হাফভয়েল হবে তো।

—দিতে পার। পোচ করে দিতে পার। হাফভয়েল এবং পোচ করার কৌশল উদাসবাবুই বাতলে দিল।

পূর্ণিমা বলল, মা আমার, ঘরে থাকিস। রোদে টো টো করে বেড়ালে শরীর খারাপ হয়।

মা এবং উদাসবাবু আজ কেমন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। একেবারে বিনয়ী, ভদ্র নম্র স্বভাবের। সংসারী মানুষের মতো খুবই বিবেচক হয়ে গেছে তারা।

রিনতি তক্তপোষে চুপচাপ বসে সব দেখছিল। মাংস মজ্জা কিছুই কমতি না হয়, যে-কোন ভাবে যত তাড়াতাড়ি পুষ্ট করে তোলা যায়। রিনতি সবই বুঝতে পারে। এবং চোখ দুটো তার কেমন জলে ভার হয়ে আসে। যত তাড়াতাড়ি সে অন্যঘরের মাসিদের মতো হয়ে উঠবে এতে মার তত সুবিধা, উদাসবাবুর সুবিধা। আর মাঝে মাঝে সে দেখছিল, উদাসবাবুর চোখ মুখ। ওর গোঁফে আবার কটা পাকা চুল। উত্তেজনায় গোঁফের চুল খাড়া হয়ে উঠছে। একটা হুলো বেড়ালের মতো মনে হচ্ছিল উদাসবাবুকে।

উদাসবাবু বলল, বুঝলে পূর্ণিমা চোখ থাকা চাই। মেয়েটার দিকে এবার ভাল করে নজর দাও।

পূর্ণিমা বলল, গরীবের হাতি পোষা বাবু।

—হাতী মরলেও লাখ টাকা সে জানে!

—জানবটা আর কখন?

—এবারে বুঝতে শেখ।

রিনতি তখন তক্তপোষ থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় এসে

দাঁড়াল। সব দরজাই বন্ধ। কেবল মটরদা বাজারে যাবার জন্য ব্যাগ হাতে সদরে দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটি সংসারে কেমন নির্বাক নিথর। এত সব ময়ফেল হয়, হল্লা হয়, থানাপুলিশ হয় কখনও মটরদার গলা পাওয়া যায় না। সেই মটরদা সদরে দাঁড়িয়ে ইসারায় রিনতিকে ডাকল, কাছে গেলে বলল, কাল কোথায় গেছিলি। তোর মা কাঁদছিল।

রিনতি কিছু বলল না।

—উদাসবাবু এত সকালে ?

রিনতি এবারও কিছু বলল না। কেন জানি রিনতি এই মানুষটিকে কিছু বলতে ভয় পায়। বড় সদাশয় মানুষ, সৎ মানুষ, ভাল মানুষের যা যা গুণ সবই মটরদার মধ্যে আছে। অথচ এমন একটা নরকে থেকেও মটরদার শরীরে কোন পাপ লেগে নেই। রিনতি কেবল বলল, শরীর পুষ্ট হলে কি হয় মটরদা।

মটর কেমন বিব্রত বোধ করল কথাটাতে। এটা একটা প্রশ্ন, এবং এমন প্রশ্ন যে রিনতির করা শোভা পায় না। সে বলল, শরীর পুষ্ট থাকা ভাল। সংসারে শরীরের দাম বড় বেশী।

রিনতি বলল, আমার শরীর পুষ্ট হলে কি হবে ?

মটর আবার বিব্রত বোধ করতে থাকল। এই বাড়িটাতে রিনতি বড় হয়ে উঠছে। এক মাথা চুল, ঘন কালো, চাঁপা ফুলের মতো ফুটে ওঠার মুখে—শরীর পুষ্ট হলে কি হবে জানতে চাইছে। এবং যেহেতু সে জানে এই মেয়েটাকে নিয়ে পূর্ণিমাদি আজকাল স্বপ্ন দেখে থাকে, মেয়েটা কোথাও গেলে আজকাল ভারি অস্থির হয়ে পড়ে এবং কি হবে ফলাফল জেনে সে রিনতির শরীর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। বড় ছিমছাম, সুন্দর দেখাচ্ছে রিনতিকে। রিনতিকে এত সুন্দর তার কোন দিন মনে হয়নি। কোন পাপ নেই, বালিকা রিনতি কিশোরী হয়ে যাবে বছর না ঘুরতেই। উদাসবাবু সব টের পেয়ে এখন যাওয়া আসা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে বোধহয়। এবং এই উদাস মাস্টারই রিনতিকে খাবে। খাবে কথাটা ভাবতেই মটর ভেতরে ভারি কষ্ট বোধ

করতে থাকল। সে ফের বলল, উদাসবাবু এত সকালে! তোর মা কাজে গেল না?

—জানি না। আমি কিছু জানি না মটরদা।

মটর সদর থেকে নামতে পারছে না। একজনের দরজা খোলার অপেক্ষায় মটরদা দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে রোজ পূজার ফুল বেলপাতা আনতে দেয়। ওটা না দিলে মটরদা সদর থেকে নেমে যেতে পারছে না। রিনতির সঙ্গে কথা বলে ঘরের মানুষটাকে জাগিয়ে দিতে চাইছে বোধহয়।

রিনতি বলল, বলব মাসিকে?

মটর বলল, ঘোমাচ্ছে বোধহয়। এমনিতেই জেগে থাকে। ডাকিস না।

—তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!

—বেশিক্ষণ না।

আর তখনই দরজা খুলে গেল। শরীরে আঁচল চাপা দিয়ে ঘুমকাতুরে এক যুবতীকে দেখা গেল—এবং হাত বাড়িয়ে সে কটা পয়সা দাওয়ায় রেখে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল—মটর উবু হয়ে পয়সা কটা তুলে নিল। পূজার ফুল বেলপাতা আর কিছু না। ঘুমের জন্য মুখটা বড় মায়াবী দেখাচ্ছিল। সারাদিন ঐ একবারই সে মুখটা দেখতে পায়। এবং ফুল বেলপাতা এনে সে নিঃশব্দে দাওয়ায় রেখে দেয়। ঘরে যে থাকে সে ঠিক টের পায় এক জন ভাল মানুষ তার জন্য দরজায় ফুল বেলপাতা রেখে গেছে। এবং এভাবেই এই বস্তি বাড়িটার দিন যায়—তারপর মটরদা শুধু ওদিকের ঘরে থাকে—কলতলা থেকে জল তুলে নেয় সবার দরজা খোলার আগে। কেউ তারপর জানেই না, এ বাড়িতে একজন ভাল মানুষের বাস আছে। এবং রিনতি কি ভেবে বলল, জান মটরদা কাল একটা লোক মরে যাচ্ছিল!

মটর বলল, কত লোকই তো মরে যায়।

—না না। লোকটা বুঝলে মটরদা খুব ভাল।

মটর বলল, ভাল মানুষেরা বেঁচে থাকবে কেন ?

—আরে না না, লোকটা আলুর দম খেতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর জল ঢেলে দিলাম মুখে। আমি বিশু আগুন জ্বেলে শরীর গরম করলাম, লোকটা বেঁচে গেল।

—বেঁচে গিয়ে কি ভাল হল !

—লোকটা জান একটা বই লিখছে।

—বই! বইয়ের কথায় মটর কেমন সামান্য লোকটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করল।

—কি বই ?

—সে তো জানি না শুধু লিখে যাচ্ছে জানি। তুমি তো পদ্য লেখ। দেখা করবে লোকটার সঙ্গে। লোকটা ভাল মানুষের খোঁজে আছে।

—লেখক মানুষটা কোথায় থাকে ?

—ওর থাকার ঠিক নেই। এখন নদীর পাড়ে আছে। কাল হয়ত বেলডাঙ্গায় চলে যাবে। এক মুখ দাড়ি। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে লেখে। কাল জেলখানার পাঁচিলে লিখেছে, মানুষ মরে যায়। মানুষ তেলে ভেজাল দেয়। আবার লিখেছে উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়। আচ্ছা মটরদা উদাসীন মাঠটা কোথায় ?

—হবে কোথাও। আমি ঠিক জানি না।

—আমি, বিশু, সূর্য, গোপাল ওর কাছে খুব ভাল মানুষ। বলতে ভুলে গেছিলাম, তুমিও আছ।

মটর দেখল বেলা হয়ে যাচ্ছে। মাঠা বিক্রি করতে বের হয়ে পড়েছে বনমালী গয়লা। ও এখন পাড়ায় পাড়ায় মাঠা বিক্রি করবে। সে বলল, যাইরে। দেরি হলে বুড়ি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

মটরদা চলে যেতেই পূর্ণিমা হাঁক পাড়ল, ও মেয়ে সাত সকালে গেলি কোথা !

আজ পূর্ণিমার ঘরে উৎসবের মত। এত সুন্দর বাজার হাট কতদিন হয়নি। রিনতির বাড়তি ঝোলঝাল দিয়ে আজ সে আহার করবে।

উদাসবাবুকে পূর্ণিমা এক কাপ চাও করে দিল। উদাসবাবু খুব ভারিক্কি চালে বলল, আরে না না, এখন চা খাওয়ার সময় নয়। কত ভাবনা। তবু যেন খেতে হয় বলে খাওয়া। এছাড়া শরীর বলে কথা। শরীর রক্ষার্থে চা খাওয়া এমন এক মুখভঙ্গী করে চা খাচ্ছে উদাসবাবু। আর তেমনি পা নাচাতে নাচাতে বলল, বুঝলে পূর্ণিমা, খদ্দের ধরাই হচ্ছে আসল কাজ। তেজী খদ্দের বুঝলে না। এখনই দু'জন শাশালো খদ্দের আমার হাতে আছে। তারপর সতর্ক গলায় বলল, হৃদয় ঘোষালকে চেন ?

—ঘোষালবাবু ?

—আরে হ্যাঁ, ঐ ঘোষালবাবুর এবারে মন্ত্রী হবার কথা। তা জান !

—কি করে জানব বাবু ?

—আমার সতীর্থ ছিল। বুদ্ধিমান মানুষ। বুঝলে না, আমার মতো শুধু শিক্ষা নিয়ে পড়ে থাকেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরই বলল, ওহে উদাস কি করা যায় বলত ! মাষ্টারি করে তো শালা পেট ভরছে না। এখন স্বাধীন দেশে কিছু একটা করতে হয়।

—কি করল।

—আর কি করবে। রাজনীতি করল।

—তারপর ?

—তারপর নেতা হয়ে গেল।

—তারপর !

—তারপর শুনছি মন্ত্রী হবে।

—খুব ভাল কথা। দেখা করেছ ?

—দেখা করা কি। কলকাতায় চলে যায় হুট হুট। গাড়ি আছে ওর তিনটে। নিজের, বৌ-এর, ছেলের। একটা গাড়ী আছে ফুর্তির জন্য। একটা গাড়িতে সে বক্তৃতা করে বেড়ায়। রোড লাইসেন্স, ভূসিমালের কমিটি কোথায় নেই। শুনেছি ওর মেয়েছেলের বাই আছে। দোষের মধ্যে ঐ একটা দোষ। খদ্দের কেমন মনে হচ্ছে !

—আমার পোড়াকপালে থাকলে হয়।

—থাকবে নাতো যাবেটা কোথায় ?

—কোথায় যে কে যায়।

—সে যাই হোক তুমি ভাববে না। আমি ধরে বেঁধে রাখব। নতুন জিনিস। পবিত্র। কালীঘাটে যাওয়া দরকার। একটা বছর লাগবে—এই যা সমেস্যা।

উদাসবাবুর চোখ মুখ কেমন বীভৎস দেখাচ্ছিল। বোঝাই যায় ওর কান গরম হয়ে গেলে এমন হয়। পূর্ণিমা বলল, আর একজন ?

—তাকে তুমি চিনবে না। আমাদের হেড-সারের বন্ধুলোক। প্রায়ই গর্ব করে বলে সত্য সিংহ। সিংহই বটে। বাপের পয়সায় পেচ্ছাব করে দিয়েছে। চোরাচালান আরও বড় বাপ। বড় বাপের আওতায় আছে নাকি লোকটা। বাংলাদেশ থেকে কি সব আসে, এখান থেকে কি সব যায়। কলকাতায় চাঁদনি চকে থাকে। হোলসেল ডিলারশিপ আছে। ভাল মেয়েছেলে পেলে লাখ টাকা খরচ করতে রাজি।

—খুবই বড় মানুষ। বলে পূর্ণিমা অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে তিনবার মাথা ঠেকাল। থাকলে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, কিছুই পড়ে থাকছে না। আমার কপালে কি যে আছে বলেই দেখল, রিনতি ঘরে ঢুকছে। রিনতির দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল পূর্ণিমা। উদাসবাবুও তাকিয়ে আছে অপলক। রোদ ওঠায় রিনতির সব শরীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি একেবারে আর খুকী নেই। গেছো মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। ভেতরে ভেতরে ডাঁসা হয়ে উঠছে বোধহয়। এদিকে আয় রিনতি।

—গোঁফের পাকা চুল ?

—আরে না বোকা। আয় না।

রিনতি কাছে যেতে চাইছে না। লোকটার গায়ে আরশোলার গন্ধ। এবং মুখ কেমন শুকনো সব্জির মতো। আর কাছে গেলেই

হাত চেপে ধরে, কাছে টেনে গন্ধ শোঁকে। গোঁফের পাকা চুল তুলে ফেলার সময়, এটা সে দেখেছে।

তখন পূর্ণিমা বলল, গুরুজনের কথা শুনতে হয় রিনতি।

ভুলেই গেছিল রিনতি উদাসবাবু তার গুরুজন। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। এবং এ সময়েই মনে হয় রিনতি সত্যি পৃথিবীর অনেক কিছু ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে রিনতি সত্যি আর বালিকা নেই।

পূর্ণিমা বলল, যা না ডাকছে।

রিনতি বলল, গন্ধ।

পূর্ণিমা বলল, গন্ধ!

উদাসবাবু হা হা করে হেসে দিল। বলল, পূর্ণিমা মেয়ে তোমার এখনই গন্ধ পাচ্ছে। ঢাক বাজাও, বাদ্যি বাজাও। খুবই সুলক্ষণ এগুলো।

পূর্ণিমা হাঁ হয়ে গেল। উদাসবাবু মুখ ব্যাজার করে আছে। যেন এই ত্রিভুবনে তার অভীষ্ট লাভে আর দেরী নেই। পূর্ণিমা অবশ্য বসে থাকতে পারল না। সদরে লোক এসে হাজির, পূর্ণিমা আছ?

পূর্ণিমা বুঝতে পারল দেরি দেখে বাবুর বাড়ির লোক হাজির। সে রিনতিকে বলল, বলে দে, মার শরীর ভাল না। জ্বর হয়েছে।

রিনতি সদরে এসে বলল, মার শরীর ভাল না জ্বর হয়েছে।

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি তক্তপোষে উঠে একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাবুর বাড়ির লোকটা ভেতরে ঢুকলে কেলেঙ্কারী। একদিন না গেলে বাবুর বৌ-র মুখ গোমড়া হয়ে যায়। পূর্ণিমা গোমড়া মুখ একদম সহ্য করতে পারে না। তারপর কাঁথার ভেতর মুখ লুকিয়ে ফিক করে হেসে দিল। সুখ, বড়ই সুখ সামনে। লাখ টাকার সুখ।

॥ ৯ ॥

লোকটা তখন বাস-স্ট্যাণ্ডে হাজির। চারপাশে ঝুপড়ি ঘর। রিক্সায় প্যাঁক প্যাঁক শব্দ। সোয়ারিদের ভিড়। বাক্স-পেটরা ডাঁই মারা। হাতে ব্যাগ বাবুরা। বিবিদের বগলে প্লাস্টিকের ভ্যানিটি ঝুলছে। সে বলল, ও ড্রাইভার সাব আমাকে নেবে। তোমার সঙ্গে যাব।

মুখ চোখ দেখে পাগলই ভাববে। মাঝে মাঝে সে সেটা বোঝে। এবং পাগলের অনেক সুবিধা। সে তখন ভাবল একটু বেশি পাগলামি করবে। পাগলদের লোকলজ্জা থাকতে নেই। সে বাসের গায়ে একটা চকখড়ি দিয়ে লিখে ফেলল, উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়। কনডাকটার তেড়ে এল মারতে—এই এটা কি তোমার বাপের বাস। এবং লোকটা তখন রাগ করে না। হেসে বলল, আমার বাবার বাস। তুমি কেহে!

—আবার লিখে দেখ না, বাবার বাস বের করে দিচ্ছি। বলেই কনডাকটার হাত দিয়ে উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায় মুছে ফেলল। লোকটা বেগতিক দেখে কনডাকটারের হাতে এক কামড়। আর তখন হৈ-চৈ। মার মার। ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে এল। এবং নেমেই ঘুসি চালাল মুখে। রক্তপাত হচ্ছে। নাক দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছিল। এতক্ষণ ভিড়টা ছিল লোকটার বিরুদ্ধে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তেই ভিড়টা তেরিয়া হয়ে উঠল এবং কষ্টটা বোধ হয় সংক্রামক ব্যাধি। লোকটার জন্য সবার করুণা জেগে উঠল। ড্রাইভারও বুঝল বেগতিক। কামড়ে রক্তপাত হয়নি। শুধু দাগ বসে গেছিল কনডাকটারের হাতে। সে চিৎকার করে উঠেছিল, আমার হাত গেল। মেরে ফেলল। কিন্তু লোকটা কোনই চিৎকার করল না। এমন কি যে রক্তপাত হচ্ছে তাও সে বুঝছে না। সে হা হা করে হাসছে আর বাসের দেয়ালে লিখে যাচ্ছে…মানুষের ধর্ম।

তারপর মানুষের কথা অমৃত সমান। এখন কেউ তেড়ে আসছে না। বরং একজন দোকানী এগিয়ে এল এক মগ জল নিয়ে। বলল, মুখটা ধুয়ে ফেল পাগলা। সে এবারেও হাসল। এতই আহাম্মক ভেবেছে। এই রক্তটা নিয়ে সে ঘুরে বেড়াবে। এবং নাকে রক্ত থাকলে কত যে তার উপকার—সবাই হাঁ করে দেখবে তাকে। কেউ দুটো খেতেও দিতে পারে। এবং সে এজন্য দোকানীর কথা বাসে লিখে ফেলল, মগে এখনও জল আসে। সময় মতো মুখ ধুয়ে নাও।

ড্রাইভার বাস ছাড়তে পারছে না। এক দঙ্গল মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কৈফিয়ত চাইছে, কেন শালা তুমি মারলে। কেন! ওর কেউ নেই বলে! শালা তোমার বাস চালানো বের করে দিচ্ছি দাঁড়াও। হাত গুটিয়ে একটা লোক বলল তখন, পয়সা ছাড়।

—পয়সা।

—হ্যাঁ বাপ পয়সা বোঝ না। পয়সা।

—ছাড় বলছি।

তখন বাসের মালিক পক্ষের লোকদের আর একটা ভিড় দল বেঁধে এল—কি হচ্ছে, রোয়াবি, রোয়াবি দেখাবার জায়গা পাও না।

বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল! মজা, কতরকমের মজা পৃথিবীতে আছে। সে এই ফুরসতে আরও সব কথা লিখল···মানুষ চোট্টা, মানুষ ফেরেব্বাজ। মানুষ ধার্মিক, মানুষ মহান। মানুষের ইতিহাস বদলাবেই।

তখন খণ্ডযুদ্ধ বেশ সপ্তমে। দুটো লোক ধরাশায়ী—সে বুঝল, আর থাকা নিরাপদ নয়—হেঁটেই রওনা হতে হবে। খণ্ডযুদ্ধ লাগিয়ে সরে পড়া দরকার। কোত্থেকে কি হবে কেউ বলতে পারে না। এবং পছন্দ মত মানুষ তার সঠিক জায়গা ঠিক করে নেবে। এবং যখন পুলিশের গাড়ি হাজির, তখন লোকটা অনেক দূরে একটা প্রাচীন কবরখানার নিচে ঝাউ-এর ছায়ায় শুয়ে আছে। কীটপতঙ্গ পৃথিবীতে বাড়ছে। কীটপতঙ্গ এবং জীবজন্তু—এই দুই সম্প্রদায়ের হাত থেকে

মানুষের রক্ষা চাই—আজ হোক কাল হোক যে যার সঠিক জায়গায় হাজির হবেই। এই বলে সে একটা ফড়িং-এর লেজে ছোট্ট খোঁচা মেরে দেখল পতঙ্গ জীবিত না মৃত।

পতঙ্গরা উড়ে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মওকা পেলে মানুষকে কামড়ায়। পোকা মাকড়দের কাজই অদ্ভুত। পৃথিবীটাকে পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় এই খণ্ডযুদ্ধ। এখানে সেখানে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া শুধু। এবং সে শুয়ে শুয়ে। নাকের রক্তটা শুকিয়ে গোঁফের লোমে আঠা ধরে গেছে। সে মোচে তা দিল। গোঁফের মতো লোম শক্ত হয়ে গেছে। পাকিয়ে পাকিয়ে গোঁফের দফা রফা করে সে যখন উঠে বসল তখন বেলা গেছে। এবং বিকেলেই দেখল রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। একটা বাস নেই ট্রাম নেই গাড়ি নেই। মালিকপক্ষের ডাকে সব গাড়ি বন্ধ। ধর্মঘট পালিত হচ্ছে শহরে—কি মজা!

লোকটা তারপর ভাবল, অনেক কাজ হাতের কাছে পড়ে আছে। এখনও তার বই লেখা শেষ হল না। আর তা ছাড়া এ-শহরে থাকা খুব একটা নিরাপদও নয়। এখন হেঁটে হেঁটে যত দূর যাওয়া যায়। কিছুটা হেঁটেই একটা রেল-লাইন পেয়ে গেল। সিগনাল না পেয়ে গুমটির কাছে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সে ট্রেনে উঠে বসল। ট্রেন হুইসিল বাজাল, মুখে সেও হুইসিল বাজাল। যাত্রী বোঝাই ট্রেনে গাদা মারা চালের পুঁটলি। মানুষজন যে যার মতো বিড়ি খাচ্ছে, গল্প করছে—একটা মুরগি ডেকে উঠল কোথাও। মুরগির মাংস খেতে বড়ই সুস্বাদু। ওর জিভে জল এসে গেল। জিভে এমন জল আসছে যে মুখ ভরে গেছে। শালা শরীরের রক্ত জল হয়ে যায় ভেবে সে একটা পোড়া বিড়ি তুলে হুস্ হুস্ করে টানতে থাকল। এবং এতে কিঞ্চিত রক্ষা শরীরের। জিভে জল ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। দুটো বুড়ো দুটো বুড়ি একটা মেয়েমানুষ দু'জন জোয়ান মরদ গঙ্গাসাগরে যাচ্ছে—তারপর মনে হল, যাত্রীরা সবাই গঙ্গাসাগরে যাচ্ছে—পাপ আর ধরে না, গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসবে পাপ।

গাড়িটাতে করে এই ধর্মের নামে ষাঁড় বলির কুরুক্ষেত্রটা তারও দেখে আসা দরকার। কীট পতঙ্গরা সব মঠ মন্দির বানিয়ে জুজুর ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কাগজওয়ালারা তীর্থের মাহাত্ম্য প্রচারে কৃপণ নয়। সে একবার একটা কাগজে কুম্ভমেলার ছবি দেখেছিল—যা শালারা তোরা ঘোলা জলে ডুবে মর—আমরা পাটিসাপটা খাই। পাটিসাপটা কথাটাও অনেকদিন পর—ঠিক অনেক দিন বললে ভুল হবে যেন হাজার বছর পর সে মনে করতে পেরেছে কথাটা। ভারি নতুন কথা। এখন হাতে একটা চক-খড়ি কিংবা ইঁটের টুকরো, কিছুই নেই। সে পকেট হাতড়াল। পকেট তার ইঁটের টুকরোতে বোঝাই থাকে। অথবা একটা ছুটো চক খড়ি প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো পথে ঘাটে এইসব খুঁজে বেড়ায়। বিদ্যালয়ের সামনে, অথবা বিদ্যালয়ের মাঠে মাঝে মাঝে হাজার বছর আগের একটা চক-খড়ি অবিষ্কার করে ফেললে সে লাফিয়ে ওঠে—ভারি মজা জীবনে, সংগ্রহের নেশায় সে একবার একটা বিদ্যালয়ের মাঠে ঠায় আটদিন অবস্থান ধর্মঘট করেছিল। বিদ্যালয়ের মহোদয়ারা পুলিশের সাহায্য না নিলে—সে হয়ত সেখান থেকে উঠতই না।

পুলিশ তাকে ধরে বেঁধে যখন নিয়ে যায়, তখন বলেছিল, এই শুয়োরের বাচ্চা তোর কচি খাবার লোভ কেন রে এত!

কচি কথাটা মাথায় ঢোকেনি প্রথম।

পুলিশ বলেছিল, থাবড়া মেরে মুখ ভেঙে দেব। পাগলামির আর জায়গা পেলে না।

সে বলেছিল, আমি পাগল, না তোমরা পাগল।

—খুব সেয়ানা।

সে বলেছিল, রতনে রতন চেনে।

—মার মার। ওর মুখ থাবড়া মেরে ছুটো দাঁত তুলে দিয়েছিল। সেই থেকে সামনের ছুটো দাঁত নেই। ঝড়ো হাওয়ায় বাতাস পেটে আপনি ঢুকে যায় ফাঁক দিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে হয় না।

এবং পুলিশটাকে সে দাঁত উড়ে গেলে বলেছিল, চক-খড়ির জন্য দুটো দাঁত। তারপর কথাটা সে গোপনে পুলিশের গাড়িতে লিখেও রেখেছিল। ওর সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে ওদের একজনের কৃপা হয়েছিল। বলেছিল বেশ ভাল ভাষায়—সুন্দর মোলায়েম করে বলেছিল, ওখানে তুমি আটদিন ধরে বসেছিলে কেন?

সে বলেছিল, চক-খড়ি।

—চক-খড়ি মানে?

—চক-খড়ি পকেট ভর্তি ছিল। মহোদয়ারা আবিষ্কার করে দেখলেন, পকেট ভর্তি চক-খড়ি। দারোয়ান জোরজার করে নিয়ে নিল। সব লুট করে নিলেন মহোদয়ারা। কাজেই স্যার সত্যাগ্রহ করেছিলাম। পুরো আটদিন লাগাতার সত্যাগ্রহ।

একটা ঢোসকা মতো পুলিশ ব্যাটনের গুঁতো মেরে বলেছিল, ঢোক আগে ফাটকে, ঢোক তারপরই খিস্তি। লবজটা লেগে থাকে —আগে পরে একটা খিস্তি না জুড়লে মান সম্মান থাকে না পুলিশের —রাজ্যে রাজ্যে বৃটিশ আমল থেকেই পুলিশের এটি শিক্ষার বিষয় ছিল, এখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। আর সে তো একটা প্রত্নতাত্ত্বিক মানুষ, প্রাচীন বিষয় নিয়ে তার কারবার—সে তখন পুলিশের একটা গালিগালাজের শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভাবছিল। তখনই ফাটকে ঠেলে ঢুকিয়ে রোগা-ঢ্যাংগা পুলিশটা বলেছিল, মহোদয় এবার আপনার কারাবাস। সে বলেছিল, কারাবাস বলবেন না, বলুন স্বর্গবাস। সে ফাটকে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে বলেছিল, একটা বিড়ি। আর কিচ্ছু না, মান না, যশ না, বাড়ি না, গাড়ি না, একটা বিড়ি।

সে পোড়া বিড়িটা টানতে টানতে ছাই সহ সবটাই খেয়ে ফেলেছিল। সে আজকাল দেখেছে, পেটে যাই যায় প্রোটিন হয়ে যায়। গাছ পাতা পোকা মাকড় এবং সে একবার দু দিন গঙ্গামাটি চিবিয়ে পেটে প্রোটিন তৈরি করেছিল। সুতরাং তার এখন খাদ্যের অভাব বলতে কিছু নেই। নিরম্বু উপবাস বলেও সে কিছু জানে না।

এই মাটি বড়ই সুফলা। যা দেয় সবই মানুষের জন্য। মাটিই যখন জীবন-ধারণের সব দেয়, তখন শুধু মাটি সেবন করলে দোষ কি। কোন ঝামেলা নেই। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে হয় না। কেবল মাটি ভক্ষণ করো। এতে সে দেখেছে দাঁত বেশ পরিষ্কার থাকে। পেট পরিষ্কার থাকে। অবশ্য এই কৌশলের কথা খুব কম লোকেরই জানা আছে—বিজ্ঞানী মানুষ যে, সেই জানে সব। মানুষেরা তারপর শুধু মাটি খেতে থাকবে। খাবলা খাবলা মাটি, খাবে মাটি, হাগবে মাটি, কোন ক্ষয় পূরণের বালাই নেই। সুফলা সারের দরকার নেই—অথচ মানুষ বেঁচে থাকবে। সুতরাং বিশ দিন পর লিখল, মাটি সবচেয়ে সুলভ বস্তু। আহার করো। এক বছর ধরে সে এই জিনিসটাই লিখল—জীবনে যদি খাদ্য চিন্তা না থাকে, তবে মানুষ আরও অনেক কিছু ভাবতে পারবে। এত সহজ বিদ্যেটা মানুষের জানা নেই—এবং সে একটা কলাগাছের পাতা ছিঁড়ে তার ওপরে লিখল, প্রিয় দেশবাসী আমি একটা কথা সার ভাবিয়াছি, আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন, কারণ দেশে এখন খাদ্যাভাব নেই বলিতেছেন, দু কোটি টন খাদ্যশস্য মজুদ—আমি কিন্তু নিত্য মাটি সেবন করিয়া চলিয়াছি। ইহাতে ক্ষয় নাই। ইহাতে খাদ্য মজুতেও সাহায্য করে। আমার মতো মানুষ ক্রমেই মাটির প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করিতেছে। শয়নে মাটি, স্বপনে মাটি, স্বদেশ মাটি, শ্মশানে মাটি। মরে গেলেও মাটি। মাটিই সারবস্তু। তাকে অবহেলা করিবেন না। চিঠিটি এখানে শেষ হল। তারপর লিখল, পুনঃ—মাটি মানুষকে দীর্ঘজীবী করে।

আর বছর দুই পর উদাসবাবু খবর নিয়ে এল, এবারে বুঝলে পূর্ণিমা আমরা কলকাতায়। সে হাতে একটা লিস্ট নিয়ে এসেছে। তাতে দশজন মহান ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের একজন মহান চোরাকারবার। একজন মহান নেতা। দয়ালু পুঁজিপতি একজন বিনয়ী বদমাস, একজন মহান উকিল, একজন মহান ডাক্তার, এ ছাড়া মহান

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবই আছে। এই দশ জনের বয়স সবারই পঞ্চাশের ওপর। সবারই একটা দুটো তিনটে পর্যন্ত লিখিত অলিখিত বৌ আছে। এরা সবাই যেকোন সময় হাজার পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসে অলিখিতভাবে খরচ করতে পারে। এরা প্রত্যেকেই সমাজের বরণীয় ব্যক্তি। সমাজপতি এঁরা। এঁদের এখন দরকার ডাঁসা কুমারী মেয়ে। দেখতে চায়। চিবিয়ে খাবার আগে টিপে টুপে দেখবে—তার জন্যই এরা প্রথমে একটি ফ্লাট দিতে রাজি। তুমি সেখানে থাকবে। আমি থাকব। গোবিন্দকে নিয়ে যাব—পাহারা দিতে হবে। উপঢৌকন আসবে কত—সবই তো একভাবে আসবে না—কত রকমের মহিমা দেখবে। যেন আত্মীয় সবাই তোমার। মেয়ে তোমার একটা—অথচ কত অসংখ্য জামাই। জামাইরা বুঝতেই পারছ মহান ধড়িবাজ—তাদের সামলাবার জন্যই আমার যতটুকু দরকার। টাকা পয়সার লেনদেন হবে—তবে আমার ২৫ শতাংশ—এটা আগেই বলে রাখছি। সাদা-সিধে মানুষ—সাদাসিধে হিসেব—পরে গণ্ডগোল বাঁধালে ধামা উল্টে দেব বলে দিলাম।

পূর্ণিমা আনন্দে কেঁদে ফেলল, তারপর অভিযোগ—এতদিনে এই বুঝলে। তোমার জন্য সব ছাড়লাম—উল্টা বুঝলি রাম! আবার সামান্য বিলাপ। উদাসবাবু কাতরগলায় বলল, আহা বিলাপ কর কেন! আমি তো এসে গেছি। এখন গোছগাছ করার পালা।

উদাসবাবু বলল, তোমার আংটি গেল কৈ ?

পূর্ণিমা বলল, আলোর সঙ্গে বাইস্কোব দেখতে গেছে।

—বাজে মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে দাও কেন ?

—বলল, নিয়ে যাচ্ছি দিদি, কি বলব !

—ফেরত দেবে তো !

রিনতির কত দাম এখন উদাসবাবুর কথায় পূর্ণিমা টের পেল। ভয় ধরে গেল ভিতরে। যদি কিছু হয়, যদি সত্যি হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাবার ভয়ে দুটো বছর সে দরজায় তালা দিয়ে রিনতিকে

আটকে রেখেছে। এবং ঘরে থেকে থেকে রিনতির রঙ গেছে খুলে-উদাসবাবু তার শেষ কানাকড়ি রিনতির শরীর পুষ্ট হবার জন্য খরচ করেছে—সেই পোষা পাখি পালালে—আলো বিনিরা এখন হিংসায় মরছে, কে কি ভাবে শত্রুতা করবে কে জানে! ছেড়ে দিয়ে ভাল করেনি। কিন্তু মা বলে কথা—রিনতির চোখ মুখ কিছুদিন থেকেই কেমন উদাসীন। ফাঁসীর আসামীর মতো মাঝে মাঝে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন পূর্ণিমা একটা ফাঁসীকাঠ—একবার তো দৌড়ে পালাতে চেয়েছিল, সে আর উদাসবাবু মিলে ধরে এনেছে। বরং এইসব মনে হতেই পূর্ণিমা বলল, একটু এগিয়ে দেখবে নাকি!

উদাসবাবু বলল, আরে ভয় কিসের! যাবেটা কোথায়। পুলিশের বড়বাবু আমার হাতের লোক।

পূর্ণিমার মনে হল সত্যি লোকটা কৃতী। চারপাশে তার রক্ষাকারীরা আছে—ভয় পায় না। তার মতো কথায় কথায় চোখে জল আসে না। এমন শক্ত মানুষই সে জীবনে চেয়েছিল—ভাগ্যিস এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছিল লোকটার সঙ্গে—তা না হলে সারা জীবন দাসীবাঁদি থাকা ছাড়া উপায় ছিল না তার। পূর্ণিমা বলল, তুমি এখানেই দুটো খেয়ে যেও।

উদাসবাবু ধুতির কোঁচা তুলে মুখটা ভাল করে মুছে নিল। খাটাখাটানিতে সামান্য রোগা হয়ে গেছে। কত ভাবে যে কত কিছু করছে। বড়ই কাজের লোক। এখন দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে রওনা হতে পারলে হয়। রিনতির সুখের জন্যই করছে। সে আর কতদিন। তারপরই হুঁস হল, যাবে যে শাড়ি সায়া ব্লাউজ কোথায়। রিনতিকে শাড়ি সায়া ব্লাউজ পরে কেমন দেখায় সেটাও তো দেখা হল না।

সমস্যার কথা তুললে উদাসবাবু বলল, তুমি বড়ই সেকেলে। কাল দর্জি আসবে। সব কিছুর মাপ নেবে। কোনটা কত ইঞ্চি দেখতে হবে। তারপর বলল ফিস ফিস করে, একটা ফিতে কিনে আনব। যা যা লিখে রাখব, তার মাপ লিখে রাখবে—তারপরই মনে

হল পূর্ণিমার অক্ষর জ্ঞান নেই। কি করা যায় ভেবে যখন কূল পাচ্ছিল না, তখন পূর্ণিমা বলল, দর্জি এসে কি করবে?

—লম্বা ম্যাকসি গড়াব রিনতির জন্য। সব সিল্কের। এখন সায়া শাড়ি সেসব বাবুদের পছন্দ নয়। আগে দেখনি। পয়সা তো এমনিতে দেবে না—মাথা ঘুরে না গেলে কেউ পয়সা দেয় না। কিন্তু বড়ই সমেস্যা।

—আবার সমেস্যা।

—সবাই কোমরের মাপ চায়।

—মাপ চায় কেন?

—ওটাতেই জিনিসের দাম বাড়ে।

—আজকাল এত সব দেখা হয়।

—কত কিছু যে হয় পূর্ণিমা, সেটা যদি বুঝতে তবে তোমার কবেই সগ্‌গে বাস হত। যাকগে পরে দেখা যাবে—ভাল পোষাক, ভাল বাড়ি, ভাল মানুষ এখনও সংসারে আছে—তা না হলে আমার সাধ্য কি এত করি তোমার জন্য। আমাদের হেড স্যারের বন্ধু বিশ্বাম্ভরবাবু কলকাতায় থাকে। কলকাতার কড়া পাকের সন্দেশ খায়। সব শুনে সে-ই প্রথম অফার দিল। চোরাকারবার করে মানুষ আর কত বড়লোক কবে হয়েছে—তার কাছেই জানতে পারলাম, কলকাতার আর সেদিন নেই—সব পাল্টে যাচ্ছে। কত কিছু কলকাতায় হয়—কি দুঃখে শালা যে এত দিন একটা লজঝরে শহরে জীবনপাত করেছিলাম।

—তোমার হেড-স্যারের কত বন্ধুবান্ধব।

—নেতা হলেই এসব হয়। তার দয়ার সত্যি অন্ত নেই।

—সত্যি অন্ত নেই। তারপর পূর্ণিমা ফস করে বলে ফেলল, এত জেনে গাঁয়ে পড়ে আছ!

—আরে মানুষ কখনও এক রকমের হয়। কেউ সাধু থাকতে চায়, কেউ লম্পট, কেউ ধনী, কেউ নেতা হতে চায়, মান যশ যে যেরকম ভালবাসে।

—তোমার হেড-স্যারের স্বপ্ন কিগো!

—প্রথমে নেতা, পরে মন্ত্রী।

—আর কিছু না।

—একটা মানুষের আর কত লাগে।

তখনই হুড়মুড় করে আলো বিনিরা সদরে ঢুকে গেল। রিনতি লম্বা ফ্রক গায়ে দিয়ে বাইস্কোপ দেখে এসেছে। রিনতির দিকে তাকিয়ে উদাসবাবুর জিভে জল এসে গেল। এখনও কত কাজ বাকি। এ-সব লাইনে নিয়ে যাবার আগে বাঁধাধরা কিছু নিয়ম থাকে। বিশ্বাম্ভরবাবুই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সেখানে বিবাহ বলে একটি কথা থাকে। কুমারী মেয়ের সর্বনাশ আইনে লেখা নেই। সধবা মেয়ের সর্বনাশ যখন একজন করেই ফেলেছে, তখন আর সবাই করলেও দোষের থাকে না। সুতরাং সে-কাজের ভারও নিয়েছে বিশ্বাম্ভরবাবু—তার একজন দালালের সঙ্গে রিনতির প্রথম বিবাহ এবং রাত্রিবাস। রাত্রিবাসে আপত্তি থাকলে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর রিনতি শ্রীমতি রিনতি হয়ে গেলে ডংকা বাজিয়ে পয়সা উপায় করবে।

পূর্ণিমা বলল, এখনও কত কিছু বাকি।

উদাসবাবু বলল, শুভ কাজ সারতে সময় লাগে পূর্ণিমা।

তারপরই হুঁস হল, দরজার পাশে রিনতি দাঁড়িয়ে আছে। মায়াবী মুখটা টল টল করছে। চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল ভেসে উঠছে। সে সবই টের পেয়ে গেছে—বিশু সূর্য গোপাল আজকাল আর আসে না। পূর্ণিমা বলে দিয়েছে—মেয়ে আমার বড় হয়েছে, ফের এলে থানায় খবর দেব। ওরা পূর্ণিমা না থাকলে জানালায় দাঁড়িয়ে রিনতির সঙ্গে কথা বলত। ওরা আমের দিনে আম, আখের দিনে আখ দিয়ে যেত। থানা পুলিশের ভয়ে সেই যে চলে গেল আর আসে না। একবার রিনতির মনে হল, বাইরের পৃথিবীতে বের হয়ে সে ডাকে সূর্য বিশু গোপাল তোরা আমাকে নিয়ে যা। যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব। আমার প্রাণদণ্ড হয়েছে। মা, উদাসবাবু,

বিশ্বাম্ভরবাবুরা সমাজ সংসার সমাজপতি। তাদের হাতে আমার প্রাণদণ্ড। তোরা আমাকে বাঁচা।

তখন সেই পাগল হেঁটে যাচ্ছে আর হাঁকছে, উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়!

॥ দুই ॥

শেষবেলায় এমন শুনে উদাসবাবু হাঁ। পূর্ণিমা বলে কি! শুভক্ষণ ঠিক। কবে কখন কোনদিকে যাত্রা নাস্তি সেও পাঁজি দেখে ঠিক করা হয়েছে, শেষবেলায় এ যে কি দুর্মতি হল পূর্ণিমার, সে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তার কেমন মাথা গোলমাল করছে। সে কোনরকমে বলল, মুখ দেখাব কি করে! ছি ছি পূর্ণিমা তোমার নষ্টামীর শেষ নেই। ওরা কত বড় মানুষ তুমি জান না পূর্ণিমা। বলেই উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, শেষে পস্তাবে। অ-জায়গায় কু-জায়গায় পড়ে মেয়েটা তোমার নষ্ট হবে—আমার কি! ফের হাই তুলল। যেন চলে যাবে এখুনি, তারপর হাই তুলে যেন চলে যাবে এখুনি,—এই দুইয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে—কারণ তার তো পূর্ণিমার মতো মাথা গরম করলে চলবে না। কাল পর্যন্ত সব ঠিক। কাল কেন, রাত দশটা পর্যন্ত সেতো রিনতির সালোয়ার কামিজ থেকে আরম্ভ করে স্নো-পাউডার, আয়না, তোয়ালে এবং আর কি দরকার, যাবে এতদূর, পূর্ণিমাও যাবে। এক-সঙ্গে যেতে হলে টিকিট কাটা দরকার, উদাসবাবু তাও কেটে রেখেছে। দুপুর একটার ট্রেনে রওনা দেওয়া, তার আগে সকালটায় খবর নিতে এসেছিল, সব ঠিকঠাক আছে কি না, পূর্ণিমার মেয়ে নাতো একখানা পিলে চমকানো কন্যা। যে কোন সময় হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তারপরই মনে হল, আসলে ছেনালের অছিলার অভাব হয় না! কেউ আরও বড় দাও বাগিয়ে বসে নেইত! যখন যাবেই তখন

আর যতটা খিচে নেওয়া যায়। এখনই উদাসবাবু মাথায় রক্ত তুলে দিয়ে প্রায় ষাঁড়ের মতো গুঁতো মারতে গেছিল আর কি, তখনই ভেতরের উদাস বলে উঠে, আরে কর কি কর কি! মাথা ঠাণ্ডা করে কু-দিকটা বল। মাথা ঠাণ্ডা করে বস। সবটা শোন। সাপের মতো মগজের মধ্যে পিছলে যাও। সুতরাং উদাসবাবু ফের তক্তপোষে বসে বলল, রিণ্টিরে দেখছি না।

—বাইরে গেছে।

—তা বাইরে যাক। ছেলেমানুষ বাইরে যেতে চাইবেই।

পূর্ণিমা জানলায় দাঁড়িয়েছিল। উদাসবাবু পূর্ণিমার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কি হল! লাখ টাকার স্বপ্ন পূর্ণিমার উবে গেল! না বিশ্বাস করতে পারছে না। ধানদাবাজ ফের ভাবতে শুরু করেছে।

উকিল বল, ডাক্তার বল, শিক্ষাবিদ ধানদাবাজ বল হবে। যা দিন কাল, সাহিত্যিক সাংবাদিক কে ধানদাবাজ নয়। কেবল উদাস একা কেন! ধানদাবাজ না হলে সুখী গৃহকোণে বাজে গ্রামাফোন হবে কি করে! এমনিতেই হয় না। এই যে বড় বড় দরদী মানুষের কথা শোন, তোমার আমার জন্য ঘুম নেই তাদের চোখে সেও এক ধানদা। সবাই কোথাও যেতে চায়, মোক্ষ টাকা পয়সা সুখ, খ্যাতি এ-সবই এখনকার কালে মোক্ষ। তুমি আমি সব টের পাই —কিন্তু নড়তে চড়তে কষ্ট। তোমাকে একটু নড়েচড়ে বসতে বলছি। অবশ্য এত সব কথার এখন মানে হয় না। বলেও লাভ নেই। সে এতবার বলেছে যে পূর্ণিমার শুনে শুনে কান পচে গেছে। আপাতত তক্তপোষে জম্পেস করে বসা যাক। হৃদয় বস্তুটি বড়ই গোলমেলে। হৃদয়ে টান ধরেছে। এই টান বস্তুটিকে খসাতে হবে। সে জমপেশ করে বসল। তারপর ছেঁড়া পকেট থেকে বিড়ি বার করল, হাতের তালুতে ঠুকে বলল, ঠিক আছে, দেশলাইটা দাও। যা ভাল বুঝবে করবে। হেনস্থা কপালে লেখা, কে খণ্ডাবে বল।

পূর্ণিমা এবারে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, সেলাই টেলাই নেই।

—আছে আছে ভ্যাখ। তুমি অযথা রাগ করলে যাই কোথা। আমার আর আছেটা কে!

পূর্ণিমার এ-সব কথায় গোল বেঁধে যায়। উদাসবাবুর সত্যি কেউ নেই কথাটা মনের মধ্যে ডিগবাজি মারতে থাকে। উদাসবাবু খ্যাতিমান লোক, পার্টিবাজী করে, পেরাইমারী স্কুলে পড়ায়। বিয়ে থা করেনি, মাগ নেই। সংসারে টান কম। সে একবার একটা সভায় জনগণের হয়ে বক্তিমা করতেও দেখেছিল। আর এই মানুষ না থাকলে সে একা এটাও বোঝে। বাবুদের বাড়ি কাজটাজ করে তার আর রিন্‌তির চলত না। রিন্টির ভাল ফ্রক জামা বাবুর দয়াতে। তবু কোথায় যেন একটা পচা গন্ধ পায়। নাকে এসে লাগে। সে কোণার কাঠের বাক্স থেকে একটি ন্যাকড়া জড়ানো দেশালাই বের করে দিয়ে বলল, তুমি এখন যাও উদাসবাবু।

উদাসবাবুর সামনের পাটিতে দুটো দাঁত নেই। গোঁফ আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকে। কলকাতা যাবে বলে সকালে দাড়ি কামিয়েছে। বেশ চাকচিক্য। বসে এখন নিবিষ্ট মনে বিড়ি টানছে। যেন এখানে এসেছে বিড়িতে সুখটান দিতেই। তারপরই উঠে চলে যাবে। পূর্ণিমা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, বিপথে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে তোমার মায়া হয় না বাবু।

—মায়া। মায়ার টানেই তো করছিরে পূর্ণিমা। মায়া না থাকলে এত কে ধকল পোহাত। তোর কথা ভেবে, রিন্টিটার কথা ভেবে চোখে ঘুম নেই। এই ধর না।

—কি ধরতে বলছ।

—আগে শুনবিতো। বিড়িটা নিভে গেছে। বিড়িটার পোড়া দিকটা টিপে টিপে দেখল। না আর জ্বলবে না। দ্বিধা আছে। ফস করে আর একটা কাঠি জ্বালতে পারে কিনা। মুখ ঝামটা খেতে কতক্ষণ। তবু একটু গোপনে পাশ থেকে দেশলাইটা টেনে নিয়ে খচ করে বিড়িটা ফের ধরিয়ে বলল, আমি এত করছি কেন? তুই আমার কে?

—কেউ না।

—তবু কেউ। তুই বল।

—না কেউ না।

—মিছে কথা বলিস না। পূর্ণিমা, ভালবাসার জ্বালা।

—ভালবাসার জ্বালা। এখন মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করছ।

—কার জন্য বল্? আমার জন্য না তোর জন্য।

—আমার জন্য তোমার ভাবতে হবে না।

—তোর রিন্টির জন্যও ভাবব না।

—না। যা আছি, বেশ আছি। পাশের ঘরগুলিতে বিনি, কণারা থাকে। মটর বোধহয় বাজারে যাচ্ছে। রাতে ফেরার সময় কণার ঘরে হারমনিয়াম বাজছিল। কণার ঘরে ময়ফেল জমছে বেশ। সুরটা বেশ, গলাটা বেশ। যাবার সময় বলেছিল উদাসবাবু, কণা কি কামায়! দেখবি তোর রিন্টির গাড়ি বাড়ি না হয়ে যায় না। শুধু একটু সহবৎ শেখাতে হবে। লাইনে আগে ভিড়িয়ে দেই—দেখবি। কত ক্যাবেরে আছে। সব তালিমের ব্যবস্থা ওনারাই করবেন। তুই আমি পাশের ফ্ল্যাটে শুধু থাকব। গলদা চিংড়ির ফ্রাই, তারপর কাশী বৃন্দাবন। তোর তো এখন নাকি মন শুধু তীর্থ তীর্থ করে। সব হবে। নিজে তো উড়তে পারলি না, মেয়ের পয়সায় ওড়া কাকে বলে দেখিয়ে দেব। এত সব কথার পর পূর্ণিমা গত কাল কি গলে গেছিল। আর এক কাপ চা খাও বাবু। ছাড়তেই চাইছিল না। আর এখন সেই পূর্ণিমা মুখ ভার করে বসে আছে। কোথাও কোন ধনদে পড়ে গেছে পূর্ণিমা। বাজিয়ে দেখা দরকার।—তোর কি হল বলবি ত'। কিছু না বললে বুঝি কি করে।

পূর্ণিমা বলল, রিন্টি টের পেয়েছে। সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

—সব বোঝে!

—বোঝে না!

—তুই যে বলতিস কিছু বোঝে না! কতটুকুন বয়েস।

—কি বা বয়েস। চোদ্দয় পড়েছে।

—এ বয়সটা বড় সুধামুখীরে। বাবুরা লাখ টাকা খরচ করবে এমনিতেই।

পূর্ণিমা তক্তপোষের দিকটায় সরে গেল। দরজা ভেজানো। সামনে লম্বা বারান্দা। টালির ছাউনি। ক্যাচার বেড়া। কথা জোরে বলা যায় না। সারা সকালটা শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে। বাবুদের বাড়ি বলে এসেছিল, চার পাঁচদিন নাগা হবে। সকালে সে রিনতিকে ডেকে তুলেছিল। কি সুন্দর ভেজা ভেজা মুখ। এমন একটা মুখের দিকে তাকাতেই সে স্থির থাকতে পারেনি। কলতলায় নিয়ে গিয়ে বলেছে মুখ ধো মা। দাঁত মাজ। রিনতি কিছুই করতে চাইছিল না। গুম মেরে আছে। কাল রাতে খাওয়াতে পারেনি। সারারাত পাশে নিয়ে শুয়েছিল। কারণ ভয়, রিনতি না আবার পালায়। কাছে নিয়ে শুতেই টান ধরে গেল। উদাসবাবু মাঝে মাঝে চলে আসে রাতে, রিনতি সে-জন্য মার পাশে শুতে পায় না। চলে যাবে মেয়েটা, শাখা সিঁদুর, ফুল বেলপাতা নতুন কোরা লাল পেড়ে কাপড় সব যোগাড়—একটা তো রাত, কাছে থাক—শত হলেও পেটের মেয়ে - এইসব সাত পাঁচ ভেবেই সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিল—অ মা তারপরই কি হল, মেয়ে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে—ও-বয়সে আমাদেরও হয়েছে। ঐ যে কটুবাবুর বাড়িতে সে যখন ঘরটর মুছে দেয়, কটুবাবুই তো সাপটে ধরেছিল—বয়স কত চোদ্দও হবে না। সে কি ভেবেছিল, কে জানে, তার তো বড় আরাম লেগেছিল। বাবুর শরীরেব গন্ধ নিতে কার না ভাল লাগে। তবু মনের মধ্যে কি যে থাকে—ফুঁসে উঠতেই, বাবু হাত জড়িয়ে বলেছিল, এই শোন, ঠিক আছে, আর করব না। আর শোন, তারপর তোতলাতে আরম্ভ করেছিল। আর পূর্ণিমা তুমি তখন কি জোরেই না হেসে উঠেছিলে। ও চোদ্দ বছরেই ষোলকলা পূর্ণ। ফোটার কিছু বাকি থাকে না।

—কি ব্যাপার। কথা বলে পূর্ণিমা। আমি কি করব বল।

ফ্ল্যাট ভাড়া ফেরত দিতে হলে তোমাকে বেচলেও যে হবে না। আমাকে গুম খুন পর্যন্ত করে দিতে পারে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ পূর্ণিমা, কেন যে তোমার ফন্দিতে লোভে পড়লাম।

—আমার ফন্দি না তোমার ফন্দি।

—বারে তুমি টাকা টাকা করতে, গতর দিচ্ছে না বলতে, আমার সয় কি করে!

পূর্ণিমার মনে হল সত্যি এমন কথা বলেছে কি না। বলতেও পারে। যা একখানা মানুষ, সাঁঝ লাগলেই চাদর মুড়ি দিয়ে চিনেবাদামের ঠোঙ্গা হাতে ঢুকে পড়া। বেপাড়ায় ঢুকতে কে না ভয় পায়। আজকাল অবশ্য সেটা নেই। এদিকটায় ভোটের বিষয়টা নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ায় যখন তখন সবার মুখের উপর চলে আসতে পারে। উদাসবাবুর দয়াতেই—লাইট এয়েছে! রাস্তাটা পাকা হয়েছে। এখন সবাইকে বলছে, সুমুখের ঐ যে সরাইখানাটা আমবাগান পার হয়ে, শহরের সঙ্গে সেটা যোগ করাতে না পারলে সে এক বাপের জন্মই নয়। পূর্ণিমা হেসেছিল। সে কথা কিগো বাবু এক বাপের জন্ম নয় তো একটা মানুষ ক বাপের হয়ে জন্মায়।

—আরে ধুস। ও সব কথার কথা। শোন তাহলে এই কথা থাকল।

—কিন্তু রিন্টি!

—ও কি বোঝে!

সত্যি বোঝে না কিছু। সে বলেছিল ঠিক আছে। বাঘে খেলেও খাবে শেয়ালে খেলেও খাবে।

এত সব ধর্ম কথার পর কি না পূর্ণিমার বিবেক কামড়াচ্ছে এখন। আরে বিবেকের কি আছে। নিজেকে দিয়ে দেখ না। সেই ভাল, উদাসবাবু কথাটা নতুন করে সুরু করতে চায়। বলল, একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—তোর বাবার কথা মনে আছে?

—থাকবে না। ফুল বিক্রি করত খাগড়ার বাজারে।

—তোর মা তো বেঁচে আছে।

—থাকবে না কেন! মাতো কম আয়ু নিয়ে জন্মায়নি।

—তা থাকবে। কিন্তু বলছিলাম, খোঁজ খবর করিস?

—কখন করি! মরার সময় পাই না।

—তোর মা-টা ঘাটে ভিক্ষা করে খায়। তুই দেখিস!

— নিজেই চলতে পারি না, দেখিটা কি করে!

—সেই। উদাসবাবু লম্বা একটা হাই তুলল।

বেশ বড় হাই। ব্যাদান মুখ থেকে যে কোন সময় যেন একটা অজগর বের হয়ে আসতে পারে। চোখ ছুটো জ্বল জ্বল করছে। শিস দিচ্ছে কেউ। আর পূর্ণিমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এ-মুহূর্তে উদাস আর উদাসবাবু নয়। গা মোচড় দিচ্ছে। একটা অজগর হবার সব পূর্ব লক্ষণ দেখতে পেয়ে পূর্ণিমা সরে দাঁড়াল।

উদাসবাবু বলল, সরে দাঁড়াচ্ছিস কেন। জোরে কথা বললে ধরা পড়বি। থানা পুলিশ হবে জানিস। তোর জন্যে দেখছি শেষে হাজতবাস হবে।

হাজতবাসের কথায় পূর্ণিমাও ঘাবড়ে গেল। ওরা কারা! গুম খুনের কথা পর্যন্ত উঠেছে! সে যে কি একটা প্যাঁচে পড়ে গেল! রিন্টি আসছে না কেন। দশ পয়সার তেল আনতে মোড়ের দোকানে পাঠিয়েছে। কতক্ষণ লাগে। সূর্য গোপালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি তো! যদি বলে দেয়, মা আমায় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। আমার বিয়ে। জোড়া শাঁখা সিঁতুর কোরা লালপেড়ে শাড়ি সব ঠিক। মানুষটা কেমন জানিনারে গোপাল। আমায় ভয় করছে। তোরা আমাকে নিয়ে পালা! পালালে সব গেল। দারোগাবাবুর ডিম হয়ে যেতে পারে। দারোগাবাবু ডিমও খাবে, হাঁসও খাবে।

উদাসবাবু ফের বলল, রিন্টিরে ছেড়ে দিয়ে ভাল করিসনি। ছোঁড়া তিনটে তো তক্কে তক্কে আছে। দেখবি কখন নিয়ে ভাগবে।

রিন্টির তিন বাল্য সখা। গোপাল, সূর্য, বিশু। বনবাদাড়ে নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াত চার জনে। ওরা রিন্টির সমবয়সী—আজ্ঞাবহ দাস। রিন্টির জন্য ওরা জান পর্যন্ত দিতে পারে।

পূর্ণিমা এসব জানে বলেই ভয়ে ভয়ে আছে। রাস্তার ঐ ছোঁড়া তিনটেই মনে হচ্ছে সর্ব্বনাশের মূলে। জানলায় এসে রিন্টিকে ঠিক দুষ্টু বুদ্ধি দিয়ে গেছে।

উদাসবাবু বলল, ওরাই খাবে।

পূর্ণিমা বুঝতে পারে ওরা খেলে ফল ভাল হবে না। ওরা বেওয়ারিস তিন ছোঁড়া। চাল নেই চুলো নেই। রিন্‌টিরে নিয়ে করবেটা কি। সাহসে বুক বেঁধে বলল, ওরা রিন্‌টির অনিষ্ট করবে না বাবু।

—মাথায় হাত পড়লে সবাই ফোঁস করে পূর্ণিমা। তুমি ওদের সখীকে পার করে দেবার মতলবে আছ, ওরা মানবে কেন!

সখী কথাটা পূর্ণিমার গায়ে বড় বিঁধল। মর্যাদাবোধে শান দিচ্ছে বাবু। রিন্টির বাড়িঘর আছে, মা আছে, উদাসবাবু আছে। সর্বোপরি রিন্টির শরীর একখানা, বাবু মানুষেব মেয়েদের বলে ছাখ—যুবতী কারে কয়, নারী কয় কারে। সে কেন যাবে ঐ তিনটে হতচ্ছাড়ার সখী হতে। পূর্ণিমা বলল, তুমি কি! তোমার জিভে কি আছে! আমার মেয়েটা ওদের সখী হতে যাবে কোন্ দুঃখে।

—সেই। উদাসবাবু আবার হাই তুলল।

সহসা পূর্ণিমা চিৎকার করে বলল, ও বাবু অত হাই তুলছ কেন! আমার ভয় করছে।

উদাসবাবু বলতে পারত—ঢং। বলল না। ঢং কথাটা মেয়েদের শোভা পায়। সং বলতে পারত, কিন্তু সময় বড় দুঃসময়। কোনমতে উত্তপ্ত করা চলবে না। সে ভাল মানুষের মতো বলল, ঠিক আছে হাই তুলব না। বললে কি হবে, শরীর বলে কথা। ফের হাই উঠল। আর পূর্ণিমার কি বলতে গিয়ে মাঝপথে আটকে গেল। ওরও হাই উঠছে।

উদাসবাবু বলল, রাতে ভাল ঘুম হয়নি বুঝলি। তোরও হয়নি। পূর্ণিমা পর পর তিনবার হাই তুলল।

উদাসবাবু বলল, মানুষের মতি। রক্ত ঝিমুচ্ছে। আর তোর মেয়েটা টগবগ করে ফুটছে। প্রকৃতির আঁচ কে সামলাবে বল্। তুই নিয়ে না যাস, খড়কুটো দেবে ঐ তিন স্যাঙাত। না দিলে ল্যাংড়া সুকুমার। রিক্সা চালায়। একদিন রিন্টিরে দেখি শিস দিচ্ছে।

—রিন্টি আমার অমন মেয়েই নয়।

—হুঁ। যা বললি। আঁচ যিনি দিচ্ছেন, তিনি তো আর বসে নেই। গোপনে তিনি কাঠ কয়লা ফেলে যাচ্ছেন রিন্টির রক্তে। তুই আমি কে রে। যে কেউ এখন কড়া রস নামিয়ে খাবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। বছর কয়েকের মামলা। তারপর তুই যেমন রিন্টি তেমন। বাতের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা। পর পর প্রসবিনী রাই—এক গণ্ডা আণ্ডা বাচ্চা। নাকে পোটা, হেগে মুতে একসা। এইত চিত্রাবলী নারীজাতির। আর একটা পূর্ণিমা হয়ে লাভ কি বল। তার চে বরং···

পূর্ণিমা কেমন জোর হারিয়ে ফেলছে। কথা বলতে পারছে না। রিন্টির জন্য সে কত ভাল মরদ জোটাতে পারে। বাবুদের মরদরা গা চাটবে শুঁকবে ফাঁকে ফোকরে প্রবেশ করাবে—এই পর্যন্ত। মর্যাদা বিষম বস্তু।

হা-ঘরের মেয়ের জন্য কে আর মর্যাদা খোয়াতে যায়! সিনেমা বাইস্কোপে যা হয়, রিনটির জন্য তা হয় না কেন ভগবান!

সে এখন যেন পারলে মাথা ঠোকে।

এগুবে না পিছুবে! লাখ টাকা বলতে কথা। কত টাকায় লাখ টাকা হয়! রিন্টিরে এ-বয়সে ভিড়িয়ে দিলে দশ বিশ বছরে যা কামাই করবে—তার নাকি শেষ নেই। উদাসবাবু উঠি উঠি করছে। তাতানো কড়াই, যা দেবে সব ফুটবে। সে বলল, উদাসবাবু লাখ টাকা কত টাকা?

—এক গণ্ডা বুঝিস?

—বুঝি।

—কুড়ির হিসেব বুঝিস ?

—বুঝি।

—শয়ের হিসেব ?

—দাঁড়াও। মাথাটা গোলাচ্ছে।

—সোজা হিসেব। পাঁচ কুড়ি মিলে শ হয়। বলে পাঁচখানা হাতের আঙ্গুল উদাসবাবু মেলে ধরল। কি মাথা ঘুরছে ?

—না।

—এ-রকম দশটা শ একসঙ্গে করলে নাম হয় হাজার। বলে উদাসবাবু দু'হাত তুলে দশটা আঙ্গুল দেখাল। —বুঝলি।

পূর্ণিমা দশটা আঙ্গুল এক দুই করে গুনল। বড় আবাল মুখ করে রেখেছে। ধারাপাত এরে কয়। সে কিছুই এর হদিশ করতে পারে না। পাঁচ কুড়িতে শ' দশটা শয়ে কি যেন হয় বলল, কি যেন!

—এখুনি গুলিয়ে ফেলচিস! হাজার। হাজার হয় রে। এই রকম একশটা হাজারে, এক লাখ। দুখানা চৌধুরীবাবুর বাড়ি সহ একটা আমবাগান। দু'জন ছোকরা চাকর, দুধ ভাত মাছ যা খুশি খাবি। সুদের টাকায় তীর্থ করবি। বুঝে দেখ এর নাম মানুষের রামায়ণ। যুদ্ধ শান্তি সুখ ভালবাসা এতে লটকে থাকে।

—রিন্টির ছোকরাগুলো তিনখানা শাল পাচার করেছিল মনে নেই! ঐ টাকা দেখেইতো তুই গেলি। কি করবি না করবি ভেবে পেলি না। আর এ-হচ্ছে আসতেই থাকবে। বানের জলের মত হুড় হুড় করে গড়াবে। তুই বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে পারবি না।

পূর্ণিমা তখন হাইমাই করে উঠল।

—কখন গেল, ফিরছে না কেন!

—আর ফিরছে। শেষ বেলায় সব চৌপাট করে দিলি পূর্ণিমা। ছোঁড়া তিনটে নিয়ে ভেগে গেলে হাত কামড়াবি বলে রাখলাম।

পূর্ণিমার মাথা ঘুরতে থাকল। উদাসবাবু উঠে চলে যাচ্ছে। এটা উদাসবাবু করে থাকে। ভয় দেখানো। বোঝ তোর কে বেশি আপন। মেয়েটা না আমি। চললাম। আর তখনই পূর্ণিমা টের পায়, সারা

জীবন সামনে পড়ে আছে। ঘর ঝাঁট, বাসন মাজা, ঘর মোছা, মাছ কোটা, কাপড় কাচা, এঁটো কাঁটা তুলে এনে দিন যাপন নিত্য দিন, সব কেমন মার দাঙ্গা করে ধেয়ে আসছে। সে বলল, যেওনা উদাসবাবু। আমার যে কি ভীমরতিতে ধরেছিল। আসছি। বলেই ছুট লাগাল। রাস্তা থেকেই হল্লা, ওরে রিন্টি, পোড়ার মুখী, গতর জ্বালানি টোলানি ফোলানি কৈ গিলি! কতক্ষণ লাগে দশ পয়সার তেল আনতে। তুই কি ঘাটের মড়া হয়ে বসে আছিস। সাড়া দিচ্ছিস না! কে কার সাড়া দেয়। সব সুনসান। গজানন হালুইর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, সব আছে। কেবল রিন্‌টি নেই। মুদিখানার পালমশাইকে বলল, রিন্‌টি তেল নিয়ে কখন গেল পাল-মশাই। পালমশাই এখন ব্যস্ত। কার কথার কি জবাব দিতে হয় জানে না। কেমন বোবা কালা সেজে মাপ জোক দেখছে। নিক্তির কাঁটা দেখছে।

পূর্ণিমা ফের বলল, অ পালমশাই রিন্‌তি এয়েছিল!

—কে আসে কে যায় খেয়াল থাকে না মা। আসতেও পারে নাও পারে। কোনটা ঠিক কি করে বলি! বলে ব্যাগের মধ্যে কড় গুনতে থাকল। ধার্মিক মানুষ বসে মালা জপছে। আর গোমস্তাদের দিকে চোখ বুঝে নজর রাখছে।

পূর্ণিমা বলল, মরণ! ও রিন্‌টিরে। দোকানের সামনেই চেঁচাতে থাকল।

পেছন থেকে উদাসবাবু বলল, লাখ টাকা ফাঁক। পাখি উড়ে গেলরে।

॥ দুই ॥

রিন্টি নদীর পাড়ে এসে চুপ চাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। বেলা বাড়ছে। চোত বোশেখ চলে গেছে। নদীর জল কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও চরা জেগে আছে আপন মর্জি মতো। কিছু পাখি উড়ে এসেছে কোত্থেকে। ওরা চরায় বসে খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছে। দূরে শ্মশান। সেখানে মানুষ পুড়ছে আগুনে। নদীর জলে স্নান সারতে যাচ্ছে কত মানুষ। কোথাও কয়লার টিবি, ধোঁয়া উঠছে। দুটো কুকুর পাশ দিয়ে গেল। একবার শুঁকেও গেল রিনটিকে। গোপাল, বিশু, সূর্য ডেরায় নেই। ভেবেছিল ওদের পোষা কুকুরটা থাকবে দরজা আগলে সেটাও নেই। সেখানে সে বসে থাকবে ওদের অপেক্ষায় তারও উপায় ছিল না। মা আবাগি তাকে ফিরতে না দেখলেই খুঁজতে বের হবে। ডেরায় এসে উঁকি-ঝুঁকি মারবে। জায়গাটা নিরাপদ ছিল না বলে, সে দৌড়ে এদিকটায় চলে এসেছে। পাড়ে বাবলার ঘন বন মাইল খানেক জুড়ে। পরে হাসপাতাল। মর্গ বাবলা বনের একপাশে। মর্গ থাকলে বোধ হয়—সেখানে মানুষ জনের চলাচল কম থাকে। সে এমন এক জায়গায় বসে আছে যেখান থেকে আকাশ, নদী, খেয়াঘাট, মানুষের পারাপার সব দেখা যায়। কেবল কেউ তাকে দেখতে পাবে না। কারণ কি করে বুঝেছে, সে যত বড় হচ্ছে, মানুষজন সব কুকুরের মতো তার দিকে তাকাচ্ছে। তার এই শরীর কি যে বিপদে ফেলে দিল। কোথাও সে নিস্তার পাবে বলে মনে হয় না। যেন শুয়ে শুয়ে কুকুর ঠিক গন্ধে গন্ধে এদিকটায় রওনা হয়েছে। কোনরকমে ফ্রক দিয়ে পুরো উরু ঢেকে বসে আছে। যেন গাছপালাকেও ভয়। কীট পতঙ্গ নাড়াচাড়া করলে পর্যন্ত আঁৎকে উঠছে।

প্রথমে মনে মনে বিশু, গোপাল, সূর্যকে গাল দিল। কালও গেছিল। জানলায় দাঁড়িয়ে বলেছে, ও রিনটি, আমার সোনার আংটিরে।

রিনটি বলছে, সোনার আংটির মরণ !

—মরণ কেনরে !

—কলকাতায় পাচার হয়ে যাচ্ছি।

—কলকাতায়। ও কত বড় শহররে। আমরাও যাবরে। তুই বড ভাগ্যিমানিরে।

— তোদের মুখে থু থু।

—থু থু দিস না। তুই থু থু দিলে আমরা বাঁচি কি করে !

রিন্টির কেমন কান্না পাচ্ছিল। বিশু, গোপাল, সূর্য সকালে একবার এল না! তারপরই মনে হল, আসতে পারে—কিন্তু দূর থেকেই টের পেয়েছিল, মা কাছে কোথাও আছে। ক'দিন থেকে কেবল শাসাচ্ছিল মা, পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তা দিতেই পারে। ফল-পাকুড় চুরি করে বেচে দেয়। ডাবের দিনে ডাব, আমের দিনে আম। মানুষ বেওয়ারিশ হলে বাঁচে কি করে! ওর কথাতেই আর এঁটো কাঁটা নিয়ে ঝগড়া করেনি, ভিখ মেগে খায়নি, বেচে থাকার একটা তড়িকা পেয়ে গেছে। সেই তিন অনুগামী তারা এখন যে কোথায় তাকে ঢুড়ে বেড়াচ্ছে!

সে কি করবে ভেবে পেল না। কোথায় যাবে বুঝতে পারল ন। যত-দূরেই যাক, ঠিক উদাসবাবু টের পেয়ে যাবে। উঁচু মহলের সঙ্গে উদাসবাবুর খুব খাতির। বিশু, গোপাল, সূর্যর সঙ্গে রিন্টি বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ালে, উদাসবাবু, মা মাথা ঠিক রাখতে পারত না। কতদিন শাসিয়েছে, দেব শালাদের ফাটকে পুরে। বুঝবি মজা। রিন্টি জানে, সে হারিয়ে গেলে, পুলিশ কাচারি হবে। কোথাও তার নিস্তার নেই।

সেই লোকটার সঙ্গে যদি দেখা হত। গাছে গাছে, কোনো বট বৃক্ষের ডালে অথবা পোড়ো বাড়ির পাঁচিলে, জেল-খানার গেটে যে লিখে রাখে, মানুষ মরে যায়। মানুষ তেলে ভেজাল দেয়। আবার কখনও লিখে রাখে, মানুষ সুন্দর বাড়ি বানায়। ফুলের বাগান করে। মানুষ সব পারে। মানুষের কাজের শেষ নেই। মানুষ বেঁচে থাকতে

ভালবাসে। এই সব কথা লিখে রাখে আর বলে, সে এ-ভাবে একটা বই লিখে যাচ্ছে। মহাভারতের সমান বই। সেদিন সে এসেছিল হন্তদন্ত হয়ে। সে নাকি কোথাও কোন ইঁটের টুকরো খুঁজে পাচ্ছে না ভাল। চকখড়ি সে স্কুলের মাঠ থেকে কুড়িয়ে নেয়। তাও শেষ। সে বিশুদের ডেরায় এসে হাজির। কাঁদির রাজবাড়ীর পাঁচিলে লিখতে লিখতে তার তিন তিনখানা চকখড়ি শেষ। পয়সা নেই। থাকার কথাও নয়। জোব্বা তালি মারা, দু' পায়ে দু' রকমের জুতো পরে আছে। মাথার চুল কারা নাকি কামিয়ে নেড়া করে দিয়েছে। ভয়, আসলে ভয় ধরে যায় ওর লেখা পড়লে। সেই ভয় থেকেই তারা লোকটার মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে দিয়েছিল। সে লিখে রেখেছিল কারবালার কবরের শানে—মানুষের সুসময় আসতে দেরি নেই। চোর বাটপাড় ধানদাবাজরা সাবধান। বাবুমশায়রা সাবধান। ধেয়ে আসছে বলে। এ-সব কথার পর স্থানীয় একজন বড় মানুষ সম্পর্কে কি যেন অশ্লীল মন্তব্য করেছিল বাইরে চাক-চিক্য, ভিতরে ভিতরে কয়লার আধার। দেখ গিয়ে যুবতী নারী সুধা পারাবার করে কেমন লবেনচুষ চুষছে। নারীর নামও লিখে রেখেছিল। বড় মানুষের কানে কথা উঠে যায়। এত বড় আস্পর্ধা, আন ধরে। কান মলে দাও, ঘোল ঢাল। মাথা মুখ কামিয়ে নাড়ুগোপাল বানিয়ে দাও। সে নাড়ুগোপাল হয়ে ফিরে এসে বলেছিল, আজ আর কিছু খাবনারে। বাবুদের ঘোল খেয়ে পেট ঢাক। বলে সে বগল বাজিয়ে চলে গিয়েছিল। সে খুব খুশি। বাবুদের বুকে তরাস লাগিয়ে দিতে পেরেছে।

সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে রিণ্টি-এখন তাকে গুরুজন ভাবতে পারত।—এই কাকাবাবু, তুমি আমার কাকাবাবু হও। কি ঠিক না। আমার মা, উদাসবাবু আসছে। খুঁজছে। তুমি কাকাবাবু আমাকে নিয়ে চল। বিশু সূর্য গোপাল আর তুমি আমি। ওদের বলে দেব, তোমায় কাকাবাবু ডাকতে। তালে আমাদের একটা সংসার হয়ে যাবে। নেড়ি কুকুরের ভয় থাকবে না। ওরা বড় আমায় শুঁকতে চায়। কি গন্ধ! ওর এ-সব ভাবতে গিয়ে কেমন ওক উঠছিল।

আসলে সারা সকাল কিছু খায়নি। বিশু সূর্য থাকলে মুড়ি বেগুনি খেতে পারত। ওরা যে এখন কোথায়! রিন্টি বুঝতে পারে এ বয়সে একা সে বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারবে না। লোকের চোখে পড়ে যাবে। মেয়েটা কার রে। ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঘুরছে। খারাপ লোকেরও অভাব নেই। সেই মানুষটার এক কথা। পৃথিবীটা খারাপ লোকে ছেয়ে গেল রে রিন্টি—কি যে হবে। কেউ স্বার্থ ছাড়া কুটো গাছটা নড়ায় না। কেন এমন হয় ভগবান।

রিন্টি উঠে দাঁড়াল। গাছের পাতা নড়ছে। দক্ষিণের হাওয়া বইছিল। কোথাও রিন্টি এমন কিছু দেখল না যা অন্যদিনের চেয়ে আলাদা। মানুষজন সেই নদী পারাপার করছে। গরুর গাড়ি ধানের বস্তা বোঝাই সার সার দাঁড়িয়ে। নদী পার হবার আগে চরায় আগুন জ্বেলে সেদ্ধ ভাত খাবে বলে স্নান-টানের ব্যবস্থা চলছে। সে একটু এগিয়ে গেল। এটা হাসপাতালে উঠে যাবার পথ। এ-পথে হেঁটে গেলে জেলখানার পাঁচিল, বড় বড় গম্বুজের মতো কি সব মাথা উঁচিয়ে। পাঁচিলটা এত উঁচু যে ঘাড় সোজা করে দেখা যায় না। এর মধ্যে কি যেন একটা আছে—কুয়োর মতো। গলায় দড়ি পরিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া। সূর্য গোপাল দেখে এসে বলেছে—হেজে মজে আছে। স্যাওলা ধরেছে। স্যাওলাতে ফুল ফোটে সে জানত না। ছোট মুক্তো দানার মতো ফুল তুলে এনেছিল রিন্টির জন্য। ফুলগুলি সে পরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, মা মানুষের যেখানে ফাঁসিকাঠ আছে সেখানে এখন ফুল ফুটে আছে। মা সব শুনে তাকে তেড়ে এসেছিল। জায়গাটার কথা সেও জানে। সাহেবদের আমলে খুনে ডাকাত স্বদেশীর গলায় দড়ি পরানো হতো। সেখানকার ফুল, ছুঁলে যাত যাবে নাতো ; তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। গঙ্গায় ডুব দিয়ে সেবারে সে পার পায়।

রিন্টির সেই মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বলত, মানুষই মানুষের জন্য ফাঁসিকাঠ তৈরি করে রাখে। মানুষই মানুষকে ছন্নছাড়া করে। মানুষের ইচ্ছের শেষ নেই।

এখানটায় বড্ড মানুষের ভিড়। বাস স্ট্যাণ্ডে বিশু, গোপাল, সূর্য থাকতে পারে ভেবে জেলখানার মাঠ পার হয়ে সে চলে এসেছে। স্কুল বাড়িটার গেট বন্ধ। আজ কি বার। আজ রববার না শনিবার। সে ঠিক অনুমান করতে পারছে না। কারণ তার কাছে সব বারগুলিই সমান। এক একটা দিনের আলাদা মাধুর্য আছে, সে বার, তারিখ হিসেবে টের পায় না। নতুন দিন হিসেবে সে বুঝতে পারে, তার যেন কত কিছু করার কথা। মা তাকে কদিন শেকল তুলে দিয়ে ঘরে, কাজে গেছে। ছোঁড়াগুলির উৎপাতে নাকি মাকে এমন করতে হয়। রিন্টি ভেবে পায় না, ওদের এত খারাপ ভাবে কেন মা। সেই কবে থেকে তো ওরা তার সব, সখা ইয়ার দোস্ত আর কি বলে যেন, সঙ্গী কথাটা মনে এল তার। বন বাদাড়ে যখন যেখানে গেছে ওরা কখনও নেড়ি কুকুর হয়ে যায়নি। কে নেড়ি কুকুর, কে নয়, সেতো চোখ দেখলে টের পায়। উদাসবাবু কলকাতায় নিয়ে কি করতে চায় কে জানে। গোপাল থাকলে ঠাণ্ডা মাথায় পরামর্শ করা যেত। তার বয়সে বিয়ে দিলে পাপ হয় শুনেছে। পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। উদাসবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। তারপর মনে হল উদাসবাবু বড় উঁচুমহলের লোকদের সঙ্গে ফিসফাস কথা-বার্তা বলে। পুলিশ তারে ধরবে কেন! যত হেঁটে যাচ্ছে তত বুঝতে পারছে সে খুব অসহায়।

তখনই শুনল, অনেক দূর থেকে কে যেন হাঁকছে অরে রিন্টি, আমার সোনার আংটি! ইতি উতি করে, গোড়ালি উঁচু করে তাকাল, না কেউ নেই। কেউ ডাকছে না। মনের মধ্যেই কেউ হেঁকে যাচ্ছে বোধহয়। রিন্টি ফের শুনলো, সোনার আংটি কার? যার হাতে আছি তার। এখন কার? এখন উদাসবাবুর। পরে কার?

রিন্টি জবাব দিল, কোন এক কর্মকার। তারে আমি জানি না, গড়িয়ে পিটিয়ে মানানসই করে নেবে বলছে। আমি তোদের কেউ না! তোরা কোথায় গেলি! কেমন অভিমানে চোখে জল এসে গেল। এসব জায়গায়, ঐ যে লাল দিঘী, জজকোর্ট, উকিল পাড়া সব তার

কাছে এক সময় বড় মধুর জায়গা ছিল। সরকারী খামারে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। রেশম কীট ধরে এনে দিয়েছে বিশু। আর কিছুদুর গেলেই লোহালক্কড়ের কারখানা—অনেক দোকান পাট, তারপর সোজা রাস্তাটা চলে গেছে রেল লাইন পার হয়ে, তারপর দুটো রাস্তা দু' দিকে গেছে। একটা কবরখানার দিকে, আর একটা লালবাগ। সে কতদুর এসে গেছে! ডাইনে পাক খেলে ইষ্টিসনের মাঠ—খাঁ খাঁ করছে। গরু মোষ চরছে সেখানটায়। রোদ মাথার উপর। রোদে মুখ লাল। শ্যামলা মেয়ের বড় চোখ, গোছা গোছা চুলে রোদ চিক চিক করছে। তবু কেউ কোথাও নেই। কেবলই মনে হয়েছিল, ঠিক কোথাও থেকে ওরা ওকে দেখতে পাবে। দৌড়ে আসবে। নেই। সে ভেবে পেল না এখন কোথায় আর যেতে পারে! সেই বস্তির ঘরটায় ঠিক হুলস্থূল পড়ে গেছে। উদাসবাবু খুঁজতে বের হয়েছে। মা বের হয়েছে। এমন একটা দামী বস্তু হাত ছাড়া হলে কার না রাগ হয়। সে এবার নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলল, তোর মরণ রিন্টি। মরণ লেখা থাকলে কি করবি! তারপর সে গাল দিল ওদের। বিশু তোরা মর, মর, মর। তোরা আমার কেউ না আমি কলকাতায় চলে যাব। তোরা জীবনেও আমাকে খুঁজে পাবি না।

তারপর রিন্টি দৌড়াতে থাকল। শহরের ভিতর দিয়ে সে গেল না। সরকারী খামারের আলে আলে দৌড়াতে থাকল। সেনেদের আমবাগান পার হয়ে গেল। বিষ্ণুপুরের বিলের পাড়ে বাঁশের বন—সেটা সে পার হয়ে হোতার সাঁকোর কাছে একটা তেলকলে পড়ল। গলিগুঁজি ধরে সে ছুটছে। লোকজন তাকাচ্ছিল। এমন একটা শ্যামলা সুন্দর মেয়ে ভর দুপুরে দৌড়ায় কেন! কি কষ্ট তার। জানালায় কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা চিনতে পারল, তারা বলল, ওরে রিন্টি দৌড়াচ্ছিস কেন! মেয়েছেলে হলে বলল, ট্রেন ফেল হয়ে যাবে মাসি। বেটা ছেলে প্রশ্ন করলে বলল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মা আমার রাগ করবে। বিষয়টা বোধগম্য হল না। একটু পাগলাটে মেয়ে—কতবার দেখেছে, ওরা চারজন দলবেঁধে

কোথায় যায়। মা-টা পরের বাড়িতে কাজ করে। পরের বাড়ি কাজ করলে স্বভাব চরিত্র ভাল থাকে না। তার মেয়ে—কত আর ভাল হবে। বাউণ্ডুলে মেয়েটার এমন দায়িত্ব জ্ঞানেও লোকে কিছুটা ভ্যাবলু বনে গেল। ট্রেন ফেল হবে মাসি। কোথাকার ট্রেন, কোথায় যাবার কথা কিছুই বুঝল না তারা।

রিন্টি বাড়ি ফিরে, দেখল মা ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে। মটরদা ছুটোছুটি করছে। উদাসবাবু মাথায় জল ঢালছে! তাকে দেখে সবাই হা হা করে এল। কোথায় গেছিলি! কনা মাসি, বিনি মাসি আর অন্য সবাই বড় গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকাচ্ছে। উদাসবাবু জল ঢালছে আর বলছে, অ শুনছ, রিন্টি এয়েছে।

আর এয়েছে কথাতেই মা তড়াক করে উঠে বসল। তারপর সামনে রিন্টিকে দেখেই চুল খামচে ধরল। পিঠে গুম গুম করে কটা এলোপাথাড়ি কিল, মেয়ে আমার সর্বনাশী। আমার কি হবে গ! এমন রাক্ষুসী নিয়ে বাঁচব কি করে! সব ঠিক ঠাক—তিনি পগাড় পাড়। এলি কেন মরতে বাছা।

উদাসবাবু বলল, হয়েছে থাক। এখন আর পূর্ণিমা নাটক করতে হবে না। ছোঁড়াগুলিকে ছেড়ে দিই।

এমনিতে ছেড়ে দিও না! ঠ্যাং, ভেঙ্গে ছেড়ে দাও। আর এমুখো আসছিস তো নোড়া গুঁজে দেব মুখে।

রিন্টি হাঁ। যাদের খোঁজে সে গিয়েছিল, তারা তিনজনই ঘরের মধ্যে বসে। উদাসবাবু শেকল তুলে আটকে রেখেছে। শেকল খুললে রিন্টি সব টের পেল। ওরা রিন্টির খোঁজে এসেছিল বোধ হয়। মার স্বভাব তার জানা, কিছুই না বলে ডেকেছে ভিতরে আয়। খাবি। খাবার নাম শুনলে মাথা একটারও ঠিক থাকে না। ভেতরে ঢুকলে বোধহয় বলেছে, বল রিন্টি কোথায়। কোথায় পালিয়ে রেখেছিস। থানা পুলিশেরও ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু সে কোর্ট থানা করতে আঠার ঘা। তাই বুঝিয়ে শুঝিয়ে খোঁজাখুজি চলেছে। ওরা জানবে কি করে সে কোথায়। বড় টান ধরে গেল রিন্টির।

কেউ নেই ওদের। কেউ দেখে না। মাথার উপর গুরুজন না থাকলে সবার লাঠি ঝাঁটা কপালে। সে বলল, কেন এসেছিলি তোরা। মরতে পারিস না। লজ্জা হয় না। মনে কর না রিন্‌টি মরে গেছে।

ওরা তিনজনই হাঁ। রিন্‌টি কি পাকা পাকা কথা বলছে। বিশু বলল, তুই কোথায় গেছিলি। তোর মা ভিরমি খেল। যত বলি জানি না, উদাসবাবু তত বলে গর্ভস্রাবের দল, তোরা জানিস নাতো কে জানে।

সূর্য বলল, বললাম জানি না। আমার কান টেনে বলল, খবরদার একটা কথা না। রিন্‌টিকে খুঁজে না পেলে থানায় নিয়ে যাব। আমরা তোর কিছু অনিষ্ট করেছি রিন্‌টি।

রিন্‌টি বলল, তোরা যা বিশু। আর আসিস না।

—তুই চলে যাবি সত্যি।

—যাব।

—আমরাও যাব।

পূর্ণিমা বলল, থানায় খবর দাও উদাসবাবু। ওরা রিন্‌টির পেছন নেবে বলছে। গুণ্ডা পেছনে লেগেছে রেপোর্ট কর।

রিন্‌টি খুব গম্ভীর গলায় বলল, থানায় খবর দিয়ে দেখ না। সব বলে দেব।

এত সব শুনে বিনি মাসি কণা মাসি মুচকি হাসল। কপাল কেমন কার জানতে বাকি নেই। রিন্‌টির কপালে ভাল কথাবার্তা লেখা আছে। ওরা যদি বয়েস থাকতে কলকাতায় যেতে পারত। গোঙানি তো শরীরের লেগেই আছে। কেউ একটু দয়া দেখিয়ে বলে না, থাক আজ। টাকা কটা রাখ। শরীর ভাল নেই যখন চলে যাচ্ছি। কলকাতার কথাই আলাদা। বড় বড় ডাক্তার—রোজ এসে চেক করে যাবে। গায়ে গতরে ঘা ফুটতেই দেবে না। ধুয়ে মুছে একেবারে আতপচালের নবিষ্ঠি বানিয়ে রাখবে। ফুল চন্দন বেলপাতা আর কত সৌরভ তখন। ওরা পরের দায়ে মাথা গলিয়ে বেকুফি করতে চাইল না। যে যার ঘরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে

মানত করল, আর জন্মে কপাল একখানা করতে হয় যেন রিন্‌টির মতো ঠাকুর। রিন্‌টিকে ওরা হিংসা করে না। ভাল হোক মেয়েটার। সাপে খেলেও খাবে, বাঘে খেলেও খাবে। এক ঘরে এক বাবুর হয়ে সারাজীবন কে আর চায় বসত করতে। সবই শরীর। পুষ্ট শরীর হলে সোহাগ, বেমারি নাচারি মানুষকে দুর দুর ছাই ছাই। ডিভোর্স। ঘরে পার করে দিয়ে বনবাসে রেখে আসা। এটা কত স্বাধীন জীবন, আজ ভাল নেই শরীর বাবু, যাও। আজ ছুটি, সিনেমা দেখব আর পড়ে পড়ে ঘুমাব—ছুটি। ঘর সংসার করা নেই। আণ্ডাবাচ্চার কাইমাই নেই—কি খাওয়াব তার ভাবনা নেই। কেবল দেহখান রাখ আর উপুড় করে পয়সা লাও। শেষ বেলায় তীর্থ। যৌবন মেয়েমানুষের কদ্দিন। বছর কুড়িও নয়। সময় মতো রিন্‌টির জায়গা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে মনে হিংসা—তবু ভাল হোক হে ভগবান। ভাল হোক মেয়েটার।

রিন্‌টি বলল, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? যা! মা আমার ভাল হয়ে গেছে। তোরা থাকলে আবার ভিরমি খেতে পারে।

সূর্য-বিশু-গোপাল এই একজনকেই মান্যিগণ্যি করে। রিন্‌টির উপর কথা নেই। রিন্‌টিকে এখন যেন ওরা দিদি বলে ডাকতে পারে। কত কম বয়সে রিন্‌টি মেয়েমানুষ হয়ে গেল। এক সঙ্গে বড় হয়েছে পাড়ায়—ওরা যত বাড়ছে, রিন্‌টি বাড়ছে দ্বিগুণ হারে। মেয়েমানুষদের গতরই এই রকম। ধা করে বড় হয়ে যায়। রিন্‌টি চলে গেলে ওদের আর কিছু থাকল না। আবার যা কিছু অসামাজিক কাজকর্ম করতে দ্বিধা করবে না। চোখে এমন কিছু ভেসে উঠতেই রিন্‌টি টের পেয়ে যায়। বলে, তোরা ভাল হয়ে থাকবি।

এসব কথা কত অর্থহীন রিন্‌টিও বোঝে। জন্মেছে, বড় হয়েছে বলেই তার ভার কেউ নেবে কথা নেই। সংসারে যার যার তার তার। যার যত মুরদ সে তত ক্ষুদিরাম! সহসা রিন্‌টির জিভ বের হয়ে এল। নামটা সে যেন শুনেছে। সেই যে মা গাইত, চিনতে যদি না পার মা গলায় দেখবে ফাঁসি—এমন গানের সঙ্গে নামটা যুক্ত হয়ে আছে। সে

মাথা নোয়াল সবার গোপনে। তোমরা ঠাকুর দেবতা হয়ে যাও—দেখতে পাও না তোমাদের নাম নিয়ে বিশ্বম্ভরবাবুরা গলায় চাদর, পাম্প স্যু আর উঁচু জায়গায় উঠে গলা কাঁপিয়ে দেশহিতৈষি বক্তিমা। ঠাকুর তোমরা পেছনে দাঁড়িয়ে থাক। রিন্‌টি একবার তখন একটা সভা পুলিশ মাঠে দেখেছিল। কি বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল। পেছনে বড় বড় ছবি—কোনটা চিনতে পারে, কোনটা পারে না। সেখানে সে বিশ্বম্ভরবাবুর মতো ফিকিরবাজ লোকদের দেখেছিল বক্তিমা করতে। ভাল ভাল কথা বলছে। লোকে জানে লোকটার পয়সা আছে—এই শহরে আছে, কলকাতা শহরে আছে। তেল কল, আটা কল, সিমেণ্ট কতকিছুর কারবার। সেই বিশ্বম্ভরবাবুর হেপাজতেই তাকে আপাতত রাখা হবে। উদাসবাবু লোক চেনে। ঠিক জায়গায় গুটি বসিয়ে দিয়ে এখন তক্তপোষে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে।

এইসব ভাবনা শেষ হতেই দেখল, গোপাল-বিশু-সূর্য চলে যাচ্ছে। মা বলল, ঘরে যা।

রিন্‌টি বলল, যাব না।

—কোথায় গেছিলি ?

—বলব না।

পূর্ণিমা এখন তেজি ঘোড়া। মেয়ে ফিরে আসায় বাহার আবার দেখে কে। সে ঘরে ঢুকেই বলল, উদাসবাবু, রাতের টিকিট কেটে ফেল। নরকে আছি। যত তাড়াতাড়ি পার পালাবার ব্যবস্থা কর।

॥ তিন ॥

রিন্‌টি রওনা হবার আগে বসে বসে কাঁদল।

কার জন্য কাঁদল কেউ সঠিক বলতে পারল না।

উদাসবাবু ভাবল, জায়গা ছেড়ে গেলে সবারই মন খারাপ করে। একবার বলার ইচ্ছে ছিল, ওঠ মা। তাতো রিন্‌টি তার মেয়েরই বয়সী। তার মেয়ে থাকতেই পারত। বিয়ে না করলে মেয়েটা আসবে কোত্থেকে। কিন্তু রিন্‌টি মেয়ে বললেই মেয়ে হবে কেন। ভেতরে যে উদাসবাবুর মন কুড় কুড় করে। বিদেশী কি একটা বই যেন, নাম মনে আসছে—না, কি যে হয় মাঝে মাঝে—রিন্‌টির মতো মেয়েকে চেটে দেখবার জন্য তার মাকে সাদি করে ফেলল। সেও তো সই গোত্রের লোক হয়ে গেছে। সে বলল, ওঠ রিন্‌টি দুর্গা দুর্গা বলে রওনা দিই।

পূর্ণিমা ভাবল, ঢং। কে ওরা তোর। ওরা তোকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, না আমি করেছি। গতরের আর আছেটা কি। তোর মুখের দিকে তাকিয়েই সব করা। বড় হয়েছিস, এখন যদি কষ্ট না বুঝিস কবে আর বুঝবি। ওরা তোর ক্যারে। চোর ছ্যাচ্চোর সব। কত বড় ইজ্জত তোর হবে, দেখবি। গাড়ি বাড়ি হবে। উদাসবাবু মিথ্যে বলে না, পূর্ণিমা তুমি রাজমাতা। তারপরেই কূট প্রশ্ন, রাজমাতা কেন? রিন্‌টিতো মেয়ে। সে রাজকন্যার মা হতে পারে। রাজরাণী হতে পারে। আসলে এই যে রওনা হওয়া সে যেন কোন এক রূপকথা দেশের খোঁজে। লোভ বড় বেশি শরীরে পাক খায়। মেয়েটার উপর মায়া এসে গেল ফের। বলল, নে ওঠ মা। বুঝি কষ্ট হয়। নবদ্বীপ থেকে যখন এখানটায় আসি আমারও কষ্ট হয়েছে। নিজের চেনা-জানা গাছপালা বাড়িঘর ছেড়ে যেতে সবারই মায়া হয়।

বিনি ভাবল, আহারে। এই তো সেদিন হল মেয়েটা। আতুর

ঘরে সেই গিয়েছিল। প্রথমে সে বলেছিল, তোমার ছেলে হয়েছে পূর্ণিমাদি। মেয়ে দেখে বিনির গতর জ্বলে যাচ্ছিল হিংসায়। এখানে মেয়ে হওয়া মানেই ভাগ্যবতী হওয়া। পরে মাথার গরম ভাবটা কমে গেলে বিনি বলেছিল, ও মা এযে দেখছি মেয়ে গ! পূর্ণিমাদি তোমার কি কপাল ভাই। পূর্ণিমা লালঝোলের মধ্যে পড়ে থেকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। সেই মেয়ে কলাগাছের মতো বছর ঘুরতেই ফর ফর করে ডানা মেলে ধরল। এই তো সেদিন। নন্দ স্যাকরার এখন সে বাঁধা রাঢ়।

উদাসবাবু শুনতে পেল, রাস্তায় রিকসা ক্রিং ক্রিং করছে। খবর দিচ্ছে টেরেনের সময় হয়ে গেল। এই বেলা উঠে পড়।

সালোয়ার কামিজ পরায় রিন্টিকে গতরে আরও কলাগাছ দেখাচ্ছে। সবুজ সব কিছু। রোদে বৃষ্টিতে একটা গাছ যেন প্রকৃতির সব রস চুষে নিয়েছে। শরীরে যে কি থাকে! এক মাথা চুল। বিনুনি বাধায় অনেক লম্বা হয়ে গেছে বিনুনি। কোমরের নিচে নেমে গেছে। সেখানে রঙিন প্রজাপতির মতো লাল রিবন। মনে হয় প্রজাপতিটা গন্ধে গন্ধে এইমাত্র উড়ে এসে বসেছে। পায়ে লাল রঙের ষ্ট্র্যাপ দেওয়া স্যাণ্ডেল। রাতের গাড়ি বলে সাবধানে যেতে হবে। একটা চিরকুট আছে উদাসবাবুর কাছে। কার হস্তাক্ষরে এই চিরকুট পুলিশের সাধ্য নেই বের করে। রিন্টির কলকাতা দর্শনের এটা ভিসা। এটা হাতে না থাকলে উদাসবাবু কলকাতা যেতে সাহসই পেত না। কলকাতা একবেলা খেতেই দু-আড়াই টাকা লেগে যায়। লোক গিজ গিজ করছে। কেউ কাউকে চেনে না। মাইফেল করার এমন একটা গোপন অথচ খোলামেলা জায়গা ভাগ্যিস চার্ণক সাহেব পত্তন করে দিয়ে গেছিল। গড় হতে হয় ঐ মানুষটার কাছে। যেন উদাসবাবু কলকাতার সেই যুগের মানুষ হয়ে গেছেন! তখন বাবু কালচার, উদাসবাবুর সামনে একটা জুড়ি গাড়ি ভেসে উঠলে বলল, ওরে আমরা আসছি।

বাইরে দু-খানা রিকস। রিন্টি কলকাতা যাচ্ছে। সবাই এসে

আদর সোহাগ করল। অভয় দিল। কেন যাচ্ছে রিন্টি না জানলেও লাইনের মেয়ে হলে বুঝতে বাকি থাকে না। বলল, ভাল থাকবি যা। আমাদের সঙ্গে কে এসেছিল। আমরা কি মরে গেছি! ভয় কি!

সত্যি ভয় কি এটা কে বোঝায়! রিন্টির সুন্দর পা দু-খানা থর থর করে কাঁপছে। যেন এক্ষুণি আবার শুনতে হবে, ওরে রিন্টি তুই আমাদের সোনার আংটি।

তারপর রিকস রওনা দিল। পূর্ণিমা মেয়েকে নিয়ে এক রিকসয় উঠেছে। মোড়ে এসে দেখল বিশু গোপাল সূর্য দাঁড়িয়ে আছে। চুল উসকো খুসকো। খাঁকি হাফ প্যাণ্ট পরা ছেঁড়া তালিমারা জামা গায়। কিছু ফুল হাতে। সূর্য দৌড়ে এসে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে বলল, তুই ফুল ভালবাসতিস, ফুল কটা নিয়ে যা। সেনেদের বাগান থেকে চুরি করে এনেছি।

রিন্টি কিছু বলল না। ফুলগুলি কোলে রেখে মাথা এলিয়ে দিল।

উদাসবাবু বলল, ওরে তাড়াতাড়ি চালা। ট্রেন ফেল করব!

পূর্ণিমা তখন পেছন দিকে তাকাল। ছোঁড়াগুলো যা পাজি, রিকসার সঙ্গে সঙ্গে না দৌড়ায়। এই হতচ্ছাড়াদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে বলে মনে স্বস্তি। তবু সংশয় যায় না। বার বার মুখ বাড়িয়ে পেছনে লক্ষ্য রাখছে। সিনেমা হল পার হলেই, জলের ট্যাঙ্ক, টাউন-হল, তারপর লালদিঘী পার হয়ে জজকোর্টের রাস্তায় রিকসা পড়তে পূর্ণিমা নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। মানুষের বাচ্চা নাতো তিনটে ফেউ। কি যে কাল হয়েছিল ছোঁড়া তিনটের। রিন্টি যা ভাল বাসত তাই এনে দিত। এর পিছনে ছোঁড়া তিনটির যে এতবড় অভিসন্ধি ছিল কি করে বুঝবে। উদাসবাবু না থাকলে কে তাকে এমন বিপদ থেকে উদ্ধার করত।

রিন্‌টি চোখ বুজে ছিল। তাকে বনবাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কত সুন্দর সুন্দর ছবি সে বড় হতে হতে দেখেছে, একটার সঙ্গেও তার

জীবনের মিল খায় না। কেন এমন হয়! বাবুদের বাড়ির মেয়েরা স্কুলে যেতে যেতে কেমন গল্প করে, হাসে, পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে কাঁদে, এসব তার কাছে কেবল রঙিন ছবির মতো। সে বড় হতে হতে শরীরে যে কি সব ইতিউতি করে উঁকি মারতে থাকল। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে গোপাল সূর্য বিশুকে নিয়ে সবটা দেখাদেখি করে। আবার কেমন লজ্জা সংকোচ অথবা সেই যে থাকে না—ভালবাসার সুষমা, মুখের রঙ গাঢ় হয়ে যায়, ইচ্ছের কথা বলতেই পাবে না। কৌতূহল এমন যে ঠিক একদিন তাকে দেখে বাঁশি বাজাবে—অথবা পতাকা তুলে বলবে, রিনটি তোর ফুল ফুটে গেছে। আমরা চুরি চামারি করব না। সাধু সজ্জন হয়ে যাব। সুন্দর এক ফুলের বাগান তৈরি করব। তুই শুধু সেখানে হেঁটে বেড়াবি। আমরা বেড়ার আড়ালে বসে কেবল তোকে দেখব আর দেখব। সেই বাঁশি বাজল, তবে কে বাজাল, সে জানে না। তারপর মনে হল, ফুল ফুটেছে, এটা টের পেয়েছে সবার আগে উদাসবাবু। রিনটির চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, ওরে বিশু গোপাল সূর্য, তোরা একটু চালাক হলি না। কেবল খাই খাই স্বভাব। তোরা আগে বাঁশি বাজাতে পারলে আমাকে কে নিয়ে যায়, কার সাধ্য আছে নিয়ে যায়। আমি বেওয়ারিশ হয়ে গেলামরে।

—ওমা আবার কান্নার কি হল! পূর্ণিমা ধমক দিল মেয়েকে।

রিক্সা এবারে ষ্টেশনের মাঠে পড়েছে। পূর্ণিমা বলল, মানুষের পূর্বজন্মের ফল সব রিনটি। আমরা এই ফল নিয়ে এসেছি। ভগবানেরই এটা ইচ্ছে। কার কি হবে তিনিই লিখে দেন। সুখ যখন পাবি, মা আবাগীরে মনে রাখিস। মা আমার কে আছে! তুই না দেখলে বানের জলে ভেসে যাব।

রিনটি বুঝতে পারে না শরীরে তার কি করে এত সহসা দরদাম লেগে গেল। অমূল্য হয়ে গেল উদাসবাবুর কাছে, মার কাছে। মার কি কাতর কথাবার্তা সব। মেয়েমানুষ হলে এটা হয় সে জানত না! আর দশটা শরীরের মতো তারও একটা শরীর। রোগ ব্যামো সর্দি

কাসি, রক্তপাত সবই আছে। অথচ এই নিয়ে মার জুড়ি গাড়িতে বসার বাসনা। সে কোনো কথারই জবাব দিচ্ছে না। কারণ সে বিষয়টা ভাল করে বুঝে উঠতেও পারছে না! কেবল অপরিচিত জায়গা মানুষ-জনের কথা ভেবে সে শংকিত হলো! কেন জানি সে মাকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। যেন কলকাতা নামে একটা বড় শহরে তাকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছে তারা!

পুর্ণিমা ফের বলল, তোর এত ছোট নজর কেন মা!

রিন্‌টি বুঝতে পারে, মা এই সব কথা কাদের সম্পর্কে বলছে। তারা তিন মহৎ প্রাণ, সেই মানুষটা যে বই লেখে গাছের কাণ্ডে আর পুরোনো পাঁচিলে, সেই মহৎ প্রাণ শব্দ দুটি তাকে শুনিয়েছিল—এখন তার চোখে সেই তিন মহৎ প্রাণের ছবি বাদে আর কিছু ভাসছে না। ওরা রাতের অন্ধকারে গলিগুজিতে কোথাও চুপ-চাপ বসে আছে। ভয়ে সঙ্গে আসতে কিংবা রিকসার পেছনে দৌড়াতে সাহস পায়নি।

পুর্ণিমাকে কথা বলতেই হয়। শত হলেও সে মা। মেয়েটা ভেঙ্গে পড়লে প্রাণে সয়না। তাই যেন কেবল কথা বলে যাওয়া। সে বলল, নজর উঁচু রাখবি রিন্টি। নজর ঠিক না রাখলে পথ চিনে কেউ বেশীদূর যেতে পারে না। ঠিক বয়সে ঠিক নজর যার থাকে তার কোন দুঃখ থাকে না। তোর মা অভাগীরে দেখে শিখ। বাবুদের লাথি ঝাঁটায় প্রাণবায়ু হাকপাক করে। তোর মারও একখানা কম শরীর ছিল না। বুঝে চললে দেমাকে পা পড়ত না তোর মার। ঠিক বয়সে নজর কমতি হলে এই হয়। পস্তায়। পোস্তর দামে বিকোয় না।

রিন্‌টি সহসা চিৎকার করে উঠল, তুই থাম মা। বকবক থামা। আমি হল্লা জুড়ে দেব। তোদের জ্বালিয়ে দেব। পুড়িয়ে দেব। ভাতার খাকি, তুই আমারে বুদ্ধি দিস কেনরে!

পুর্ণিমা আর কথা বলতে সাহস পেল না।

ষ্টেশনে নেমে উদাসবাবু বলল, ট্রেনের লেট আছে। আয় রিন্‌টি চা খাই।

রিন্‌টি প্ল্যাটফরমে হেঁটে গেল। জবাব দিল না। একটা বেঞ্চিতে

বসে পড়ল। তারপর দু হাতের মধ্যে, মাথা গুঁজে দিল। আর কিছুক্ষণ পরেই শুনল, সেই পরিচিত শিস। কাছে কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে! সব মিছে, অলীক। স্বপ্ন! সে দু কান আরও শক্ত করে চেপে ধরল। না এবার খুব কাছে। প্ল্যাটফরমে যাত্রী অনেক। বাকস প্যাঁটরা, পটলের চালান, চা-অলা, পান-অলা, নীল বাতি, ঘুমটি গাড়ি বৌ ছেলে মেয়ে, কাচ্চা বাচ্চা, ডেলি প্যাসেঞ্জার সব মিলে একটা নরক গুলজার—তখনই কিনা হাঁক, একবারে ট্রেনের হুইসেলের মতো, অরে রিন্‌টি আমাদের সোনার আংটি। আংটি তুমি কার, যার হাতে আছি তার! এখন কার? এখন বৃক্ষের।

ওরা বুঝি বলল বটবৃক্ষের।

রিন্‌টি বলল, বিশ্বম্ভরবাবু নামে এক হেজেমজে যাওয়া বটবৃক্ষের নিচে বসে থাকব এখন। তোরা পারিস তো আমায় উদ্ধার করিস। তারপরই রিন্টি অবাক, কার সঙ্গে সে কথা বলছে! কেউতো নেই। ওদের কাউকে সে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছে না। সব মনের ভুল।

উদাসবাবু রিন্‌টিকে চা এনে দিল। দুটো বিস্কুট। এক ঠোঙা চিনেবাদাম। রিন্‌টি চিনেবাদাম বড় খেতে ভালবাসে। রিন্‌টি চা বিস্কুট খেল না। চিনেবাদাম ভেঙ্গে একটা দুটো মুখে দিল। পূর্ণিমার বুকে জল এল। উদাসবাবু ভাবল মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে দেখছি। এখানে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেই হয়েছে। ফলে উদাসবাবু ভয়ে ভয়ে আছে।

ট্রেনের নীলবাতি জ্বলে উঠল। ট্রেন আসছে। রিন্‌টি এই স্টেশনে কতবার এসেছে বিশু, সূর্য, গোপালের সঙ্গে। মা বাবুদের বাড়ির কাজে গেলে হাতে থাকত অফুরন্ত সময়। টো টো করে বেড়াত সারা শহরটা। সে এখানে কোথায় কোন বৃক্ষ আছে সব জানে। ওর মনে হল, কালীবাড়ির পথ ধরে ওরা ঠিক দৌড়াচ্ছে। সে চলে যাচ্ছে, আর তারা আসবে না হয় না। শেষ বেলায় সে তাদের ঠিক একবার দেখতে পাবে। সে বার বার ভিড়ের মধ্যে ওদের খুঁজছিল। ওরা তাকে ফুল দিয়েছে তাকে শেষবারের মতো দেখতেও আসবে।

॥ চার ॥

ওরা তুঁতে গাছের জঙ্গল থেকেই দেখতে পেল ট্রেনটা আসছে। সূর্য বলল, এই কি হল! আয়।

—পারছি না, বিশুটা বড় হাঁপাচ্ছিল।

—রিন্‌টি সত্যি তবে চলে যাচ্ছে! কেমন উদাস গলায় কথাটা বলল গোপাল।

সূর্য ছুটতে ছুটতে বলল, তোরা পড়ে থাক আমি যাচ্ছি।

কেমন নির্জন ফাঁকা একটা স্টেশন ফেলে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। একটা লোক তখনও দাঁত খুঁটছিল। ওদের তিনজনকে হাবাগোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, এই বেটা টিকিট?

আরে সেই লোকটা! হাতে নীল বাতি। এই লোকটা নীলবাতি না দেখালে ট্রেন ছাড়ে না। বিশুর কেন জানি ইচ্ছে হল লোকটার গলা কামড়ে ধরে। সেই লোকটা বলছে, টিকিট?

বিশু বলল, মন ভাল নেই দাদা। টিকিট চাইবে না।

নীলবাতিয়ালা হাতের কাছে জবরদস্ত শিকার পেয়ে বলল, পয়সা ছাড়। নাহলে বড়বাবুর কাছে নিয়ে যাব। কোথা থেকে এলি বল। না বললে জরিমানা হবে।

সূর্য বলল, জরিমানা! এই বিশু, বলেই ভু হাঁটু ফাঁক করে শিস। ছুট ছুট আবার।

আর তক্ষুণি লোকটা থাবা মেরে গোপালের কলার ধরে ফেলল, তারপর মরা শোল মাছের মত তুলে বলল, মারব আছাড়। তোর বাপের গাড়ি, এসেছিস পয়সা দিবি না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিশু বলল, এই শালা তোর বাপের গাড়ি! ছেড়ে দে বলছি। মারব এক ঢিল।

ইস্টিসনের আলো কেমন জাফরি রঙের। প্ল্যাটফরমের শেষ দিকটায় কেমন সব সরগোল বেঁধে গেছে। লম্বা ফাঁকা প্ল্যাটফরম,

নীচে বাবুদের লাল রঙের কোয়ার্টার। সবুজ আলো আর কত সব মায়াবী বৃক্ষের নীচে ঘাসের চত্বর। তাঁর ফাঁকে শোনা যায় কোন এক কিশোরী গলা সাধছে। সারে গামা পাধা নিশা। দু-একজন লোক মোট মাথায় নেমে যাচ্ছে। একটা বড় ঝুড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ হাঁস মুরগী। বিশু বলল, এই নীলবাতিয়ালা, আমরা টেরেনে আসিনি বাপ। ছেড়ে দাও গোপালকে। আমাদের রাগিয়ে দেবে না বলছি।

কে শোনে কার কথা, নীলবাতিয়ালাই বা শুনবে কেন। গরমেণ্টের লোক সে। ট্রেনের থেকে বামাল পাচার হয়ে যায় কত —সব ঠিকঠাক থাকে গরমেণ্টের লোকের সঙ্গে। বেঠিক তুমি, যদি ঠিকঠাক করে না নাও তবে কার দোষ। বড় অহংকারী তার গোঁফজোড়া। নীলবাতি নীচে রেখে সে দু-হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গোপালকে। গোপাল হাউমাউ করে বলছে, আমরা টেরেনে আসিনি। রিন্‌টিরে তুলে দিতে এয়েছি।

—কে রে তোর রিন্‌টি ?

—রিন্‌টিরে তুমি চেন না। রিন্‌টি কোলকাতা গেছে। তারে তুলে দিতে এয়েছি। সত্যি বলছি। মা কালীর দিব্যি।

কিন্তু বিশু আর সূর্য লাফ মেরে ও-পাশের প্লাটফরমে উঠে দুটো পাথর নিয়ে হাঁকছে—ছেড়ে দে বাপ। না ছাড়লে পাথর মারব।

নীলবাতিয়ালার রাগ বাড়ে। এত আস্পর্ধা। তার এলাকায় ঢুকে তাকেই মারবে বলে! গরমেণ্টের লোক বলে রক্তে এমনিতেই নীল রঙ ধরে থাকে। রোয়াবি বেড়ে যায়। ট্রেন এলে সেটা আর এক পলেস্তারা বৃদ্ধি পায়। টিকিট না দাও, পয়সা দাও। টাকাটা না হয়, সিকিটা! একান্ত না হলে ব্যাগ ধরে টানাটানি। শালাদের একটা ব্যাগও নেই যে ধরে টানাটানি করবে। আর কি করা! হাত ধরে টানাটানি শুরু হতেই গোটা তিনেক গ্যাংম্যান হাজির— ও পাঁড়ে ভাই করছটা কি।

আর কি করছি। চল ব্যাটা, হারামী, ঐ দেখ ও পাশে রোয়াব দেখাচ্ছে—দেখ না শালা হারামী আছে—বলে কিনা পাথর ফিকে ঘিলু বের করে দিবে। শালা চল, বড়বাবুর কাছে, রিন্‌টিরে তুলে দিতে আসা বের করে দিচ্ছি।

গোপাল অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে বসে পড়তেই পাঁড়ে ভাই চুল ধরে হ্যাঁচকা মারল।

ও-পাশ থেকে হাঁকছে, মারব, মারব, কিন্তু।

গোপাল চুল টানাটানিতে বড় কষ্ট পায়। কিন্তু এই হয়েছে জ্বালা, চোখে জল আসে না। মাথা গরম হয়ে যায়। তেরিয়া হয়ে বলে, কামড়ে দেব বলছি।

তিনজন গ্যাংমান আর পাঁড়ে ভাই।

একজন বলল, পয়সা থাকলে দিয়ে দেনা। টিকিট করবি না, পয়সাও দিবি না। সে কি করে হয়। মানুষের মর্যাদা বলতে কথা!

—ওতে খসবে না। বলে অন্যজন বলল, চ্যাংদোলা করে নেন। বলেন হাত লাগাই।

—লাগাও। দাঁড়িয়ে দেখতে কে বলেছে। রেগে গেলে দীর্ঘদিনের অভ্যাসও চিড় খায়। বাংলাটা ভাল বের হতে চায় না।—না নিয়ে গেলে বড়বাবু আমায় আস্ত রাখবে।

কথা ঠিক। বড়বাবু বলতে কথা। গ্যাংমানদেরও নিস্তার থাকবে না। কর্তব্যপরায়ণ না হলে সরকারী কাজে টিকে থাকা যায় না। কখন কে কি রিপোর্ট করবে! ওরা তিনজনই বড় বেশী দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠল। সরকারী পয়সা হজম করে দিলে ভগবান সইবে কেন। ওরা গোপালের পা হাত ধরে ফেলতেই সাঁ সাঁ। যারে কয় ইষ্টক বৃষ্টি। পাথর বৃষ্টি কয় তারে। গেলুমরে, মলুমরে, কান মাথা চেপে বসে পড়তেই গোপাল ছুট লাগাতে চাইল। তখন গরমেণ্টের নীলরক্ত আরও নীল। ছুটলেই ছাড় পাবে কে বলেছে! কলার চেপে তাল-পাতার সিপাই গোপালকে ঠিক টেনে রেখেছে। হল্লা শুনে লোকজন ছুটে আসতেই দেখল, কোথা থেকে ঝাঁক ঝাঁক পাথর বৃষ্টি।

—আমরাও যাব। চিৎকার করে কথাটা বলল বিশু। তারপর ছুটতে থাকল। সেই কীরিটেশ্বরী থেকে তারা ছুটতে শুরু করেছে। তেল কল, হোতার সাঁকো তারপর বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি পার হয়ে রেললাইন। বাঁয়ে কারবালার জঙ্গল, মর্গ এবং জেলা বোর্ড ফেলে ওরা এগিয়ে গেছে দ্রুত খরগোসের মতো। গুমটি ঘর পার হয়ে একবার পেছনের দিকে তাকিয়েছে। সিগনাল ডাউন হয়নি। দৌড় দৌড়। ওরা তুঁতে গাছের জঙ্গলে এসেও পেছনে তাকিয়েছে। না সিগনাল ডাউন হয়নি ওমা তারপরই কি হল, জঙ্গল পার হয়ে আসতেই দেখল ঝিক ঝিক করে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। ওরা আর একবার রিন্‌টির সঙ্গে কথা বলতে চায়। রিন্‌টি যেন ওদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে। বিশু টের পায়, এই শহর, হাসপাতাল, লালকুঠি, বনেদি সব বাড়িঘর আর মানুষের আবাস নেই। এক গভীর অরণ্য হয়ে গেছে। এমনই মনে হচ্ছিল হাঁপাতে হাঁপাতে। কোথা থেকে একটা শ্বাপদ ঢুকে একটা কচি হরিণের ঘাড় কামড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্লাটফরমে উঠে আসতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। ওরা দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন সোরগোল, কেউ বলছে হামলা হচ্ছে। কেউ বলছে ডাকাত পড়েছে প্লাটফরমে। রেল সিপাই ছুটে এসে আয়ত্তে আনতেই দেখা গেল, গোপালকে পাঁড়ে ভাই জাপটে ধরে রেখেছে। এত হামলাতেও সে বামাল হাতছাড়া করেনি।

বড়বাবু কালো কোট গায়ে নীল বাতি হাতে হেঁটে যাচ্ছেন। পাঁচ সাতজন গ্যাংম্যান একজন সিপাই গোপালকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখন আপাতত পুলিশে খবর। থানায় চালান দেওয়া, লোক দিয়ে কোয়ার্টারে খবর পাঠানো—কত কাজ বড়বাবুর। কি যে দুষ্কর্ম সব হচ্ছে! ভিতরে ঢুকে বললেন, কার কার লেগেছে দেখি। দু একজন মাথা পেতে দিতেই দেখল রক্তপাত হচ্ছে! সেটা ইষ্টক বৃষ্টিতে না টানাটানিতে বোঝা গেল না। আপাততঃ গোপাল এক নম্বর আসামী। ছেঁড়া জামা গায়। পা খালি। চুল উসকো

খুসকো। নাবালকের কি বিচার হয় বড়বাবু ভালই জানেন। নাবালক না বিচ্ছু।

বড়বাবু বসে খাতায় কি লিখলেন। দুটো ফোন এয়েছে। তার জবাব। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বহরমপুর-লালগোলা ডাউন—যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে বড় রকমের হামলা হয়ে গেল। টিকিট চেক করতে গিয়ে হামলা।

—কার কাণ্ড!

—এক দল দুষ্কৃতকারী। একটাকে পাকড়াও করা গেছে।

—ধরে রাখুন।

তারপরই ফোন ছেড়ে কথা শুরু হল গোপালের সঙ্গে, তোর নাম?

—সে তার নাম বলল।

—দলে ক'জন তোরা?

—তিন জন।

—আর দুজনের কি নাম?

—জানি না।

—কোথায় ওরা?

—জানি না!

কান টানাটানিতে ছিঁড়ে গেছে কিছুটা। গাল বেয়ে গোপালের রক্ত গড়াচ্ছে। নীলবাতির আলোতে ওটা দেখেই ভড়কে গেল বড়বাবু। গোপালের মাথা গরম বলে টের পাচ্ছে না।

গোপাল ভাবছিল, শালা সব মানুষ ধানদাবাজ হয়ে গেল। পানিপাড়ে থেকে বড়বাবু। কি দেশরে মাইরি! এলাম রিনতিকে শেষবারের মত দেখব বলে, শালা বলে কিনা পয়সা। গরমেণ্ট শালা মাইরি কিযে বিটকেল।

গোপালের থানা পুলিসের ভয় এমনিতে কম। কাগে পেলে ঠোকরায় বগে পেলেও। সে বোঝে, যেখানেই নিয়ে যাক, শুতে পাবে, একবেলা যাহোক খেতে পাবে। কিন্তু বড় কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে তার। সূর্য বিশুটা না আবার ধরা পড়ে যায়। ওরা এই চত্বরটাতেই

ঘুর ঘুর করবে। এবং বেশি রাতে জানালায় উঁকিও মারতে পারে। সে ঠিক করল কিছুতেই বলবে না। ব্যাটনের গুঁতো বড় লাগে পেটে।

বড়বাবু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ফের যেন বলল, আর বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়বি না।

গোপাল তেড়িয়া হয়ে উঠল, টেরেনে চড়িনি। কেন যে মিছি মিছি বাকতাল্লা হচ্ছে বুঝি না।

বেটার দুর্জয় সাহস। বড়বাবু কেস লিখতে গিয়েও দমে গেল। কোন্‌দিন কোথায় একা পেয়ে না আবার তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেয়। এরা সব পারে। পুলিশও তেমনি ত্যাঁদড়। দু পাঁচ পয়সা হাতে এলেই ছেড়ে দেবে। ধর্মের কাজ করবে তারা। খুব বেশি আদালত। দু-পাঁচ টাকা জরিমানা। না দিতে পারলে জেল হাজত ক'দিনের। তারপরই মুক্ত। কে কাকে বেঁধে রাখে। দেশের আইনও হয়েছে তেমনি। চোর বাটপাড় গুণ্ডাদের সায়েস্তা করার যদি সত্যি কোন আইন থাকে। আর ওদের দোষ কি, জেল হাজতে যদি পড়ে পড়ে সারাজীবন মার না খেল, তবে দেশটার শান্তি আসে কি করে। এ-দেশে কিছু হবার নয়। যাক শালা, সব জাহান্নামে যাক। সে পানিপাঁড়েকে না পেয়ে রঘুপতিকে এক হাত নিল। বলল, আরে রঘুপতি, লোভ, মোহ, ত্যাগ করতে শিখ। কাকে ধরলে পয়সা হয় জানিস না! যাকে তাকে কলার চেপে ধরলেই হল! দেখবিতো পকেট গড়ের মাঠ কি না! বোধবুদ্ধি এত কম থাকলে গরমেণ্ট ফেল মারবে না। তোমাদের মতো লোক পুষে ঘণ্টা হবে। যা, ছেড়ে দিয়ে আয়। প্রাণের আশংকাতে ছেড়ে দিচ্ছে ওটা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে দেওয়া হবে না। মানুষের ধর্ম বলে কথা। সে গোপালকে বলল, এক দৌড়ে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবি। এ-মুখো আবার কোনদিন হবিতো জেল হাজতে পুরে দেব।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বোধহয় ঝড়-হবে। সূর্য সরকারি রেশম খামারে বসে আছে। বিশু গেছে গোপালের খবর

আনতে। বাবুরা কোথায় না আবার তাকে নিয়ে যায়। যদি রেখে দেয় বেঁধে, তবে সারারাত দুজনকে এই তুঁতে গাছের জঙ্গলে কাটিয়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। যা মারদাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিল—এখন মনে হচ্ছে সূর্য এতটা না করলেই পারত। বড়বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেই হত। বড়বাবুর বাগানে না হয় বলত, একদিন তিনজনে মিলে আগাছা বেছে দেবে। না হয়, লাউ কুমড়ো লাগিয়ে দেবে। সব্জির আকাল দেশে। পয়সা না পাকুক তারা বড়বাবুর এ-কাজটা করে দিতে পারত।

এখন আর ভেবে লাভ নেই। বিশু কি খবর নিয়ে আসে দেখা যাক। খাওয়া হয়নি! ডেরায় ফিরে যাবার পথে বাবলা বন পড়ে! সেখানে একটা গাছের গুঁড়িতে অসময়ের জন্য টাকাটা সিকিটা রেখে দেয়। অসময়ে বড় কাজে লাগে। এ-ছাড়া সূর্যর কেমন মনটা রিন্টির জন্য কাতর হচ্ছে। শেষবার ওকে দেখবে বলে, ইস্টিশনে এসেছিল। এসে এই বিপত্তি। মাথা গরম হয়ে গেল। রিন্টি কত বলেছে, দেখ তোরা মাথা গরম করে জীবনটা নষ্ট করিস না। বার বার বলা সত্ত্বেও কেন যে তারা এটা মনে রাখতে পারে না। ভালয় ভালয় যদি বিশু ফিরে আসে, আর বাবুরা যদি গোপালকে ছেড়ে দেয়—তবে সে ঠিক করল মাথা আর গরম করবে না। তাদের এখন কত কাজ! রিন্টি বলেছে, তোরা ভাল হয়ে যা। আসলে রিন্টি বোধহয় রাগ করে চলে গেল। খাই খাই ভাবটা তাদের রিন্তির পছন্দ ছিল না। চুরি চামারি করাটাকে রিন্তি এক সময় খুব উৎসাহ দিত। এদিকটায় রিন্তি যত বড় হয়ে গেল, তত কেন জানি বলত, তোরা ভাল হয়ে যা। তোরা গাছ লাগা। তোরা ফুল ফল বিক্রি করতে পারিস। মানুষ ইচ্ছে করলে কি না পারে।

সূর্য ঘাসের ওপর শুয়ে এ-সব ভাবছিল। রিন্তির কথা রাখতে হবে। বিশু গোপাল এলে বলবে, না আর ফল পাকুড় চুরি নয়। আমরা ফুল ফল বিক্রি করব। রিন্তি তাহলে আবার ফিরে আসতে পারে। রিন্তির রাগ পড়ে গেলে ফিরে আসবে। উদাসবাবু কেন

যে এত দূরে রিনতিকে বিয়ে দিতে নিয়ে গেল! কত সুন্দর সুন্দর বর শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক জনেরও কি পছন্দ হত না রিনতিকে। তাহলে সে থাকত এখানটায়। পৃথিবীটা তবে কত ভরে থাকত এখানটায়। পৃথিবীটা তবে কত ভরে থাকত তাদের কাছে। শহরটা কি যে অর্থহীন তাদের কাছে—কেউ বুঝবে না।

তখনই মনে হল প্ল্যাট ফরমের গা ঘেসে কে দু'জন আসছে। সে এখানটায় পালিয়ে আছে ধরা পড়ার ভয়ে। চিৎকার করে বলতেও পারছে না, বিশু নাকি রে! কারণ গ্যাংম্যান-ট্যান হলে ভয়। গোপালকে ধরে নিয়ে গেছে, তাকেও নিয়ে যেতে পারে! পানিপাঁড়ে লোকটা কি হারামী। পয়সা চায়! সবাই যদি এ-ভাবে পয়সা রোজগার করে তবে মানুষ পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বাঁচে কি করে। দিন যত যাচ্ছে, সূর্যর ধারণা সব কেমন গোলমাল ঠেকছে। সে ভাবত গরীবরা ভাল মানুষ হয়। ধার্মিক হয়। চুরি চামারি করে না। যত বড় হচ্ছে, বুঝতে পারছে সব মানুষই যেন ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। কারো সবল ঘোড়া, কারো দুর্বল ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা। এখনতো যার যত টাকা, তার তত দিগ্বিজয়। এটা সার ভেবে উদাসবাবু রিনতিকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। রিনতির জন্য বুকটা খাঁ খাঁ করছিল। সুখে-দুঃখে সম্বল ছিল মেয়েটা। তার মনে হল, আর একবার মাথা গরম করার দরকার হবে। উদাসবাবুর ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতে না পারলে মাথার ঘিলুতে পোকা বাসা বাঁধবে। আর তখনই সেই ছায়া দুটো বিদ্যুতের আলোতে ঝলসে উঠল। গোপাল বিশু আসছে। গোপালকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। খুব ঠেঙ্গিয়েছে বোধহয়। ঠ্যাঙ্গানি মার, এ-ভাবে কতবার যে খেয়েছে! কিন্তু তখন রিনতি সম্বল ছিল বলে, খুব মাথা একটা গরম করতে পারেনি। রিনতি নেই—তাদের গার্জিয়ানও নেই। তারা এবারে একবারে স্বাধীন। সূর্য দৌড়ে উঠে গেল। ডাকল, বিশু গোপাল।

বিশু শিস দিল।

সূর্য, গোপাল, বিশু পাশাপাশি হাঁটছে।—কোথায় লাগল রে? সূর্য গোপালের গা ঘেঁসে দেখতে থাকল।

—কানের লতি ছিঁড়ে ফেলেছে। বিশু খোয়া তুলে ঢিল ছুঁড়ল একটা।

—কে করল!

—পানি পাঁড়ে বড়বাবু সবাই।

সূর্য এক উদাসবাবু ছাড়া মাথা গরম করবে না যে ভেবেছিল তা আর মনে থাকল না। সে একটা খিস্তি ঝাড়ল।

অন্ধকারে জোনাকি পোকা উড়ছে। কড় কড় করে মেঘ হামলে উঠছে আকাশে। গোপালের কানের লতি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিশু, সূর্যর তিরিক্ষি মেজাজ ধরতে পেরেই বলল, এখন আর গণ্ডগোল করার সময় নয়।

অন্ধকারে কোন গাছ পাতা ঠিক চেনা যায় না। কি গাছ চেনা যায় না। ভেরেণ্ডার গাছ খুব তাদের দরকার। ক্ষতস্থানে কস লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে। কাটা জায়গাটাও জোড়া লেগে যাবে।

সূর্য বলল, গুমটি ঘরের দিকে চল। দেখছি কি আছে!

বৃষ্টি আসছিল। ঝড় উঠেছে। ওদের তিন বেওয়ারিশ বাচ্চা, না বলে, বয়সী মানুষই যেন ভাবা যায়—কারণ তারা যে ভাবে ক্ষতস্থান নিরাময় করে তোলার কথা ভাবছে, তাতে আর অবুঝ বালক বলা যায় না।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। ওরা রেল-লাইন ধরে অন্ধকারে ছোটার চেষ্টা করছে। এত অভ্যস্ত এইসব বিষয়ে যে মনেই হয় না অন্ধকারে ওরা দৌড়াচ্ছে। গোপাল ঠিক দৌড়াতে পারছিল না। পায়ে লাগতে পারে। ওর জন্য তাদের দেরি করতে হচ্ছে। অন্ধকারে সূর্য দৌড়াচ্ছিল, বিশু গোপালকে ধরে নিয়ে আসছে—কিন্তু এখন ঝড় বৃষ্টি আসায় সেই গোপাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিশু বলল, থাক! আগে যাই।

সেই নির্জন গুমটি ঘরের পাশেই গাছটা পেয়ে গেল। এখানে কোন গুমটি ম্যান থাকে না। আগে একটা সদর রাস্তা ছিল লাইনের ওপর দিয়ে। সেটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গুমটি ঘর আর রেলের কাজে লাগে না। গোপাল বিশু সূর্যএকবার ঝড়ে ওদের ডেরা উড়ে গেলে, এখানটায় ক'দিন থেকে গেছিল। একটা সজনে গাছ পুতেছিল। ঝোপ জঙ্গল সাফ করে তুটো নীমগাছও লাগিয়েছিল। কিন্তু গুমটি ঘরটা রিন্তিদের বাড়ি থেকে খুব বেশী দূর হওয়ায় রিন্তির সঙ্গে আর দেখা করা যেত না। ওরা ফের নদীর চরে চলে গেল। পরিত্যক্ত গুমটি ঘরটা পড়ে থাকল একদিন—ওরা গঙ্গার চড়ায় ডেরা তুলে ফেলল। রিন্তিকে এক বেলা না দেখলে মন কেমন পোড়ে।

পরিত্যক্ত গুমটি ঘরটায় ওরা প্রথমে ঢুকতে সাহস পেল না। কারণ এ-সব অঞ্চলে গোখরো ঢেমনা চিতির উৎপাত। আর ওরা বিচরণশীল জীব বলে জানে, পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতেই এদের আবাস। ওরা প্রথমে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশে আলোর ঝলকানির জন্য অপেক্ষা করল। আলোর ঝলকানিতে কিছুটা দেখা গেল, কিছুটা গেল না। তুটো জোনাকি পোকা ওড়াউড়ি করছে। বিশু খপ করে একটা জোনাকি পোকা ধরে ফেলল। এবং সেই জোনাকি পোকার আলো ধরে ধরে ভেতরটা দেখা হয়ে গেল। রাত্রি বাসের পক্ষে মোক্ষম জায়গা। এখান থেকেই ভাবল, ইস্টিশনে উৎপাতটা ঠিক চালানো যাবে। বিশু বলল, রিন্তি মাথা গরম করতে বারণ করে গেছে।

· সূর্য বলল, তাই। তারপর কোন কথা না বলে বাইরে বের হয়ে গেল। অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ভেরাণ্ডা গাছের ডাল . ভেঙ্গে ফেলল মট মট করে। দৌড়ে তুটো ডাল নিয়ে এসে হাতের তালুতে ফোঁটা ফোঁটা কস ফেলল। অন্য জোনাকি পোকাটা ছাদের কার্নিসের কাছে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। বিশু বলল, দেখিস ওটা যেন না পালায়। সে নিজেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওটা যাতে না পালায় দেখতে থাকল। হাতের তালুতে কস জমে গেলে সূর্য গোপালকে শুইয়ে দিল একপাশ করে। কানের লতি যেখানটায়

ছিঁড়ে গেছে সেখানে কয়েক ফোটা কস লাগিয়ে সূর্য বাইরে এসে বৃষ্টির জলে হাত ধুয়ে নিল। দূরে বন জঙ্গল পার হয়ে সাহেবদের কবরখানা। সেখানে বিরাট সব ঝাউ গাছের বন। সেই সব গাছপালার ফাঁকে আকাশের নক্ষত্রের মতো সব শহরের আলো রাস্তা ঘাট দিনের বেলার মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। বিশু বলল, শালা।

এই আক্রোশ অবদমনে ওরা বার বার চেষ্টা করেছে। মাথা গরম করবে না ভেবেছে। রিন্টির কাছে কথা দেওয়া আছে—আসলে ওদের মনে হয় এই যে রিন্টি তাদের ছেড়ে চলে গেল সেটা ওদের স্বভাব দোষের জন্য। ভাল হয়ে গেলে রিন্টি আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু কি হয়, কানের লতি থেকে রক্ত পড়া দেখে ওদের মাথা ঠিক থাকে না। গরমেণ্টকে উল্টে দিতে ইচ্ছে হয়। গরমেণ্ট বলতে বোঝে, ইস্টিশনের পানি পাঁড়ে, বড়বাবু, উদাসবাবু। দারোগাবাবু। এই হলগে গরমেণ্ট যখন, তখন এদের উপড়ে না ফেললে, নিশ্চিন্তে তারা এই গুমটি ঘরটায়ও থাকতে পারবে না। সাপখোপ, কীট পতঙ্গের ভয়ের চেয়েও এটা তাদের কাছে বড় ভয়।

বিশু জোনাকি পোকাটা হাতে নিয়ে উপুড় হয়ে দেখছে! একটা মৃত জোনাকী হাতে। এই আলোতেই দেখল, ঘরটায়, কিছু ভাঙ্গা ইঁটের ডাই। ছেঁড়া মাদুর, কাঁথা, বালিশ, একটা ভাঙ্গা কলাই করা থালা। একটা পোড়া মোমবাতি। কিছু চায়ের ভাঁঙ্গা ভাঁড় সযত্নে রাখা। দেশলাই বাক্স, ছেঁড়া তেনাকানি আর পোড়া সিগারেট ডাই করা। কোন অদৃশ্য মানুষের বাস এখানটায় ছিল। তারা কোথাও জায়গা পেয়ে চলে গেছে বোধহয়।

বিশু বলল, কিরে জ্বালা করছে?

গোপাল উঠে বসেছে। সে আর জ্বালা বোধ করছে না। এতক্ষণ কানটা ধরেছিল, জ্বালা কমে যেতেই আগের গোপাল হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, না। পানিপাঁড়েটার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, তবে আমার নাম গোপাল।

সূর্য বলল, রিন্টি যে বলে গেল মাথা গরম না করতে।

—ধুস। রিন্টি আমাদের কথা ভাবেই না।

—খুব ভাবে। সূর্য ধমক লাগাল।

—ভাবলে যায়!

—উদাসবাবু আছে না!

উদাসবাবু কে? আমরা রিনটির কেউ না রিন্‌টির জন্য কি না করেছি!

তা ঠিক। সূর্য ভাবল, রিন্‌টির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সব রকমের দুঃসাহসিক কাজ করেছে। বাবুদের আম বাগান, জাম, বাগান, পেয়ারা বাগান থেকে অসময়ে তারা রিন্টিকে ফল পাকুড় এনে দিয়েছে। রিন্টির মা-টা, বড় কিপ্টে। উদাসবাবু সব খেয়ে নেয়। রিন্টির মার মন উদাসবাবুর কাছে পড়ে থাকে। মেয়েটাকে ভালবাসত না। এখন রিন্টি বড় হতেই কি আদর উদাসবাবুর। ভাল বর দেখে বিয়ে দিতে নিয়ে গেল। তারা জঞ্জাল, আস্তাকুড়! রিন্টিকে কলকাতায় নিয়ে গেল আস্তাকুড় থেকে তুলে।

বিশু বলল, রিন্টি মাইরি কি সুন্দর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। পরীর মত!

—ওতো আমাদের পরী। সূর্য বলল,—দেখিস আমরা গাছপালা লাগিয়ে একটা ফলের বাগান করলে ঠিক রিন্টি চলে আসবে! ফুলের বাগান করলে রিনটিকে কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসব। সারাদিন আমরা খাটাখাটনি করব। সন্ধ্যায় ফিরে দেখব রিন্টি ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি মজাটাই না হবে।

—তার আগে দুটো কাজ। গোপাল উঠে দাঁড়াল।

—কি কাজ?

—পানিপাঁড়ের ঠ্যাং খোঁড়া করা, বড়বাবুকে ভূতের ভয় দেখিয়ে কাবু করা। দারোগাবাবুর নাগাল পাব না। হারামী সিপাই টের পেয়ে যায়। ধরে ফেলে।

—কিন্তু রিন্টি যে বলে গেল মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে নাকি ভাল হওয়া যায় না। বড় হওয়া যায় না।

—ও দুটো কাজ হয়ে গেলেই আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলব। ভাল হয়ে যাব।

সূর্য, বিশু গজ গজ করছে। কানের লতিটা ছিঁড়ে দিল—এমনি এমনি! কি অমানুষ রে বাবা! দু দশ পয়সার জন্যে মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে। ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে ঠিক—দুটো একটার মাথায়ও লেগেছে—কিন্তু পানিপাঁড়েটা অক্ষত থেকে গেল। এটা সত্যি ঠিক কাজ হয়নি। কাজ পুরোপুরি না হলে মনে কেমন ধনদ লেগে থাকে। তাদের হয়ে বিচার কে আর করে। তারা এ-জন্য ভেবে নিয়েছে নিজের বিচার নিজেরাই করা ঠিক। ভাল হলে ভাল, মন্দ হলে নিজেদের গাল দেবার স্বভাব তাদের।

সুতরাং ঠিক হয়ে গেল এই দুটো কাজের পর তারা রিন্টির কথা মত সাধু পুরুষ সেজে যাবে। চুরি চামারি করবে না। বাস-স্ট্যাণ্ডে মোট বইবে। অনাবাদি জমিতে সজনে গাছ লাগিয়ে দেবে। ভরাট জমিতে রজনীগন্ধার শেকড় পুতে দেবে। যেখানে যত ঝোপ জঙ্গল দেখবে, আগাছা দেখবে, সেখানেই লেগে যাবে তারা—তাদের মনে হয় করতে পারলে ধুনতুমার কাণ্ড বেঁধে যাবে। তারপর, একখণ্ড জমি, একটা ঘর, একটা পাতকুয়ো, গরু ছাগল দুধ দুয়ে ক্ষীর করবে। সন্দেশ বানাবে। বাজার করে আনবে আনাজপাতি। রিন্টি সেদিনে ঠিক ফিরে আসবে। রিন্টির কিছুতেই কলকাতায় মন টিকবে না। এমন একটা সুন্দর বনজঙ্গল মাঠ, শহর, কালিবাড়ি, বাবলা বনের জন্য রিন্টির মন পুড়বেই। ঠিক একদিন সে এসে বলবে, চলে এলামরে। তোদের ছেড়ে কলকাতায় মন টেকে?

গোপাল বলল, কালই আমার কানটা জোড়া লেগে যাবে নারে?

বিশু বলল, মনে তো হয়।

সূর্য বলল, ওষুধ না ধন্বন্তরি।

বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে, বেওয়ারিশ বাচ্চারা বেঁচে থাকার তড়িকা এ-ভাবেই বোধহয় পেয়ে যায়। সেই মানুষটা, যে গাছে পাঁচিলে একটা বই লিখে যাচ্ছে, সেই বলে গেছিল, গাছপালা মানুষের

বড় দরকারে লাগে। সেই বলে গেছিল, চিরঞ্জীব মহৌষধ এই গাছপালা। কোন গাছ কোন ব্যামোতে অমোঘ কাজ দেয় তাও বলে গেছিল।

সকালবেলায় ওরা দুটো জিনিস দেখল, এক নম্বর গোপালের কানের লতি জোড়া লেগে গেছে। দুই ভাঙ্গা ইঁটের ডাই থেকে এক অতিকায় গোখরো ধীরে ধীরে বের হয়ে আপন মনে চলে যাচ্ছে। ওরা ভয়ে চোখ গোল গোল করে দেখছিল। প্রকৃতির জীব মারতে নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে তেনাদেরও মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

ওরা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বাজপড়া মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে। হাত পা নাড়ছে না। নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে। ওরা যেন আর দশটা গাছপালার মতো। যেন কিছুতেই টের না পায় ওরা মনুষ্য জাতির অপোগণ্ড। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল! অবশ্য গতিবিধি বলা যায় না, কারণ চোখ বুজে আছে ওরা। চোখদুটো সবার পিট পিট করছে! ভাল করে দেখলেই যেন কলজের রক্ত সব শুকিয়ে যাবে। তেনার শরীর বেশ এঁকে বেঁকে মাথা নিচু করে এগোচ্ছে। দরজার দিকে মুখ। কি দেখল ফের মাথা উঁচু করে।

ওরা ভেতরের দিকের দেয়ালের তিনটে আঁকা মনুষ্য মূর্তি। আর কোন অস্তিত্ব আছে এ-মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। যেন তেনার বুদ্ধিতে ঠিক কুলাচ্ছে না—কি করবেন। একবার যাবার আগে ফঁস করে যাবেন কিনা কে জানে। ফঁস করে উঠলেই যা একখান জীব, মাথার উপরে ফনা দুলতে থাকবে। তেনার কি ইচ্ছে বলার, আমার এলাকাতে তোরা কেন বাপু। এটা ভাল কথা না। তারপর যেন গতি আরও বাড়িয়ে দিল। রাজার মতো নিজের সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়াবার জন্য বের হয়ে গেল।

দরজার সামনেই ঝোপ জঙ্গল, ঘাস পাতা—কারণ রেল-লাইন থেকে বোঝাই যায় না, এখানে একদা একটা গুমটি ঘর ছিল। গুমটিম্যান কালাচাঁদের একটা কাকাতুয়া ছিল। একটা একতারা ছিল। সব কবে হেজে মজে গেছে। নতুন ঘাস পাতা জঙ্গলে সেই

গুমটিঘর পরিত্যক্ত আবাস। সেখানে একটা অতিকায় তেনার বাস থাকবে আর বিচিত্র কি! তেনার নির্গমন হতেই ওরা একবাক্যে প্রথম সাধুবাক্যটি উচ্চারণ করল, বাবারে! কি পেল্লাই একখান দেহ! তারপর ভয়ে ভয়ে সেই ইঁটের ডাইটা দেখল, কে জানে জোড়ায় যদি থাকে। সারারাত ওরা গোখরোটাকে মাথায় নিয়ে শুয়েছিল। হিস হিস শব্দ শুনেছে ঠিক—তবে সারারাত ঝম ঝম বৃষ্টি পড়লে, তার শব্দে হিস হিস শব্দ কেমন মিলে যায়। ওরা গ্রাহ্য করেনি। সারা রাত ইঁটের ডাইর ভেতর গোল হয়ে পড়েছিল, আর বোধহয় মাঝে মাঝে মাথাটা বের করে জিভ দিয়ে ওদের চুল চেটে দেখেছে। ভাবতে গিয়েই আরও হিম হয়ে গেল তারা। কি করবে ভেবে পেল না। অথচ এমন একটা আস্তানার দখল পেয়ে ছাড়তেও মন কেমন করছে। এখন কাজ সব ইঁট ভেতর থেকে সরানো। ওরা খুব আলগাভাবে প্রথমে একটা দুটো ইঁট তুলে নিল। কি জানি ফস করে যদি আবার একখানা কালনাগ মাথা তুলে ধরে। এক দুই করে তুলে নিয়ে বাইরে রেখে আসছে। কবেকার ইঁট, কতকালের পুরানো, শ্যাওলা ধরা। আর দেয়ালের চুন বালি খসে সব পাঁজর বের করা ইঁট হাঁ করে আছে। রাতের বেলায় এই আবাসের এত জীর্ণ দশা টের পায়নি। পোড়া সিগারেট, তার বাক্স, দেশলাই এবং চায়ের ভাঁড় সব বের করল সূর্য বিশু। ইঁটগুলো বের করার সময় সতর্ক থাকল। কিন্তু কটা ইঁট তুলে নিতেই বুঝল, তেনারা আর কেউ নেই। সাফ সোফ করে বিশু দুটো দেবদারুর ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এল। ওটাই এখন ঝাঁটা ঝাড়ন সব। গোপাল কিছু করছে না। ওতো এখন ব্যামারী নাচারী মানুষ। তাকে বরং সব ঠিক ঠাক করে ছেঁড়া মাদুর কাঁথা বালিস পেতে দিলে ভাল হয়। আসলে এ-সব হয় তো কালাচাঁদেরই ছিল। কিন্তু পরে সংশয়, এত চায়ের ভাঁড় আসে কোত্থেকে। রাতে বিরেতে এখানে কেউ এসে ময়ফেল করে নাতো! মানুষের তো কতরকমের স্বভাব। খল স্বভাবের লোক যদি এখানটায় গোপনে নিশিথে জড় হয়। চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই

এই শহরটায় আর তার চারপাশে লেগেই থাকে। ওদের কেউ আবার এমন গোপন আস্তানায় খবর পেয়ে যায়নি তো!

গোপালই বলল, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না বিশু?

—কেন কি হল তোর আবার!

—চায়ের ভাঁড়! কে খায়?

—কেউ খায়।

—সাপটা এখানে কেন?

—বন বাদাড়ে সাপ থাকবে না!

—কোন গুপ্তধন কেউ রেখে যায়নি তো। গুপ্তধন থাকলে তেনারা থাকে।

গুপ্তধনের কথায় সূর্য কেমন লাফিয়ে উঠল। কালাচাঁদ শুনেছি একা থাকত। গুমটিঘরে একা থাকলে কত সাঙ্গ পাঙ্গ আসে। নেশাভাঙ করার লোকের অভাব হয় না। সাধুসন্ন্যাসিরাও আসতে পারে। বাউল ভিখিরী সব। কার পেটে কি আছে কে জানে। বড় দুষমনি কেউ যে করেনি কে বলবে! অনেক টাকা, অনেক গয়না যদি কেউ কালাচাঁদের কাছে গোপনে রেখে যায়। আর কালাচাঁদটা যদি মেঝেয় খুঁড়ে রেখে দেয়! দিতেই পারে।

সূর্য কেমন যুস পেয়ে গেল বলতে বলতে। কান পেতে শুনল মেঝের ভেতরে, টাকার ঘড়া নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে কিনা। যদি পেয়ে যেত, কি মজাই না হত! কালই চলে গিয়ে রিন্টিকে নিয়ে আসতাম বলতে বলতে সূর্যর মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দুধ গোখরোটার লেজটা দেখা যাচ্ছে। নিচে রেলের ডোবা নালা, তার পরে জমিন, আগাছায় ভর্তি। মনীন্দ্র কাঁটার বন জঙ্গল। সেখানে ঢোকে কার সাধ্যি। ঐ দিকটায় দুধ গুখরোটা চলে গেল। ওরা উঁচু হয়ে দেখতে থাকল, কতদূর যায়। উঁচু হয়ে দেখলে অনেকটা দেখা যায়। গাছগুলোর নিচে পাতা ঘাস পচে সাফ হয়ে আছে। ও-পাশেই বোধহয় কোন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। কে জানে কি আছে!

॥ ছয় ॥

এ-জায়গাটাই ভাল। রেললাইনের এদিকটায় নিচু জমি, তারপর সরকারী রেশমের চাষ। নতুন নতুন সব অট্টালিকা ভেতরে। বাঁধানো রাস্তা। বর্ষাকাল এসে যাচ্ছে বলে ঘাস পাতা সবুজ। উবু হয়ে বসে থাকলে কেউ টের পাবে না। বিশু কাজটা দিয়ে ভালই করেছে। দু-পকেটে ভর্তি কচি পুঁইডগা। খিদা নিবারণের জন্য কাজে লাগে। পেটে যখন জ্বালা বোধহয়, কচকচ করে কচি পুঁইডগা খেতে বেশ মজা। ভগবান গরীব মানুষের জন্য কোন অভাব রাখেনি। সুস্বাদু বড়। যারা খায়, তারাই বোঝে কি মজা এই বেঁচে থাকায়। এখান থেকে পানীপাঁড়ের লম্বা কোয়ার্টার দেখা যায়। সিগনেলিং পোষ্টের গায়ে লোহার বেড়া। বেড়া টপকালেই নালা। নালা পার হলে পানিপাঁড়ের ইঁটের লাল ঘর। সামনে দরজা। দরজায় এক বালিকা, রিন্টির বয়সী নয়, একটু কম বয়সের। ফ্রক গায়। পানী-পাঁড়েকে বাবা বাবা করছিল। কাঁখে কোলে পায়ে গণ্ডাখানেক কাচ্চা বাচ্চা। ট্যাঁও ট্যাঁও করছে। বালিকাটির নাম ধরে কেউ ডাকছে। খুনতি খুনতি করছে। সে বুঝতে পারল পানিপাঁড়ের মেয়েটার নাম খুনতি। খুনতি দরজায় দাঁড়িয়ে আকাশে কার ঘুড়ি ওড়া দেখছিল। ঐ এক দূর জগত—যা গোপাল নিজেও বোঝে না কত দূরে গিয়ে মিলেছে—কেবল কি যেন এক আকর্ষণ থাকে দূরের। সব মানুষেরই বুঝি এটা থাকে। মেয়েটা দূরের আকাশে কোন এক অদৃশ্য মানুষের ঘুড়ি ওড়া দেখছিল। কিছুতেই কারো ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না।

একা থাকলে গোপালের নানা রকম স্বরে গান গাইবার ইচ্ছে জাগে। তা-ছাড়া আজ ভাত হবে। বিশু ভাত খাবে মনে করলে কেউ তাকে আটকাতে পারে না। রুজি-রোজগার এক-ভাবে না একভাবে হয়ে যায়। আজ একটা লম্ফও কেনা হবে। ডেরা থেকে

বাঘাকে নিয়ে আসা দরকার। ওটাতো জানে না, রিন্টি চলে যাবার সময় তাদের একটা বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। তার কান ছিঁড়ে দিয়েছে পানিপাঁড়ে। সে কানটা ছুঁয়ে দেখল, ব্যাথা বেদনা রাতেই ছিল না, এখন হাত দিলেও তেমন লাগছে না। জগতের কি যে বাহার! কিছুই থেমে নেই। চলেছে। সে উঠে দাঁড়াল। তার এ-ভাব উবু হয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। কে এক গোপাল, কার দায় পড়েছে চিনে রাখার। আসলে সংশয় মনে—ধরে ফেললে পানিপাঁড়ের এলাকায় ঢুকে গেছে বলে না আবার প্যাঁদায়। সে বুঝল, রাত আর দিনের ফারাক বড় বেশি লোকজন কোথা থেকে সব আসছে সকালের গাড়ি ধরবে বলে। পানিপাঁড়ে রঘুপতি সিগনেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাজ কোন বাঁধা ধরা নয়। বড়বাবুর হুকুম মতো সে চলে। কি কাজ কখন দেবে কে জানে। সে স্টেশন চত্বর ছেড়ে নামছেই না। বিশুটা উজবুক। স্টেশনের বাইরে ঐ এক কাজে বের হওয়া মানুষের সব গেলেও হাগা মোতা থাকে। সেটা করতে কখন সে এই ঝোপের দিকটায় আসে তার সন্ধান নিতে বিশু সূর্যকে পাঠিয়েছে। পা খোঁড়া করে দেবার সেটাই হবে মোক্ষম সময়।

তার কেমন ভাল লাগছিল না এ-ভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে। বরং একটু এগিয়ে খুনতিকে দেখার প্রবল আগ্রহ বোধ করতে থাকায় সে আর বসে থাকতে পারল না। উঠে পড়ল! রেল-লাইন পার হয়ে এল। খুব সতর্ক। কেউ খপ করে ধরতে আসলেই দৌড়। ট্রেন আসার আগে সে প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাবে। কিন্তু সাক্ষাৎ যমদূতের মতো রঘুপতি সামনে! ওমা, এ কি গো—চিনতে পারছে না! কাল যাকে নিয়ে এত হুজ্জোতি করলে সে তোমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে—চিনতে পারলে না! একবার দেখল পর্যন্ত—কোথা-কার কোন অপোগণ্ড ভেবে গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। ওর ফিক করে হাসি পেল—এই মানুষটারই ট্রেন এলে কি রোয়াব। দিনের বেলার চেয়ে রাতের বেলা যেন এটা বাড়ে। অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ের মতো।

সে অনায়াসে প্ল্যাটফরম পার হয়ে গেল। ওধারে নেমে গেল। যাত্রীরা পায়ে হেঁটে রিক্সা করে আসছে। ফাঁক ফোকরে সে গলে গিয়ে খুনতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকটায় ছুটল। তাকে দেখার এমন প্রবল আগ্রহ কেন যে জন্মাচ্ছে। সে কাছে গিয়ে দেখল, গায়ে ছেঁড়া ফ্রক। শুকনো রুটি হাতে— ভাগ ভাগ করে খাচ্ছে। কাচ্চা বাচ্চা-গুলোকে খাওয়াচ্ছে। ঠিক রিন্টির মতো। ওরা না খেয়ে থাকলে, রিন্টি ঘর থেকে রুটি চুরি করে এনে এমনি খাওয়াতো। খুনতি তাকে লক্ষ্যই করছে না। আকাশের লাল নীল রঙের ঘুড়িটা কেবল দেখছে। তার পয়সা নেই—থাকলে একখানা ঘুড়ি উড়িয়ে এই মাঠে বসে থাকত। সে চায় তার ঘুড়ি ওড়া কেউ দেখুক। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। কোয়ার্টারের এই মাঠটায় আরও সব বাচ্চা কাচ্চা। গায়ে ঠিকঠাক জামা নেই। বিশুর মনে হল এক গোত্রের। আর খুনতির বাবা পানিপাঁড়ে রঘুপতি ওর শ্বশুর হতে পারে। তারপরই ভাবল, আর যাই করা যাক, শ্বশুর শালার ঠ্যাং খোঁড়া করা যায় না। ওর এখন পয়সার দরকার। একটা লাল নীল রঙের ঘুড়ি ওড়াতে পারলে খুনতি খাওয়া-দাওয়ার নাম ভুলে যেত।

সে মনে মনে কথা বলতে থাকে।

বা বেশ সুন্দর ঘুড়ি। কোত্থেকে আনলে।

কেষ্ট সাহার দোকান থেকে।

আমাকে একটা এনে দেবে? আমার বড় ইচ্ছে, ঘুড়ি আকাশে ছেড়ে দি। মাঠে বসে থাকি ঘুড়ির সুতো ধরে।

দেব। কি রঙের চাই?

নীল রঙের।

একটা লাটাই লাগে না?

হ্যাঁ লাগে।

তাও এনে দেব তোমাকে মেয়ে। যা চাইবে তাই দেব। রিন্টির জন্য ফল পাকুড় এনেছি, তোমার জন্য ঘুড়ি।

এইসব ভাবতে ভাবতে গোপাল ভুলে গেল তার গোয়েন্দাগিরির কথা ছিল। ধুস গোয়েন্দাগিরি—তার চাই এখন একটা লাল নীল রঙের ঘুড়ি। এই মাঠে আজ বিকেলে সে ঘুড়ি ওড়াতে আসবে। ঘুড়ি উড়িয়ে দিতে পারলেই নতুন বন্ধুত্ব।

সূর্য বিশুকে বলাও যাবে না। শুনলে ক্ষেপে যাবে। কাল যে শালো তোমার কান ছিইড়ে দেল, সে আজ তোমার শালা শ্বশুর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলবে, আরে নানা। এই আর কি, মন কেমন করে রিন্‌টিটা চলে গিয়ে মনটা ফাঁকা করে দেল। তোদের ছেড়ে এক পা নড়ছি না।

গোপাল এখন দৌড়ে যাচ্ছে। তার জানা আছে কোথায় দাঁড়ালে সেও মোটঘাট বইয়ে, গাড়ি ঠেলে দিয়ে, অথবা জেলা কোর্টের কাছে ট্যাকসির সোয়ারি ধরে দিতে পারলে পয়সা! এইসব কাজ নিদেন কাল যখন আসে তখন বড় জরুরী হয়ে পড়ে। একটা ঘুড়ি কেনা, লাটাই কেনা, আর মাঞ্জা দেওয়া সুতা কিনতে পারলে, মনের আক্রোশ ঝরে যাবে। সে আর রঘুপতির পা খোঁড়া করে দেবার কথা মনেও আনতে পারবে না।

এই করে সে যখন কিছু রোজগার পাতি সেরে ডেরা থেকে বাঘাকে নিয়ে ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে কাশীশ্বরী ইস্কুলের উঠোন পার হয়ে বাস স্ট্যাণ্ড পার হয়ে দৌড়াল। পকেটে বিয়াল্লিশটা পয়সা। পাঁচ পয়সায় ঘুড়ি, দশ পয়সায় সুতো, লাটাই বাঁশ কেটে বানিয়ে নিতে হবে। এক পয়সা দু-পয়সার চিনেবাদাম ছোলা ফুলুরি এইসব ঠোঙাতে। সে ঘুড়ি ওড়াবে আর খাবে। খুনতিরে তার কেন জানি বড় ভাল লেগে গেছে যে ঘুড়ি ওড়া দেখতে ভালবাসে তার বাপকে আর যাই করা যাক ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে পাপ থাকে, পুণ্য থাকে। কখন যে কোনটা ভেসে ওঠে। সে পানিপাঁড়েকে দেখেছে, সিগনেলিং ডাউনের আগে কোন এক দেবতার নামে মাথা ঠেকায়। এতগুলান লোক ট্রেনে চড়ে

আসছে, কোন অপদেবতার নজরে পড়ে যাবে কে জানে তার ভয়, অপদেবতার টানে ট্রেনটা না হুমড়ি খেয়ে পড়ে—বেগবান একখান যন্ত্র মানুষ বানাইছে। বানাইছে বড় ভাল কথা। সেই লেখক লোকটা বলত, বানাইছে। ঈশ্বর পৃথিবী বানাইছে মানুষ বানাইছে যন্তর। যন্তর বড় বেগবান। বেগবান কথাটা গোপালের সেই থেকে জানা। লোকটা কত যে ভাল কথা তাদের শিখিয়ে গিয়েছিল, সেই কথাটা যা সে লিখে এয়েছে রাজবাড়ির পাঁচিলে, মানুষ তেলে ভেজাল দেয়, মানুষ মরে যায়—ভারি দামি কথা একখান।

মানুষের নিরন্তর ইচ্ছা—ইচ্ছার শেষ নেই। ইচ্ছার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ কালো এক আঁধার ভুবনে ঢুকে যায়।

তখনই মনে পড়ল, বিশু ওরা লম্ফ কিনে আনবে। আজ বাতি জ্বালাবে। জীবনে বাতি জ্বালানো বিষয়টাই তাদের জানা ছিল না। রিন্‌টি চলে গিয়ে তাদের কাঙ্গাল করে রেখে গেছে। প্রথমে বাতি জ্বেলে কাঙ্গালিপনা থেকে তারা মুক্তি চায়। এবং এ-সব মনে হতেই কে খুনতি, কে শ্বশুর, কার ঘুড়ি কোনখানে কিছু মনে থাকল না। বাতি জ্বালানো বিষম কষ্ট। সে সেটা দেখার জন্য আরও জোরে দৌড়াল।

সাঁজ লেগে গেছে। পাঁচ ছয় ক্রোশ জুড়ে তার এলাকা। অফুরন্ত প্রাণশক্তি, যখন যেখান দিয়ে যায়, বোঝা যায় গোপাল যাচ্ছে। চারপাশে প্রাণের কি সাড়া জাগানো আভাস—সেসব পার হয়ে রেল-লাইনে উঠে পড়ে। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে যখন সে এল জায়গাটায়, দেখল, ঝোপের ভেতর সত্যি বাতি জ্বলছে। বাতি জ্বলা কি যে বিষম ব্যাপার সে এই প্রথম টের পেল। নিজেরা বাতি জ্বালিয়েছে। সে ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে পরিত্যক্ত গুমটি ঘরটাতে দেখল, উবু হয়ে বিশু কাঠে ফুঁ দিচ্ছে। সূর্য নেই। আজ বাতিও হল। এত সব সুখবর মানুষের জন্য থাকে এর আগে তাদের জানা ছিল না।

গোপাল বাতিটা দেখছিল। একটা সাদা রঙের টিনের লম্ফ।

এটা তাদের সম্পত্তি। ভাতের হাঁড়ি একখান—এটাও তাদের। তিনজনের এতটা বিষয় আশয় একসঙ্গে হতে পারে গোপাল কখনও অনুমান করতে পারেনি।

সে ডাকল, বিশু, ও বিশু।

বিশু কাঠ জ্বালাতে মগ্ন। সে এসে ডাকছে।—ও এলি। দেখলি কোথায় যায়?

গোপালের খেয়ালই ছিল না। সে বলল, কে যায়?

আরে তুই কি! তারপরই কাঠটা ধরে গেল। ধোঁয়ায় বিশুর চোখ জ্বলছিল। আগুন জ্বলতেই চোখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রাণের আভাস চারপাশে ফুটে উঠছে। আগুন আলো মানুষের জন্য বড় দরকারী বস্তু। গোপাল নিমেষে জীবনের সব অপমান ভুলে গিয়ে বলল, লম্ফটা কত নিলরে?

চল্লিস। বেটা কুনজুস। কিছুতেই কমাল না। বলল, এবে কয়, বেথুয়াডহরির কেস্ট কামারের লম্ফ। যে ঘরে জ্বলে তারে আলো করে দেয়। কত কথা। কয় আলো জ্বালবা, লক্ষ্মী ঘরে আনবা, খিচুরী পায়েস খাবা। এ লম্ফের বড়াই কত! যার ঘরে কেষ্ট কামারের লম্ফ জ্বলে; সে বড় ভাগ্যমন্ত। কথার ফুলঝুরি।

সত্যিওতো হতে পারে।

ধুস! পয়সা দরাদরি করি সেই ভয়ে ও-সব কথা।

নারে, আমার জানি কেমন লাগছে।

কি লাগছে আবার।

গখখুর সাপটা—কি একখানা পয়মাল জীবরে! সারা রাত মাথার কাছে পড়ে থাকল, কামড়াল না।

অনিষ্ট করলেতো কামড়াবে?

সেই। তারপরই বলল, পেল্লাই মনসার বাহনটা রাতে যদি ফিরে আসে।

ফিরে আসবে কেন?

আরে গুপ্তধন না থাকলে, অমন পেল্লাই বাহন হয় না। ঐ যে

পাথর পাঁচিলে ঢুকে গেল ওটা খুঁজে দেখলে হত। কেষ্ট কামারের লম্ফটা যখন হাতে এয়েছে, গুপ্তধনও হাতে এসে যেতে পারে।

বিশু খুব বিবেচক, সে জানে, গোপালটা উদাস প্রকৃতির। সব কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে যায়। কোন এক মালীর বেটা গুপ্তধন পেয়ে সওদাগর বনে গেল, কোন এক পাখির লেজ থেকে সোনার পালক রোজ একখান করে খসে পড়ত, গরীব হাবু তা দিয়ে রাজকন্যা বিয়ে করে আনল—এসবে তার বড় বিশ্বাস। সে বলল, সব হবে। আগে দুটো শুকনো ঘাস পাতা আন।

ঘাসপাতা আনার কথা বলতেই সে বুঝল, আজ সত্যি ভাত হচ্ছে। সে যাবার আগে হাঁড়ির কাছে লম্ফ নিয়ে গেল। দুটো বেগুন সেদ্ধ। এক কোণায় দেখল, তিনখান কাচা লঙ্কা। ছোট্ট এক শিশি তেল। গোপাল খাবার আনন্দে বিশুকে জড়িয়ে ধরল।

নিয়ে আয় আগে।

অ যাচ্ছি। সে ঘাসপাতা সংগ্রহ করে ফেরার সময় দেখল, সূর্য মাথায় করে এক হাঁড়ি জল নিয়ে এসেছে। ওটা এনে এক কোণায় রেখে গোপালকে বলল, দেখলি কখন বাগে পাওয়া যায়।

গোপাল বলল, বাতি যখন জ্বলছে তখন আর দুজ্যোতি নয়।

সূর্য ওদের মধ্যে বয়স অনুপাতে লম্বা। তাকে দেখলেই কিছুটা সাবালক লাগে। সে পরেছে তাপ্পিমারা পা জামা। গায়ে গেঞ্জি। সে গেঞ্জিটা খুলে বলল, একেবারে যুধিষ্ঠির হয়ে গেলি মাইরি।

বিশু তাকাল। কাকে কথাটা বলছে বোঝা গেল না। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় শুকনো ঘাসপাতা খুব একটা নেই। গোপাল হাতের কাছে যা পেয়েছে এনেছে। এখন থেকে সমজে চলা দরকার। সে বলল, গোপাল কাল ঘাস পাতা রোদে শুকিয়ে রাখবি। একটা দরজা বানাতে হবে। উনুনের আগুনটা নিবে গেছে। সে আবার উবু হয়ে ফুঁ দিচ্ছে।

সূর্যর রাগটা পড়েনি। সে বলল, পানিপাঁড়ের কি হবে? বড়বাবুর? খাওয়া সেরে বের হব না।

বিশু বলল, যাকে পাঠালি, সেতো কিছু বলছে না।

গোপাল কেবল লম্ফটা দেখছিল। এটা একেবারে নিজের লম্ফ। নিজের জিনিস এ-ভাবেই মানুষের জন্ম নেয়। নিজের বলতে তাদের রিন্‌টি ছিল সে চলে যাবার পর নিজের বলতে এই লম্ফটা। কি চকচক করছে!

সূর্য দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। পা নাড়াচ্ছে। সে পা দিয়েই গোপালকে ঠেলা মারল, এই হারামী চুপ মেরে গেছিস কেন?

গোপাল বলল, ক্ষেমা দে ভাই।

ক্ষেমা কেনরে! কি হল বাছা! সূর্য ভাবল রাগ করেনিতো। সে উঠে এসে সামনে বসে আলোতে মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করল।

আঃ সূর্য কি যে না তোরা?

কী হয়েছে। ধর্মপুত্র হয়ে গেলি।

আমাদের লম্ফ হয়েছে যখন, সব হবে। সবাইকে আমরা ক্ষমা করে দেব।

বিশু শিস দিয়ে উঠল। মাইরি কি সুন্দর কথা রে বাইস্কোপের মত কথা বলছে গোপাল। রিন্টি তোরে সন্ন্যাসী বানিয়ে রেখে গেলরে!

সূর্য বলল, খবরদার বিশু ও-মেয়ের নাম মুখে আনবি না। আমাদের কাঙ্গাল করে চলে গেল।

গোপাল উঠে দাঁড়াল। দরজায় এসে ঠেস দিয়ে আকাশ দেখল। বলল, রিন্টি আবার আসবে।

॥ সাত ॥

রিন্টি সকালে উঠে জানালা খুলে দিল। দক্ষিণের হাওয়া আসছে। সামনে ঝুল বারান্দা। দরজা খুললে ঝুল বারান্দায় যাওয়া যায়। সে দরজা খুলে ঝুল বারান্দায় এসে বসল। বেতের চেয়ার সাদা রঙের। নরম কারুকাজ করা কভারে ঢাকা। শরীরে কি যে আলস্য! হাই উঠছে। ক'দিন থেকে লম্বা একটা ম্যাচ বাকসের মতো বাড়ির ভিতর ঢুকে তার কেমন প্রাণ হাঁকপাক করছিল। বোতাম টিপলেই উঠে যাওয়া যায়। বোতাম টিপলেই নেমে যাওয়া যায়। প্রথমেতো সে দেখে শুনে থ। সে ভ্যাক করে কেঁদেই ফেলেছিল। পেল্লাই চকচকে দরজা খুললে লম্বা বারান্দা। নীলরঙের কি পাতা! লোকটা বলেছিল, কার্পেট। উদাসবাবু ঘুরে ঘুরে সব বলে দিয়েছিল, কার কি নাম। ভেতরের লম্বা বারান্দাকে করিডোর বলে। সাদা মতো একটা বাকস আছে। ওটাকে বলে ঠাণ্ডা ম্যাসিন। ওখানে সে ফুলকাটা বরফের টুকরো পর্যন্ত গ্লাসে ভেসে থাকতে দেখেছে। ওটার একটা নাম আছে। মাও দেখেশুনে ঘাবড়ে গেছিল। প্রথম দিনতো কথাই বলতে পারে নি ভাল করে।

এ'কদিনেও রিন্টি বুঝতে পারছে না তার কি কাজ। তাকে কি করতে হবে। প্রথমে ভেবেছিল, বিয়ে থা দেবে, সে জন্য সব কেনাকাটাও হয়েছিল এখন দেখছে ও-সব ফুসফাস। উদাসবাবু আর সেই লোকটার কি মতিগতি বুঝেই উঠতে পারছে না। গেল কাল উদাসবাবু চলে গেছে। খুব খুশি উদাসবাবু। মাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা কি ভাল, না উদাস পূর্ণিমা থাক। রিন্টি ছেলেমানুষ, একা ভয় পাবে। তা একা ভয় পাওয়ারই কথা। যত লোকজনই থাকুক, মা না থাকলে সে যে একা লোকটা ঠিক ধরতে পেরেছে। সে ভেবেছিল, এই লোকটার সঙ্গেই তার বোধ হয় বে হবে।

বয়স বেশি, তা হোক না, বয়সে বুড়ো হলেই শিবঠাকুর হয়ে যায়। সে না হয় শিবঠাকুরের মতো স্বামী পাবে। রিন্‌টির সে-জন্য দুঃখ নেই। শাস্ত্রে তো তাই আছে। শিবঠাকুর গাঁজা ভাঙ খায়, শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় পার্বতী পদ্মফুল নিয়ে বসে থাকে। স্বামীর পায়ে দেবে পদ্মফুল। উদাসবাবু যদি তার মানুষ ঠিক করেই থাকে তার ভালোর জন্যই করেছে। মেয়ে হলেই বে হয়। কিন্তু বে'টা কবে বুঝতে পারছে না। মাকেও বলতে পারছে না ও মা তুই যে নিয়ে এলি বে দিবি বলে, সেটা হচ্ছে না কেন! পরের বাড়িতে থাকি কি করে বল। কিন্তু মনের মধ্যে ভারি সংকোচ বে কথাটা মুখ ফুটে বলে কি করে!

আর কি করে যে খবর পেয়ে যায়—কে যে খবর দেয় বুঝতে পারে না। এল বলে! দরজা ওদিক থেকে খুলে যায়—গোঁফো পিয়ার আসে। হাতে পেস্ট, নীলরঙের ব্রাস। কি যে মরন! ঘুম থেকে উঠলেই দাঁত মাজতে হয়। ও-সবের বালাই তার ছিল না। এখানে এটাই তার সবচে বেশী খারাপ লাগে। একা কোথাও বের হতে পারে না। দৌড়াতে পারেনা। বনজঙ্গল নেই-কেবল যতদুর চোখ যায় অগুনতি বাড়ি বাস ট্রাম মানুষ জন, হাওড়ার পুল। উদাসবাবুই বলেছিল, ঐ ছাখ তোর ঘর থেকে হাওড়ার পুল দেখা যায়। কেমন রুপোলী রঙের একটা কারুকাজ করা ইন্দ্রের ধনুক আকাশ প্রান্তে কুয়াশার মধ্যে ঝুলে থাকে। এই ঝুল বারান্দায় বসলেই ওটা চোখে পড়ে। রিন্‌টি চেয়ে থাকে—একদিন বাবু লোকটাকে বলবে ভেবেছে, চল গো, হাওড়ার পুল দেখে আসি।

পিয়ার প্লেট রেখে ডাকল, দিদিমনি।

তুমি আমাকে দিদিমনি ডাকলে কেন পিয়ার? সে একদিন পিয়ারকে কথাটা বলতেই কেমন ভ্যাবলু বনে গেছিল পিয়ার। পিয়ার কখনও হাসে না। পিয়ার শুধু কেন, ঐ যে সন্তোষ, যে বাবুর ব্যাগ গাড়িতে তুলে দেয়, এটা ওটা বাজার করে আনে, দুধ নিয়ে আসে ফল নিয়ে আসে, সব সময় কেবল এটা ওটা সে আনছেই তাকেও কোনদিন

হাসতে দেখেনি। মানুষ না হাসলে বাঁচে কি করে! ঐ বাবু লোকটাও হাসে না! রিন্টি মনে করার চেষ্টা করল, তারপরই মনে হল, হাসে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় হাসে। শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ। মাথার চুল কি কালো। রোজ সকালে বিকালে দাড়ি কামায়। আতর মাখে। একটা বড় সাদা রঙের আলমারিতে কত রকমের পোশাক। গলায় টাই বাঁধে। ধোপা আসে, নাপিত আসে চুল কামাতে। সে আবার কালো রঙের কি সব মেখে দেয় চুলে। গোঁফ রাখেনা, ঐ রক্ষে। গোঁফ রাখলে উদাস বাবুর মতো পাকা লোম তুলে দিলেই দু-পাঁচ পয়সা। দু পাঁচ পয়সার চিনে বাদাম না হয় মুড়ি-ছোলা মাখা। সে ঠোঙ্গায় ওটা খেতে খুব ভালবাসে।

তার ততক্ষণে দাঁত মাজা হয়ে গেছে। এর নাম বাথরুম। গন্ধ সাবান, গন্ধ তেল সাজানো। কখনও শেষ হয় না। সে একদিন উলঙ্গ হয়ে স্নান করেছিল। কেউ তো দেখতে পায় নি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে উঁকি ঝুঁকি মেরে যখন বুঝেছে, না কোথাও ফোকর নেই তখন কৌতুহল বশে সে উলঙ্গ হয়ে চান করে ফেলেছিল। আস্ত একখান সাবান মেখে শেষ করেছে।

আস্ত একখানা সাবান শেষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ সে কেমন আরাম বোধে সেটা শেষ করে ফেলেছিল। তারপরই মনে হয়েছিল, কাজটা ঠিক হয় নি। বাবুলোকটা স্নান করতে ঢুকলে সাবান পাবে না। কথা হতে পারে। বাবুর মেজাজ বড় চটা থাকে। কি যে কারণ সে বোঝে না। এক মাত্র মা আর তাকে বাদ দিয়ে সবাই যেন মানুষটার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। গম্ভীর গলায় ডাক, পিয়ার, গম্ভীর গলায়, ডাক, সন্তোষ, গম্ভীর গলায় ডাক, কেউ এলে, বসুন। মানুষের এমন মেকি স্বভাব থাকতে পারে কি করে! যেন সব সময় খোলা উত্তপ্ত হয়েই আছে। দিলে ফুটবে খৈ ফোটার মতো। বাবুলোকটা না আবার কি ভাবে। অ মা! বিকেলেই দেখেছে দু-খান বাকসে দু-খান গিলিসারিন সাবান। এ-কেমন জায়গারে বাবা,

খেয়ে শেষ করা যায় না, মেখে শেষ করা যায় না, দেখে শেষ কর
যায় না।

—এই পিয়ার!

—দিদিমণি

—তোকে বলেছি না, সকালে আমি দুধ খাই না। ডিম খাই না
এ-সব ছাইপাশ একদম দিবি না।

পিয়ার কেমন আমতা আমতা করে বলল, বাবুর কথা কেউ অমান্য
করে না দিদিমণি। কত বড় মানুষ!

—আমার ওক ওঠে।

—খান দিদিমণি। নালে শরীর পুষ্ট হবে কি করে! শরীর পুষ্ট
না হলে মজা পাবে না দিদিমণি। সব খা খা করবে। মরুভূমি
দেখেছেন। মরা গাছ দেখেছেন!

—থাম। থাম বলছি। কথা আরম্ভ করলে আর শেষ করতে
চায় না। নিয়ে যা সব।

পিয়ার দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা চুলকায়!—না খেলে যে বাবু রাগ
করে।

—করুক! তারপরই মনে হল খুব বড় কথা বলে ফেলেছে।
উদাসবাবু পই পই করে বলেছে, বাবু যা বলবে শুনবি। মা রোজ
পই পই করে বোঝাচ্ছে, বাবু যা বলে শুনবি। তোর কপালে মা
রাজরাণীর সুখ। আমি আর কদ্দিন। এতটা উগ্র হওয়া বোধ হয়
ঠিক হয়নি তার। সে এক চুমুকে নাকে ধরে দুধটা খেয়ে ফেলল।
তারপর বলল, পিয়ার, চারটা পেঁয়াজি মুড়ি এনে দিবি। রোজ দুধ
খেয়ে ওটা খেলে বমি পাবে না।

কিন্তু রিন্টি জানে, এ-বাড়িতে বাবুর নির্দেশ লঙ্ঘন করে কার এমন
বুকের পাটা। সে না পেরে বাবু লোকটাকেই বলেছিল কথাটা।
সকালে উঠেই বাবু লোকটা লুঙ্গি পরে একটা গদি আটা সোফায়
বসে! ঢাউস ঢাউস পেট মোটা ফাইল এনে রাখে সন্তোষ। কি
বলে, আর এনে দেয়। সে এ-সবের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না।

সকাল হলে তারও একটা কাজ থাকে। কাজটাতে সে প্রথম খুব আহাম্মক বনে গেছিল।

—এই রিন্টি এ-ঘরে আয়!

—কেন বাবু।

—আয় না।

সে খুব শংকিত মুখ নিয়ে দরজা পার হয়ে গেছিল।

—খোল।

সে ভেবে পেলনা কি খুলবে!

চাবি দেখে সে আরও ভড়কে গেছিল। একটা রিঙের মধ্যে আট দশরকমের চাবি। কোনোটা লম্বা, কোনটা চেপ্টা। রুপোর মতো সব ঝক ঝক করছে। সে কাছে যাচ্ছে না দেখে কেমন রুষ্ট গলা বাবু লোকটার। কিরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? নে না। এটা, বলে একটা চাবি দেখিয়ে বলল, ঐ যে আলমারিটা দেখছিস, খোল।

সে জীবনেও চাবি দিয়ে কোন বাকস খোলেনি। মার একটা বাকস ছিল, চাবি মার আঁচলেই বাঁধা থাকত। চুরি করতে গিয়েও ধরা পড়েছে। মা তার নিজের মেয়েকেও বিশ্বাস করত না। সংসার অসার কত কথা মার, অথচ চাবিটার বেলায় মা বড় সতর্ক। যেন জীবন, যেন চুরি করে নিলে মার, মরণ। চাবিটার বেলায় মা বড় সতর্ক। যেন জীবন, যেন চুরি করে নিলে মার প্রানবায়ুটাই আর ধড়ে থাকবে না। সেই চাবি বাবু লোকটা তার হাতে দিয়ে বলছে, খোল। সে না করে কি করে! বলে কি করে, অ বাবু পারি না। সবই যদি না পারে, তবে আর রাখা কেন।—কথা শুনবি মা। তোর কপালে দু:খ থাকবে না। সে চাবিটা নিয়ে বাবুর আজ্ঞা পালন করেছিল কিন্তু খোলে না।

—আরে উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছিস কেন। ওদিকে-না, ওটা এদিকে। তারপর নিজে উঠেই হ্যাণ্ডেলটাতে চাপ দিলেন, হাত মুচড়ে দেবার মতো।—এই হল। বুঝলি!

সে বুঝবে কি করে! চোখের উপর এ-সব কি দেখছে! কেউ ঘরে নেই। কেবল সে আর বাবু লোকটা। বাইরে লাল আলো জ্বলছে। ওটা জ্বললেই সে দেখেছে, আগুন লেগে গেলেও ঘরে কেউ ঢোকে না। ভারি সব তাজ্জব কাণ্ড। বিশু গোপাল সূর্যকে বললে, বিশ্বাসই করবে না। থরে থরে সাজানো বাণ্ডিলের নোট নিয়ে কেউ এমন নির্বিকার ভাবে বসে থাকতে পারে: সে ভাবতেই পারে না। বিশু গোপাল কেন, সবারই মাথা গরম হয়ে যাবার কথা। অথচ আশ্চর্য মানুষটা, মুখ বুজে কি সব ফাইল পত্র ঘাটছে। সে যদি দুটো বাণ্ডিল গাব করে দেয়—কে ধরে! বাবু না তাকিয়েই বলল, চারটা বাণ্ডিল বের কর। সে চার পাঁচ আট দশ বোঝে! এর বেশী হলেই বিপদ। চারটা বাণ্ডিল টেনে বের করতে গিয়ে হুড় হুড় করে অজস্র বাণ্ডিল নিচে পড়ে গেল। না তাকিয়েই বললো, তুলে রাখ। সাজিয়ে রাখ।

রিন্‌টির মনে হয়েছিল, সে কোথাকার কে—কি বিশ্বাস বাবুব! তার কেমন একটা দাবী জন্মে যাচ্ছে। সব সাজিয়ে রেখে রিং ঘুরিয়ে দিতেই বলল, বোস। সকালের খাওয়া হয়েছে।

—হয়েছে বাবু।

—বাবু বলতে বারণ করছি না। তোর মা দাদা ডাকে। তুই বাবু ডাকবি কেন?

রিন্‌টি বলেছিল, কি ডাকব? আসলে সে সব গুলিয়ে ফেলছিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কান গরম হয়ে গেছিল এত্ত এত্ত টাকা দেখে। তার উপর বিশ্বাস দেখে সে আরও তাজ্জব। মানুষকে খারাপ ভাবতে নেই। নিজের জননী যেটা করেনি, বাবু মানুষটা ক'দিন না যেতেই তা করে ফেলল। তার ইচ্ছে হচ্চিল বাবুকে বাবা ডাকে। তার বাবা নেই। মার সঙ্গে বে হলে খুব মানাত। সে ঝিম মেরে বসেই ছিল। ছাপা শিল্কের শাড়ী, কিছুতেই গায়ে রাখতে পারে না। কেবল উড়ে উড়ে যায়। সে নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। বাবা না কাকা, না মামাবাবু—কোনটা!

বাবু লোকটা খাতায় কি টিক মেরে যাচ্ছিল। ঘরে একটা গোল মতো সাদারঙের সাইকেল ঘনটি আছে। ওটা ক্রিং ক্রিং করে বাজছে। যেন তার সে দিকে খেয়াল নেই। শুধু কাজ, কাজ ছাড়া জীবনে কিছু আছে তখন দেখলে বাবু লোকটিকে কে বিশ্বাস করবে! কালো রঙের শক্ত সমর্থ মানুষ। বুকের পাটা কাছিমের মতো। লম্বা হলে খুব দশাশই মানুষ একখান। ঐ এক জায়গায় কমতি রেখেছে ভগবান। বেটে-অথচ পায়ের লোমশ দিকটা একটু আলগা করে রেখেছেন। দেখলেই কেমন অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তখনই তার গম্ভীর গলা, আমাকে মামাবাবু ডাকবি। যা উঠে গিয়ে বল, বাইরের ঘরে বসতে। কাজ হলেই ডাকব।

—বাবু!

—আবার বাবু!

—মামাবাবু।

—বল।

—বলছিলাম দুধ খেতে ভাল্লাগে না। দুপুরে মাংসের ঝোল ভাল্লাগে না। আমাকে পেঁয়াজ মাখা মুড়ি এনে দিতে বলবেন। আসলে রিন্টির দাবী জন্মে গেছে বলেই কথাটাই বলা। এত্ত এত্ত টাকা যে ছেড়ে দিতে পারে, সে অনায়াসে মুড়ি পেঁয়াজ মাখা তার জন্য আনিয়ে দিতে পারে।

—লোকটাকে বল বসতে।

—যাচ্ছি। সে দরজা ঠেলে বাইরে বের হতেই কোন এক যাদুকর ভেতর থেকে আপনি দরজাটা বন্ধ করে দেয়। এত সব লাগে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য—তার মাথায় দেয় না। কোন রকমে শাড়ি সামলে বাইরে বের হয়ে বলল, যান, বসার ঘরে গিয়ে বসুন। কাজ হলে ডাকবে। বলেই সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলে মামাবাবু বললেন, কি বললি?

—বললাম, যান, বসার ঘরে গিয়ে বসুন। মামাবাবুর কাজ হলেই ডাকবে।

—ও-ভাবে কথা বলতে হয় না। তোকে বলতে হত, আসুন তারপর সঙ্গে নিয়ে ঘরটায় ঢুকতে হত। বলতে হত, বসুন। চা খাবেন না কফি। কোল্ডড্রিংকসও বলতে পারিস। যে যা চায়, তাকে তাই দিতে হয়। না হলে মানুষ খুশি হবে কেন

—সত্যি।

—হ্যাঁরে সত্যি। এই যে সব বাড়িঘর দালান কোঠা, মানুষের বৈভব দেখছিস—এক এক জন মানুষ এর ইজ্জত বুঝত বলেই গড়তে পেরেছে। কথাবার্তায় কোন খুঁত রাখবি না।

তার নিকুচি করেছে এ-সবে। সে তার পুরানো দাবীতে ফিরে গিয়েছিল, পিয়ার সকাল হলেই কি সব অখাদ্য দেয় আমার বমি আসে।

—অখাদ্য দেয়!

—ঐ তো টোষ্ট না কি বলে, ওমলেট না কি বলে, দুধ আর পরিজ্জ না কি বলে। আমার বমি পায়। আমি পেঁয়াজ মুড়ি খাব।

—তা খাবি।

—তুমি বলে দাও না মামাবাবু। বলেই সে হতভম্ব। এত বড় মানুষটাকে সে তুমি বলে ফেলেছে। কি না জানি হবে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, মামাবাবু খুব খুশি। —তোর যা ইচ্ছে খাবি। তবে কি জানিস, ও-সব ছাইপাঁশ খেতে হয় না। খেলে মুখে গন্ধ হয়। পেটে পচন ধরে।

—না আমি খাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা খাবি।

—আমার খাবারটা দে

—সন্তোষ দেবে। আমি কবে আবার খাবার দি।

—দে না। সন্তোষ ঠিক করে দেবে, তুই এনে দিবি? দেখছিস তো এখানে আমার দেখাশোনা করার কেউ নেই।

তোমার বউ কি হল মামাবাবু? কিন্তু এতটা বলার হক যেন তার জন্মায়নি। সে এটাও দেখতে পায়, বাবু লোকটার অজ্ঞাতে যে যার

খুশি মতো চলে। বাবু লোকটা বের হয়ে গেলে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যতক্ষণ সে আছে, ততক্ষণ সবার পা টিপে টিপে হাঁটা। ফিসফাস কথাবার্তা। বাবু লোকটা বের হয়ে গেলেই সন্তোষ আর পিয়ার শম্ভু নিশম্ভু হয়ে যায়। দাপাদাপি ছুটোপুটি। রান্নার মেয়েটা ডেকেও কারো সাড়া পায় না। মা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সারাদিন চুল আঁচড়াচ্ছে, দাঁত মাজছে, আয়নার সামনে বসে পাউডার ঘসছে। মার শুঁটকি চেহারাটা ক'দিনেই কি খোলতাই হয়েছে। বাবু লোকটা এলে মা-ই দরজা খুলে দেয়। পাখা চালিয়ে দেয়। লুঙ্গি, তোয়ালে বাথরুমে ঠিক করে রাখে। কে যে মাকে এ-সব কাজের ভার দিল সে ভেবে পায় না। উদাসবাবু জানলে ক্ষেপে যেতে পারে। রাতে মা বাবুলোকটার ঘরে বসে একদিন হি হি করে হেসেছেও।

সকালবেলায় নাকে ধরে দুধটা খেয়েই তার হুঁস হল, মামাবাবুর কথা কেউ রাখছে না। সে ডাকল, পিয়ার, শিগগির পেঁয়াজ মাখা মুড়ি দে। নয় তো হড় হড় করে বমি করে দেব। মামাবাবু বলেছে খেতে। দে, এনে দে।

পিয়ার পাজামা পরেছে। হাতে কাচা। একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। পিয়ারকে দেখলেই সূর্যর কথা মনে হয়। কে-জানে সূর্যটারও কপালে না এমনি আছে। পিয়ারের জন্য তার মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত মায়া বোধহয়। হড় হড় করে বমি করে দেবে বলতে পিয়ার বড়ই চেপাকলে পড়ে গেল। বলল, দিদিমণি, দোহাই, হড় হড় করে বমি করে দিও না। বাঁ হাতের তালুটা শোঁক। সে তো বলতে পারে না রিন্টির মামাবাবু বলেছে, একদম বাজে খাবার এনে দিবি না। ও ছোলা মটর আনিয়ে খায়। যদি টের পাই এনে দিস, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।

সে হাত জোড় করে বলল, দিদিমণি তুমি বমি করে দিলে আমার চাকরি নট হয়ে যাবে। দোহাই মা কালীর দিব্যি।

—দিব্যি যখন দিলি বমি করব না। তারপরই মনে হল, তার এখন কাজ মামাবাবুর ঘরে। মামাবাবুর এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া।

সে ঘরে ঢুকে দেখল, মামাবাবু সেই যন্ত্রটাতে পটাপট কি টিপছে। সন্তোষ বারবার নামটা শিখিয়েছে। অথচ এ-মুহূর্তে মনে করতে পারছে না। সে ঢুকতেই বলল, ফোনটা ধর। রিন্টি ফোন তুলে বলল, হ্যালো। এই হ্যালো শব্দ মামাবাবু তাকে পই পই করে শিখিয়েছে। এখন সে নাকি ঠিক ঠিক গলায় জবাব দিতে পারে। মামাবাবু তাকে একশ পর্যন্ত নামতা শিখে নিতে বলেছে। বেঁচে থাকতে হলে এ-সবের নাকি খুব দরকার। তার স্মৃতিশক্তি প্রবল নয়। একশ শিখতেই পারছে না। মামাবাবু বলছে, হবে হবে। রিন্টি তোর সব হবে।

সে বলল, হ্যালো আমি রিন্টি বলছি। মামাবাবু টিপছে।

—আ হা, টিপছে না, টাইপ করছে।

—মামাবাবু টাইপ করছে।

—তোমার মামাবাবুকে দাও।

—মামাবাবু তোমাকে দিতে বলছে!

—আঃ কি যে করছিস। জিজ্ঞেস কর কে বলছেন!

—আপনি কে বলছেন।

—হরপ্রসাদ মিত্র।

—মামাবাবু কি নেই বলছে।

—দে আমাকে।

মামাবাবু ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় টাকের মধ্যে একটা মাছি উড়ে এসে বসল। মামাবাবুর টাকটা বড় উজ্জ্বল। রিন্টি ফুঁ দিল মাছি উড়িয়ে দেবার জন্য। হাত দিতে সাহস পায় না এখনও।

রিন্টি ফুঁ দিতেই মনে হল মামাবাবুর, মাথা গরম হয়ে না যায় এ-জন্য বোধ হয় ফুঁ দেওয়া। মেয়েটার ভয় অনেক কেটে গেছে। মনে মনে তিনি এটা চাইছিলেন। রিন্টি পাশের ঘরে শোয়। তিনি দরজা খুলে দিলেই ঘরটা। তাঁর ঘর, তারপর রিন্টির ঘর, তারপর পূর্ণিমার ঘর। পূর্ণিমার ঘরের সঙ্গে এ-দুটোর কোন সোজা দরজা নেই। করিডোরের দিকে মুখ করে দরজা পূর্ণিমার। এ-দুটো ঘরের কমন দরজাটির ব্যবহার তাঁর এখনও করা হয়ে ওঠেনি। ইজ্জত,

পুলিশ এবং আইন, এই তিনটি বস্তুকে মানিয়ে চলতে হয়। তিনি শরীরের জন্য খুব ভাবেন। তার ফার্ম আছে বলেই পঁচিশ ত্রিশজন বেকার নয়। এরা না হলে বেকার থাকত—এমন একটা চিন্তা সব সময় মাথায় কাজ করে বলে সাধু-সজ্জনের ভূমিকাটি কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এর আগে উষা ছিল। মেয়েটার মাথা ছিল। সব তিনি করতেন। বিনিময়ে মেয়েটি তার সঙ্গে রাতে শুত। এই সেই কমন দরজা। যা খুলে দিলে ফাঁক সব। উষার বাবাই বলেছিল, পড়তে চায়, কি করি! কলকাতার কলেজে পড়তে চায়। উষার বাবা তার প্রতিবেশী ছিল এক সময়। তিনি খুবই উদাস হয়ে গেছিলেন—আমার তো জায়গা পড়েই থাকে। অসুবিধা কি। খাওয়া-দাওয়া! এটাতো একটা হোটেল। শুধু তাই নয় বিবেচক মানুষ বলে তিনি উষার প্রাইভেট টিউটার থেকে সব খরচ দিতেন। ওর চাল-চলনের মান এমন বাড়িয়ে দিলেন যে উষা আর তার সঙ্গে না শুয়ে পারল না। এখন উষা ভাল আছে। প্রেম করে যখন বলল, দাদা কি করি। তিনি খুব সদয় হয়ে গেছিলেন—নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। মেয়েদের এটা একান্ত দরকার। তারপর তার কিছুদিন খাঁ খাঁ দিন গেছে। বউ ছেলে-মেয়েকে তিনি এখানে ঢুকতে দেন না। এদের দাবীর অন্ত নেই। যত লাগে নিয়ে যাও, আমার কাজের বিড়ম্বনা বাড়িও না। মামাবাবু নিজের সম্পর্কে এ-সব ভাবলেন রিন্টির ফুঁ দেওয়া দেখে। বললেন, আজ আমার সঙ্গে বেরোবি?

—কোথায়।

—তোর কি যেন চাই বলছিলি?

—প্লাষ্টিকের চুড়ি দেবে মামাবাবু?

—চল না।

ড্রাইভার বলল, কোন দিকে যাব?

—নিউমার্কেট।

রিন্টি দেখল এক স্বপ্নের পৃথিবী। সেদিন রাতেই মামাবাবু দরজা খুলে ঢুকে বললে, পর দেখি কেমন লাগে।

রিন্টি বলল, তোমার সামনে পরা যায় ?

—কিছু হবে না। আমি চোখ বুজে থাকব।

—না।

মামাবাবুর মাথা উত্তপ্ত। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিশোরী বালিকা। জীবন বড় দামী তার যা আছে, তাকে সব সাপটে খেতে হয়। এ-সব জানা সত্ত্বেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললেন, তুই বড় জেদি রে।

—বারে তুমি পুরুষ মানুষ না।

—কি হবে ? তোর জন্য আমি এত করি, আর তুই করতে পারবি না।

রিন্টি দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কথা বলল না।

মামাবাবু বললেন, নে ঘাট হয়েছে। আর আসব না। তোর যখন ইচ্ছে হয় না।

পরদিন রিন্টির কাছে সেই আলমারির চাবিটা ফেলে গেলেন। রিন্টির মনে হল সম্রাজ্ঞী। সে ভাবল রাতে বলবে, আমি তোমায় আর মামাবাবু ডাকব না। তুমি আমায় বে কর। বে করলে পরে এ-সব হয়।

রাতে সেই দরজাটা খুলে গেল। খুব সেজে গুজে এয়েছেন। সে বলল, কি গা তুমি আমায় বে করবে।

বলে কি মেয়েটা !

রিন্টি ফের বলল, মা যে বলল, আমায় বে দেতি নিয়ে এসেছে। বে না হলে ও-সব করতে নেই।

মামাবাবু কিছু বললেন না। আবার বের হয়ে গেলেন। রিন্টির জন্য কত কিছু এয়েছে। এক জোড়া বালা পর্যন্ত। সে জীবনেও এসবের মুখ দেখেনি। মামাবাবু যেখানে যান, তাকে সঙ্গে নেন। এমন কি ফার্মেও নিয়ে গেছেন। যারা কাজ করে তাদের তো বশংবদ থাকতেই হয়। এখানে কোন ইউনিয়ন নেই। কেবল তোয়াজ করে চাকরি রাখা। মালিক কি করছেন না করছেন দেখার কথা না। সর্বত্র এক কথা, ভাগ্নি। ফার্ম দেখতে এল।

রিন্টির সব কিছু দেখেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আসলে মানুষের যা হয়—এক রাতে রিন্টির ঘরে পাখা বন্ধ হয়ে গেলে, সে গরমে ঘুমাতেই পারল না। সে টের পেল, তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে। বিশু সূর্য গোপাল—? ওরা পাখার নিচে শোবে স্বপ্নেও ভাবে না। সেই বস্তিবাড়ি। তার যে অভ্যাস সকালে উঠে ওমলেট দুধ পরিজ খাওয়া। সে যে একশ পর্যন্ত নামতা শিখে গেছে। সে যে লেখাপড়া শিখে ফেলছে। এ-সব তো সত্যি দরকারী বিষয়।

বিকেলে মা চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। —তুই কি রিন্টি ডুবারী।

রিন্‌টি কথা বলছিল না। রাগে পূর্ণিমা রিন্টির ঘাড় ফিরিয়ে নিতেই দেখল, রিন্টি অঝোরে কাঁদছে। এতেও পূর্ণিমার কোন মায়া হল না।

॥ আট ॥

মাস তিন যেতে না যেতেই রিন্টির ভারি দীপ্ত চেহারা হয়ে গেল। লম্বা শরীর। যখন করিডোর ধরে হেঁটে যায়, বাবু লোকটা ভাবে হেলেন যাচ্ছে। হেলেন অফ ট্রয়। নানা রকমের পোষাক তৈরি হয়। বড় আদরের ভাগ্নি। হলে কি হবে, কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। এমন চোখ মুখ করে রাখে ঘরে ঢুকলে যে মনেই হয় না তুজনের মধ্যে অন্য রকমের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য রিন্টিকে এখানে নিয়ে আসা। পূর্ণিমা বরং উল্টো। মাঝে মাঝে বাবু লোকটার মনে হয়—মাও তো কম যায় না।

কি আর করা মেয়ের হয়ে পূর্ণিমাই ক'দিন বাবুর ঘরে ঢুকে গেল। ঢুকলেই বলা, ওতো ছেলেমানুষ। ওকে না হয় ছেড়ে দিন বাবু। আমি তো আছি।

—পূর্ণিমা তোমার যৌবন আছে দেখছি। উদাস তোমার কে হয়?

—কে আবার, কেউ না।

—উদাস চিঠি দিয়েছে। সে তোমাকে নিয়ে যাবে।

—আমি আর যাবই না।

—উদাস রাগ করবে।

—করুক গে।

—এটা ঠিক না পূর্ণিমা। ও তোমাকে খুব ভালবাসে।

—আপনিও তো বাসেন।

আমার তো সময় কম। দেখছ তো কত কাজ। কাজ করে এ-সব করি কখন। এ-সব করতে গেলে, অফুরন্ত সময় দরকার। আমি বাইরে যাচ্ছি। দেখে শুনে রেখ সব। —রিন্টি কি করছে?

—বই খুলে ছবি দেখছে।

—দেখুক।

—ডাকব ?

—না ভাবছিলাম, রিন্টি যদি যেতে চায়।

—দেখি না কি বলে।

পূর্ণিমা রিন্টির ঘরের দরজা খুলে ডাকল, তোর মামাবাবু ডাকছে।

রিন্টি ফুল লতাপাতা আঁকা ম্যাকসি পরেছে। একেবারে সত্যি যেন পরী হয়ে গেছে। মামাবাবু চোখ তুলে দেখল। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এত করেও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। যা জেদি মেয়ে যদি কিছু করে ফেলে। ইজ্জতের প্রশ্ন। পুলিস আইন ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু কাগজগুলো যা সব স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে বেড়ায়। তিলকে তাল করতে কতক্ষণ।

—বোস। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন!

রিন্টির হাই উঠছিল।

—আমার সঙ্গে যাবি ?

—কোথায় ?

—চল না বেড়িয়ে আসবি। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে। কত কিছু দেখতে পাবি।

—না ভাল্লাগছে না।

বাবুলোকটি পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে বলল, নাও, কি বলবে।

পূর্ণিমার ইচ্ছে হচ্ছিল, দু-চড়ে সব কটা দাঁত তুলে দেয়। হতভাগা মেয়েমানুষ কেউ অত করে। তোর মাতো এক কথায় উদাসবাবুর সঙ্গে তোর বাপকে ছেড়ে চলে এয়েছিল। সুখ মানুষের এমনি আসে। উদাসবাবু না থাকলে এমন সজ্জন পেতিস। অবশ্য এ-সব বলা হয় না। সে বলল, মাথায় ভূত চেপে আছে।

—কোথাকার ভূত।

—তিনটে ভূত। একটা না, দুটো নয় তিন তিনটে।

—সব ছাড়িয়ে দেব।

—পারবেন না। যা দেখছি পারা যাবে না। ও তিনটেকে নিয়ে আসুন।

মামাবাবু কি বুঝে বলল, তুই যা রিন্টি।

রিন্টি যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

পূর্ণিমা বলল, দেখলেনতো কি ভাবে হেঁটে গেল

—দেখলাম।

—কোন হুঁস আছে?

—নেই।

—মনে হয় না ঘোরের মধ্যে থাকে।

—তাই। ভূত তিনটি কি?

—ঐ সূর্য বিশু গোপাল। ওর তিন সঙ্গী। ওদের সঙ্গেইতো বড় হল।

—কি করে?

—ভেরাণ্ডা ভেজে।

—ভেরাণ্ডা যদি আর ভাজতে না দিই!

—মানে বোঝলাম না বাবু।

—কোন কারখানায় লাগিয়ে দি যদি। মাসে মাসে দেখতে পেলে মন ভরবে রিন্টির।

পূর্ণিমা কি ভাবল। সে যে এত সুখে আছে, রিন্টি যে এত সুখে আছে ওরা দেখে গেলে মন্দ হয় না। কণাদের তবে বলবে, হ্যাঁ দেখে এলাম রিন্টিকে চেনাই যায় না। মটর শুনলে খুশি হবে। কিন্তু গোল বাধবে ওরা এখানে এলে রিন্টি না আবার উড়নচণ্ডী হয়ে যায়।

বাবুলোকটি বলল, কি কথা বলছ না কেন!

—ওদের নিয়ে আসবেন বলছেন।

—তা—ছাড়া কি! চারজনই বাঁধা থাক।

—সে, কি—ভাবে!

—আরে একটু থাকার জায়গা খাবার জায়গা হলেই মেয়েমানুষ লাগে। মেয়েমানুষ মানুষের বড় আংটা।

—ওরাতো ছেলেমানুষ। পাঁচ সাত বছর না পার হলে বিয়ে কি করে করবে?

বাবুলোকটি খুবই বিব্রত বোধ করতে থাকল। কিন্তু রিন্‌টির এমন সুসময়ে তার যদি কোন কাজে না লাগল তবে হ্যাপা পুইয়ে লাভ কি। সে খুব গম্ভীর গলায় বলল, পূর্ণিমা একটা কথা।

পূর্ণিমা দেখল বাবু আজ আর তার হাত ধরে টানছে না। সে কেমন বিহ্বল চোখে তাকাল। বাবুলোকটিকে বিশ্বম্ভর বাবু ঠিক করে দিয়েছে। বলেছে হোমবাবু। কিন্তু পূর্ণিমার হোমবাবু মনে থাকে না। বিশ্বম্ভরবাবু একবার এখানে এসে দেখেও গেছে! —কেমন আছ পূর্ণিমা। বহরমপুরে গেছিলাম। উদাসকে কিছু বলতে হবে? আর বলা! যে জন্য আসা—তাকেই তো বাগে আনা যাচ্ছে না। সে বলেছিল, না বাবু কিছু বলতে হবে না।

বাবু লোকটি ফের বলল, আমি আর পারব না। এক পিসি ভাইজি আসবে কথা আছে। ভেবে ছাখ।

মাথায় হাত পূর্ণিমার। সে বলল, দেখি।

পরদিন রিন্‌টির কোন খোঁজ-খবর করল না বাবু লোকটি। রিন্‌টি খুশিই হল। মটর ছোলা চিনেবাদাম আনিয়ে খেল। সাজানো বেডরুমের চারপাশে খাচ্ছে। বাদামের খোসা ছড়িয়ে রিন্‌টি ভারি মজা পেল। পিয়ার যতবার সাফ করতে আসছে ঝাড়ন নিয়ে ততবার তাড়া খাচ্ছে। পূর্ণিমা ঘরে ঢুকে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সব যাবে। সে মাথা ঠিক রাখতে না পারলে রিন্‌টিকে মার ধোর করে। চুলের মুঠি থেতলায়। আজও তা করতে গেলে দেখল সে মাকে একবারও বাধা দিচ্ছে না। এ-মেয়ে নিয়ে কি হবে গ! পূর্ণিমা নিজেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল। —তোর কপালে সুখ নেইরে রিন্‌টি! তারপর খিস্তি—কাগে বগে ঠুকরে খাবে। আমার হাড়ে কালি লেগেছে তুই আর বাদ যাবি কেন। ঝি গিরি কপালে লেখা থাকলে কে খণ্ডায়। বিলাপ শেষ হতেই ভাবল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি আর

একবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—এই তাজ্জব ভেবে বলল, বাবু আমাদের চলে যেতে বলছে!

—তোর না দাদা হয় বলছিলি!

—হয়ই তো। কে খাওয়ায়। অমন সুখে কে রাখে বল হারামজাদী।

রিন্‌টি পাগলের মতো হা হা করে হাসতে থাকল। —তুই খুব কষ্টে পড়ে যাবি না মা!

—পড়ব না।

—বাবাকে ছেড়ে আসাতে কষ্ট হয়নি কেনরে?

—মুখপুড়ি ওকি একটা মানুষ ছিল। খাওয়াতে পারত না। সুখ সখ কিছু মিটত না। তোর মুখের দিকে না তাকালে কে আসত!

রিন্‌টি বলল, ঠিক আছে, তুই যা।

সন্ধ্যায় বাবু ফিরলে রিন্‌টি আজ নিজে দরজা খুলে দিল। কি সেজেছে রিন্‌টি। তাব চোখ টানা, ভ্রূতে কাজল, বড় লাল রঙের টিপ পরেছে। বাবুর লুঙ্গি জামা ভাজ করে রাখছে। হোমবাবু দেখে তাজ্জব। কাছে ডেকে বলল, রিন্‌টি আমার পাশে বোস। রিন্‌টি পাশে বসলে বলল, দেখত পছন্দ কিনা!

ভাল দামী হার একখানা। চক চক করছে। আজ এটা পরবি কেমন। আমি তোকে দেখব।

রিন্‌টি বিছানায় বসে। গলায় হার পরিয়ে দিচ্ছে হোমবাবু। রিন্‌টি কাঠের পুতুলের মতো বসেছিল। হোমবাবু কাঠের পুতুলটা নিয়ে খুশি মতো খেলা করল। শুধু রিন্‌টি একবার-আঃ করে চিৎকার করে উঠেছিল। মামাবাবু মুখে আসেনি, সেই আর্ত ডাকে, শুধু বলেছিল, বাবু লাগে…। তারপরই কেমন নিথর। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর কিছু না।

সকালে পূর্ণিমা দেখল রিন্‌টি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। মেজাজ প্রসন্ন হয়ে গেল। রাতে যা একখান আর্তডাক শুনে হৃতকম্প হয়েছিল—এখন ভালয় ভালয় শুয়ে আছে দেখে নিশ্চিন্ত। সে বাবু লোকটার

ঘরে ঢুকে দেখল, তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন। পূর্ণিমা বলল, একবার কালীঘাটে যেতে হবে। ড্রাইভারকে বলে দেবেন দাদাবাবু। মানত ছিল। মানত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মানত দিতে হয়।

বাবুটি বললেন, যাবে। নিশ্চয় যাবে। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ইয়ারকি আমি পছন্দ করি না। কথা দিলে কথা রাখতে হয়। জীবনে যার ঠাকুর দেবতা নেই—তার কিছু নেই। বাবুর সামনের দেয়ালে কালীঘাটের মা কালীর ছবি। তিনি বের হবার সময় রোজ এর নিচে মাথা ঠেকান।

॥ তিন ॥

জানালা থেকে আজও সরল দেখল, সেই মেয়েটা রাস্তা পার হয়ে কফি-কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলোতে মুখ চিনতে কষ্ট হয় না। সেই মেয়েটা। কফি-কাউন্টারটা পার হলে সি-বিচ শুরু। কিছুটা হেঁটে গেলে ওদিকটায় ঝাউবন পাওয়া যায়, সেখানে একটা টিলার উপর মেয়েটা বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে যায়।

সরলের ঘরটা সি-বিচের উপর। সমুদ্রের ঢেউ রাতের অন্ধকারেও অতিকায় সাদা চাদরের মত যেন হাওয়ায় উড়ে আসে। আছড়ে পড়ে। আবার মিলিয়ে যায়। হোটেলে আটটায় খেতে দেয়। খেয়ে উঠে ব্যালকনিতে বসে এই সমুদ্র দর্শন। রাত দশটা কখনও এগারোটা বেজে যায়।

কোনার্ক ট্রেভেলসেই সে এই মেয়েটিকে প্রথম আবিষ্কার করে। গাইড এক একটা দর্শনীয় স্থানে পৌঁছাবার আগেই সতর্ক করে দেয়—বাস বিশ মিনিট থামবে। এর মধ্যে সব দেখে ফিরে আসবেন। না এলে বাস ছেড়ে দেবে। পড়ে থাকবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না সারতে পারলে আপনাদের সব দেখা হয়ে উঠবে না।

ঠিক তার আগের রো-তে বাসে মেয়েটিকে সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। একজন যুবকের চোখ সবসময় সুন্দরী মেয়েদের মুখ খুঁজে বেড়ায়। বেড়াতে বের হলে সেটা আরও বাড়ে। সরল

নিজেকে এ-জন্য অপরাধী ভাবেনি। হোটেলের সামনে বাস এসে দাঁড়ালে, উঠতে গিয়ে এক পলকেই দেখে ফেলেছিল তাকে। ভাল লেগে গেছিল। ভ্রমণে যুবকেরা এই চায়। সে যতটা না চাঙ্গা ছিল, মেয়েটিকে দেখে আরও চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। পাশে বেঢপ মধ্যবয়সী লোকটি না থাকলে সে আরও খুশি হতে পারত।

বিগ্রহ এবং মন্দির দর্শনের জন্য বাসটি প্রথম থেমেছিল সত্যবাদী গাঁয়ে। বাস থেকে নেমে কিছুটা পথ, প্রায় ছুটোছুটি করে না গেলে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসা মুশকিল। সে দেখেছিল, মেয়েটি গরম উলের রঙবেরঙের চাদর গায়ে বড় ধীরে ধীরে হাঁটছে। বাস ছাড়ার সময় বেঢপ লোকটি উঠে এল, কিন্তু মেয়েটি ফেরেনি। গাইড সিট দেখে বুঝল, একজন আসেনি। কেউ বলল—বাস ছেড়ে দিন। পড়ে থাকুক। সরল কেমন সামান্য চাঞ্চল্য বোধ করেছিল। সে তখন আসছে।

মেয়েটি বাসে উঠে কারো দিকে তাকাল না। জানালার পাশে হেলান দিয়ে কি দেখছিল সরল জানে না। সে পেছনে। ওর চুল দুটো-একটা হাওয়ায় উড়ছে। একবার হাওয়ায় চাদর কিছুটা শিথিল ছিল—এই পর্যন্ত। ঘাড় বড় নরম এবং মসৃণ। মেয়েদের পেছন থেকে দেখতে একরকমের আগ্রহ বোধ করে থাকে সে। বড় খোঁপা। রেশমের মত হাল্কা নরম উষ্ণতা ভেতরে পাক খাচ্ছিল সরলের। কোনার্কে মেয়েটি সবুজ ঘাসে চুপচাপ। ধবলগিরিতে বাস থেকে নামলই না। নন্দন কাননে সবার পেছনে। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে বালিকার মত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙেছে। তারপর একটা গুহামন্দিরে ঢুকে সেই যে বসে থাকল আর ফিরবার নাম করল না। বাসটা অনেকক্ষণ থেমে ছিল বলে রক্ষা। সে ঠিক তাকে খুঁজে বের করেছিল। বলেছিল, চলুন, বাস ছেড়ে দেবে।

মেয়েটি তার সঙ্গে কোন কথা বলেনি। একবার শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছিল। অচেনা মানুষ যেমনভাবে তাকায় তার বেশি কিছু ছিল না।

সরল উঠে দাঁড়াল। ভেতরে তার আর দুজন সঙ্গী পাশ ফিরে শুয়ে মেয়েদের ভালবাসা নিয়ে কূটতর্ক জুড়ে দিয়েছে। ওরা আশা করেছিল, সরল তর্কে যোগ দেবে। কিন্তু ওকে জামা পরতে দেখে বলল—আবার বের হচ্ছিস।

—ঘুরে আসছি!

সরল কালও গেছে। তার আগের দিনও গেছে। যখন সি-বিচ খালি হয়ে আসে, মেয়েটি কোথায় যায় দেখার কৌতূহল। প্রথম রাতেই মেয়েটিকে রাস্তার আলোতে ঠিক চিনতে পেরেছিল। চোখ খুব বড় না। রঙ খুব ফর্সা না। চিবুক সামান্য চাপা। বয়স একটা সময়ে মেয়েদের পরম রূপসী করে তোলে। মেয়েটার সেই বয়স। সে ভুল করেনি। সি-বিচ থেকে যখন সবাই ফিরে যায়, তখন এমন বয়সের মেয়েকে একা নামতে দেখলে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। চোখ দেখে মনে হয়েছিল, কোথাও বড় রকমের শূন্যতা আছে। বেঢপ মানুষটা তার সম্পর্কিত কেউ, অথচ উদ্বেগ কম—যেন স্বভাব জানাই আছে, সময় হলেই চলে আসবে। সে কাল অনুসরণ করে প্রথম ভেবেছিল, টিলায় বসে মেয়েটি সমুদ্র গর্জন শুনতে ভালবাসে। কিন্তু পরে সে অবাক হয়ে গেছে দেখে বেঢপ লোকটি ঠিক নেমে আসছে। কাউকে খুঁজছে। সরল বলেছিল, ওদিকটায় আছে। আর একটু এগিয়ে যান।

বেঢপ লোকটিকে দেখার আগে তার আরও এক ধরনের উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল প্রথম রাতে। সাদা জ্যোৎস্না, বালিয়াড়ি আরও সাদা। অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ। এতটুকু কুয়াশা ছিল না। হেমন্তের সময়। কুয়াশা জমতেই পারে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। মেয়েটা যদি সমুদ্রে ভেসে যেতে চায়। এমন সুন্দর সময়ে মেয়েটা সমুদ্রে ভেসে যেতে চায় কেন! কোন দুঃখ টুঃখ যদি থাকে। সে দূরে বসে অদৃশ্য গোপন জায়গা থেকে পাহারা দিচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না, এমন কেন হয়। একদিন মাত্র সারাদিন বাসে মেয়েটিকে দেখেছে কোথায় থাকে, কি নাম, এমন কি

বাঙালী কিনা তাও জানে না। তবে খণ্ডগিরিতে ওর কথা না বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসত না। সে একবার কাছে গিয়ে বলবে ভেবেছিল, এত রাতে এখানে আপনার একা বসে থাকা ঠিক না। বিচ খালি হয়ে গেছে। কিন্তু সে পারেনি। পারেনি এই জন্য নয় যে তার সাহস কম। আসলে মেয়েটির হয়তো কোন দুঃখই নেই। কাছে গেলে হয়তো শুনতে পাবে গুন গুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। কিংবা কেউ তার কাছে ভিতে পাহারাদার রেখেছে। খুব বেশি গায়ে পড়া ভাব কেউ দেখাবে ভেবেই দূরে অলক্ষ্যে লক্ষ্য রেখেছে। বেঢপ লোকটি নেমে আসায় সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

গতকালও সে গেছিল। ওর মনে হয়েছে, মেয়েটা ঠিক একটা কিছু করে বসবে। বেঢপ লোকটি প্রায় জোর করেই টেনে তুলে নিয়ে গেছিল। সে কিছুটা দূরে—সেখান থেকেও দুজনের কথা কাটাকাটি কানে এসেছে। আবছা অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল না। দেখলে মনে হবে কেউ একটু বেশি রাতে খুব বেশি সমুদ্রের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক ঘুম পাচ্ছে না। অথবা হজমের গোলমাল আছে এমনও ভাবতে পারে। বেঢপ লোকটি প্রায় টানতে টানতে তুলে নিয়ে গেছিল তাকে।

আজ কি সে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ? ভয় পেতে পারে। সে বিকেলেই খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে, এখানে কোন ছিনতাই হয় না। কিংবা কোন দুষ্কৃতকারীও হানা দেয় না। পর্যটকদের জন্য সরকার সব সময় নজর রাখে। দুর্ঘটনা যে ঘটে না তা নয়, তবে সেটা একান্তই দৈব বলে ধরে নেওয়া হয়। গত বছরই এক জোড়া যুবক যুবতী সাঁতার কাটতে গিয়ে চোরা স্রোতে ভেসে গেছিল। অনেক দূরে তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছিল। এ ছাড়া তিন চার বছরের মধ্যে কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর নেই। তবু তার মনে মেয়েটিকে নিয়ে এত বেশি সংশয় এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না। নিজেকে বড় তার অসহায় লাগছিল।

তবু দুর্ঘটনা কেন ঘটে কেউ বলতে পারে না। বাসে মেয়েটিকে চুপচাপ থাকতে দেখে এবং চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ে কিছু একটা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। না হলে বেড়াতে বের হয়ে এমন উদাসীন থাকা, কিংবা শোকটোক পেতে পারে। সে বাসে ভ্রমণের সময়ই মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে, খুব কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। খুব কাছে গেলেই মনে হয়েছে, মেয়েটির বয়স খুবই কম। সবেমাত্র বালিকা থেকে তরুণী হয়েছে। আশ্চর্য কচি মুখ আর শরীরে বিস্ময়কর লাবণ্য। খুব লক্ষ্য করার সময় শুধু একবার কেন জানি মনে হয়েছিল, মেয়েটির রাতে ভাল ঘুম হয় না। অথবা কখনও নিশি জাগরণে ক্লান্তি চোখের নিচে যে লেগেছিল, তা এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি।

সরল নিচে নেমে হোটেলের গেটে এসে কি ভাবল। সিগারেটের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছে। সে একবার চোখ তুলে সি-বিচে দেখল, মেয়েটি ক্রমশঃ ছায়ার মতো জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে। চোখের আড়ালে না চলে যায়, ওপরে উঠে প্যাকেটটা নিয়ে আসার ফাঁকটুকুর মধ্যে যদি অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভেবে সে আর উপরে উঠে গেল না। কফি কাউণ্টার খোলা। রাস্তায় জোর আলো। সে ভাবল, ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সিগারেট কিনে নেবে। একবার তার নিজের ব্যালকনিতে চোখ গেল। এভাবে তিনদিন ধরে সরল কোথায় যায় সঙ্গীদের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিতে পারে। তারা গোপনে জানলায় দাঁড়িয়ে তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি রাখতে পারে। কিন্তু দেখল, না নেই। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে তার দোতালার ঘরে। সঙ্গীরা শুয়ে আছে বলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওরা আলোটা জ্বালা রেখে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে।

সরল কয়েক-পা এগিয়ে ফের দেখল—না হারিয়ে যায়নি। মেয়েটা খুব ধীর পায়ে হাঁটে। কোনো অসুখ বিসুখ নেইত! কেমন মুহ্যমান এক ভঙ্গী চলাফেরায়। আসলে সে যে একটা আকর্ষণে পড়ে গেছে বুঝতে পারছে। কোন পরিচয় নেই, কথা নেই, অথবা

নীরব চোখের কোন আহ্বান নেই, তবু কেন যে সে পাগলের মতো মেয়েটিকে অনুসরণ করছে। আসলে সে জানতে চায় বেঢপ লোকটির সঙ্গে মেয়েটির কি সম্পর্ক। সে তার বাবা যদি হয় খুব বেমানান। যদি মামা কিংবা অন্য কেউ হয়—মেয়েটির সঙ্গে আর কেউ নেই। কোন শোক টোক পেলে বাবাই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বের হন। অথবা মা মাসি। এ ক্ষেত্রে শোকটোকের কথা ভাবলে, লোকটিকে মেয়ের বাবাই ধরে নেওয়া ঠিক। কিন্তু একজন বাবার পক্ষে এ ভাবে বাসে নিশ্চিন্তে উঠে আসা যেন বেমানান। মেয়েটি কোথায় গেল, আসছে না কেন, এইসব চিন্তায় যে কোন বাবার পক্ষেই অধীর হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে কোন অধীরতার লক্ষণ লোকটির মধ্যে ফুটে উঠতে দেখেনি। আসলে মানুষের কাজ-কর্মের মধ্যে কতরকম যে রহস্যজনক বিষয় গোপনে খেলা করে বেড়ায়। সেও সেই রহস্যজনক এক ভয়ে কদিন থেকে কেমন কাতর হয়ে আছে। পৃথিবী থেকে এমন এক নবীন সন্ন্যাসিনী সব ছেড়ে চলে যাবে ভাবতে কষ্ট লাগছিল।

সরল নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে নিজের সঙ্গে কথোপকথনে। মেয়েটিকে সে নবীন সন্ন্যাসিনী ভাবছে কেন! সে যে কত বাজে চিন্তা করতে ভালবাসে এটা তার প্রমাণ। মেয়েটি মরে যেতে পারে, সমুদ্রের ধারে তরুণীর লাস, হৈ চৈ, পুলিস—এ-সব চিন্তা ভাবনা তাকে অযথা কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় কেন?

সে দেখল মেয়েটি টিলার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সরল হেঁটে যাচ্ছিল। এখনও জোড়ায় জোড়ায় ইতস্তত কিছু রোমান্টিক জুটি বসে আছে। তার কেউ যখন হবে সে ভাবল, তাকে নিয়েও সে এ-ভাবে বসে থাকবে। কারণ পৃথিবীর সময় মানুষের কাছে বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। স্বপ্নের এক জীবন থাকে মানুষের সে সেখানে বার বার যেতে চায়। কিন্তু সাংসারিক দায়িত্ব তাকে কিছুটা নির্মোহ করে রেখেছে। সে আজ পর্যন্ত এই দায়িত্বের কথা ভেবে কাউকে মন দিতে পারল না। দূর থেকেই দেখা, ভাল লাগা এই পর্যন্ত। অনীশের শালী এক সময় একটু নাছোড়বান্দা

হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দায়িত্বের কথা শুনে সটকে পড়ল। বিধবা বড়দি বোনপো, বাবা এবং ছোট দুই বোন—উপার্জনক্ষম মানুষ সংসারে সে একা মাত্র। সে হুট করে কিছু করতে পারে না।

সরল দেখল সেই টিলার খুব কাছাকাছি এসে গেছে। আসলে মানুষের মস্তিষ্কটি বড় বেয়াড়া, কোথা থেকে কি চিন্তা কোষের মধ্যে ঢুকে সুড়সুড়ি দিতে থাকবে কেউ আগে টের পায় না। এই যেমন সে সারাক্ষণ নিজের সঙ্গে কথা বলে নিল। কে বলবে সে যাচ্ছে সেই মেয়েটির খোঁজে। আজ একটু কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ভাবল। যদি সেই বেঢপ লোকটা আসে, কি বলাবলি করে শুনবে। তখনই কে যেন বলল, এত কৌতূহল থাকা ভাল না।

সে আবার কথোপকথন শুরু করল নিজের সঙ্গে।—ভাল মন্দ বুঝি না। মেয়েটির বনদেবীর মত অবয়ব আমাকে টানছে।

—কতদূর যাবে ?

—এই একটু কাছাকাছি।

—কোন সুঘ্রাণ পেতে চাও।

—বোধ হয়।

—জীবনে কোথাও কোন সুঘ্রাণ বেশিক্ষণ থাকে না। বাতাসে উড়ে যায়।

—যতক্ষণ থাকে, জীবনের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিকে অবজ্ঞা করতে নেই।

এ-সব সময় সরল সব সময় নিজের পক্ষে কথা বলতে চায়। বোধবুদ্ধি এবং বিচারের চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করে। সে মেয়েটিকে দেখার পর এক ধরনের আবেগ বোধ করছে।

সরল দেখল, ঝাউগাছগুলোর কাছে এসে গেছে। ঝাউ-বাগানটা পার হলে বিশাল একটা বাড়ি। বাড়ির মাথায় একটা আলো। আলোর ফোকাস অনবরত ঘুরছে। এদিকটায় ঘুরে এলে বেলাভূমি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে দাঁড়িয়ে একা একা সমুদ্র দেখছে স্পষ্ট দেখা যায়। ফোকাসের আলোটা টিলায় পড়ে না। সামান্য দূর দিয়ে

ঘুরে যায়। আর একটু নেমে এলেই মেয়েটিও বিদ্যুৎ ঝলকের মত স্পষ্ট ভেসে উঠত। বোধহয় দূরের রহস্যময় আলোয় মেয়েটি ক্ষণিকের জন্যও উদ্ভাসিত হতে চায় না। সে এ-জন্য ভারি বেদনাবোধ করল। দিনের বেলায় ঐ একদিন বাদে আর দেখা হল না। সে যে রাতে এ-ভাবে মেয়েটিকে অনুসরণ করছে—অস্পষ্ট ছায়ার মত পাশে পাশে থাকার চেষ্টা করছে, জানলে কি না জানি ভাববে। সে আর এগুতে সাহস পেল না।

ক্রমে বেলাভূমি নির্জন হয়ে এল। লোকটা তো আসছে না। লোকটা কি এ-সময় মাতাল থাকে। গত দু'দিনই সে ওকে দেখেছে ঠিক, খুব কাছ থেকে না হলেও দশ পনের গজ দূর থেকে—তবে মাতাল কিনা টের পায়নি। বালিয়াড়িতে হাঁটতে পেলে এমনিতেই পা টেনে হাঁটতে হয়। স্বাভাবিক হাঁটা কেউ হাঁটে না। হাঁটতে পারে না। বালিতে অনেকটা পা ডুবে যায়। পায়ে হাওয়াই চপ্পল থাকলে আরও অসুবিধা। বালির ভেতর চপ্পলকে যেন সেঁটে ধরে। সুতরাং লোকটি মাতাল থাকলেও বালিয়াড়িতে হেঁটে গেলে ধরা যাবে না।

সে যখন এ-ভাবে অন্যমনস্ক, তখনই মনে হল পাশে দাঁড়িয়ে কেউ ডাকছে, এই শুনছেন?

সে আচমকা কেমন ভয় পেয়ে গেল। সেই মেয়েটি। একেবারে সমুদ্রের কিনারায় নেমে এসেছে।

সরল কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বলল—আমাকে বলছেন?

—তবে কাকে?

—সেই তো। বলুন। সরল যেন সত্যি একজন অপরিচিতার সঙ্গে কথা বলছে।

—আপনি রোজ এখানে এসে দাঁড়ান কেন বলুনতো!

সরল বুঝতে পারল, সে ধরা পড়ে গেছে। ফোকাসের আলো থেকে মেয়েটি ঠিক চিনতে পেরেছে।—রোজ না তো।

—রোজ।

সে কি আর বলে! দায়সারা গোছের অথচ কিছুটা দার্শনিক গলায় জবাব দিল—সমুদ্র আমাকে টানে।

—আমাকেও।

বলে কি! ভাব সে যা ভেবেছে, মেয়েটি তাই করতে চায়। তার বলার ইচ্ছে হল, কি দুঃখ তোমার মেয়ে। কিন্তু সে এতটা কাছের না যে এ-ভাবে বলতে পারে। গত দুদিন ধরে যে কথাটা মেয়েটিকে বলবে বলে বার বার ভেবেছে, এ-মুহূর্তে তা তার মনে এল না। আপনি একা এ-ভাবে বসে থাকবেন না। হোটেলে ফিরে যান। অজানা জায়গা, আমার কেমন আপনার এ-ভাবে বসে থাকা দেখে ভয় ধরে গেছে—এমন কথা সে যে কতবার শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। দিনের বেলাতে যদি কোথাও দেখাদেখি হয় এই আশায় টো টো করে রোদে এই সি-বিচ, এবং দোলো মণ্ডপ সাহি সহ বি এন আরের হোটেল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। ছোট্ট জায়গা। ট্যুরিস্টে ভরে যায় এ-সময়টাতে। যে কদিন তারা থাকে সকাল বিকাল সি-বিচে হেঁটে বেড়ায়, না হয় সমুদ্রে স্নান করে। গত দু'দিনে একবারও চোখে পড়েনি, কোথাও দেখা হয়নি। সরল কি ভেবে বলে ফেলল—সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন?

—কী হয় ডুব দিলে?

—এখানে এলে সমুদ্রে স্নান করতে হয়।

—না করলে কি হয়? কেমন বালিকার মত প্রশ্ন।

—কী হবে আবার। এক এক জায়গায় শুনেছি এক এক রকম মাহাত্ম্য। এখানটায় এলে যেমন মন্দির দর্শন করতে হয়, সমুদ্রে স্নানও করতে হয়। স্নানটা ভারি মজার।

—আপনি করেছেন?

—করেছি। সরলের বলার ইচ্ছে হল—শুধু করেছি বললে ভুল করা হবে, স্নান করতে করতে শুধু লক্ষ্য রেখেছি আর একজন আসে কিনা? সে বলল—আপনারা কোথায় উঠেছেন?

ঐ যে সামনের বাড়িটা। নাম জানি না।

—এ কেমন মেয়েরে! হোটেলে উঠেছে, নাম জানে না। সে অবাক হয়ে গেল। তারপর মনে হল, এ মেয়ে তো আর স্বাভাবিক নেই। সে কার সঙ্গে কথা বলছে কে জানে। সে তবু বাজিয়ে দেখার জন্য বলল—আপনার সঙ্গের লোকটা কে?

—সঙ্গের লোকটা!

—ঐ যে বয়স্ক মানুষ! গোঁফ আছে।

—ওহ আমার বমি পাচ্ছে। কেন যে আপনি লোকটার নাম বললেন।

সে বুঝল ওর সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলা ঠিক না। যারটা সে বুঝবে। তার কি দায় পড়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেবার। সে পা বাড়াবে ভাবল। কিন্তু কেন জানি পা উঠল না। সি-বিচের বালিয়াড়িতে পা বড় বেশি ঢুকে যাচ্ছে। সে টেনে টেনে একটা পা তোলার চেষ্টা করল। আর তখনি মনে হল, সে এখানে আসে মেয়েটিকে সাবধান করে দিতে। এত রাতে একা বসে থাকা ঠিক না। যতই জায়গাটা নিরাপদ হোক, এমন একজন মেয়ের পক্ষে এত রাতে সি-বিচে একা একা বসে থাকা ঠিক না। সে বলল এবারে যান। অনেক রাত হয়েছে।

মেয়েটি কিছু বলল না। সে তার আগের কথাতেই স্থির হয়ে আছে।—লোকটাকে চিনে ফেলেছেন।

—না চিনিনি। তবে আপনার সঙ্গে দেখেছি। এই জন্য বলা। ভেবেছিলাম আপনার বাবা বোধহয়।

—বাবা!

এমন স্বরে কথাটা বলল মেয়েটা যেন তাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। অথবা মনে হল বাবা বলে মানুষের কেউ থাকে মেয়েটি তা জানেই না। সে বলল—তিনিই তো আপনাকে নিয়ে যান।

—কেন নিয়ে যায়, কেন কেন! কেমন আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। সরল একটা গভীর গাড্ডার মধ্যে যেন ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে। পা তুলতে পারছে না, ফেলে চলে যেতে পারছে না।

কথা বললে, মেয়েটি এখন আরও সব কথা বলবে যা তার জীবনের ক্ষেত্রে বেমানান। সে ছাপোষা মানুষ। ভাল মানুষের যে-সব গুণগুলি থাকে, বন্ধুরা তাকে তেমন গুণাবলীর মানুষ ভেবে থাকে। সে বলল—চলুন আপনাকে দিয়ে আসি।

আপনারা কেউ কিছু জানতে চান না। কার কাছে যাব। কেমন হাহাকার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সরল ভাবল, সে কেন তার সব কিছু জানতে চাইবে! আবার ভাবল, সে তো সব জানার জন্য দেখার পর থেকেই ছটফট করছিল। মেয়েটি কি একবার খণ্ডগিরিতে চোখ তুলে দেখেই টের পেয়েছে, এই সেই মানুষ যাকে সব বলা যায়। মনে হল মেয়েটি সম্পর্কে সে একটু বেশি দুর্বল বলে এতটা ভাবছে! সে এদিক-ওদিক তাকাল। যদি লোকটা মেয়েটিকে খুঁজতে আসে।

তখনই মেয়েটি খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল।—ভয় নেই। আমাকে কেউ খেয়ে ফেলবে না। আমি একা আছি ভাববেন না। খোঁজাখুঁজি না করলেও চলবে।

আসলে সেই ফোকাসের আলোয় তার মুখ চোখ মেয়েটির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে তো সেই লোকটাকেই এখন মনে মনে খুঁজছিল। তিনি এসে তাকে নিয়ে গেলে সে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারত। তাও মেয়েটি কত সহজে টের পেয়ে যায়। মেয়েরা বোধহয় একটু বেশি বোঝে।

আর তারপরই সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। মেয়েটি বলছে, আপনি রোজ কেন নেমে আসেন! কেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি লেখাপড়া শিখিনি বলে বুঝি কিছু বুঝি না। কেন কেন?

সরল আর নিজেকে গোপন করতে পারল না। সে ধরা পড়ে গেছে। সে একটু কি ভাবল। তারপর বলল—আমার কেন জানি মনে হয় আপনি সমুদ্রে ভেসে যাবেন বলে বসে আছেন। সেই ভয়ে পাহারা দিচ্ছি।

হাহাকার হাসি। ও মা কি বলে, আমি নাকি সমুদ্রে ভেসে যাব বলে বসে আছি। ও বাবু তোমার এই আদিখ্যেতা কি করে হল গো।

সরল টের পেল, মেয়ে যতই তরুণী হোক, পেকে ঝানু। একে নিয়ে তার কিছু করার নেই। সে হাঁটা দিল।

—ও বাবু শুনুন।

সরল থামল না। হাঁটতে থাকল।

আর তখনই দেখল, হুপ করে সেই বেঢপ লোকটি বালির চড়ায় কোথা থেকে যেন ভেসে উঠল।

মেয়েটি পরিত্রাণ পাবার মত সরলের পিছু নিয়েছে। বেঢপ লোকটি রাস্তা আটকে দিল। বলল—কোথায় যাচ্ছিস রিন্টি। তোর মা সেই থেকে বসে আছে।

তবে মেয়েটির নাম রিন্টি। সে লোকটিকে বলল—রিন্টির মাথা খারাপ আছে? ওকে এভাবে ছেড়ে দেন কেন! তারপরই মনে হল এ-সব কথারও কোন মাথামুণ্ডু নেই। রিন্টির স্বাভাবিক আচরণ না থাকলেও, খুব কিছু অস্বাভাবিক কথা বলেনি। বরং সেই মাথা খারাপ করে তিন তিন রাতে রিন্টিকে অনুসরণ করেছে। মানুষের কার যে কোথায় কি লাগে—মা ডাকছে শুনে তার আগেকার হিসাবটা গোলমাল হয়ে গেল। মার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। একা রাত হলে চলে আসে। বেঢপ লোকটি নিয়ে যায়—এ কেমন রহস্য সরল বুঝতে পারে না। রিন্টি লোকটির হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে উদ্ধার করে ছুটছে। তারপর তার একেবারে পায়ের কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বলছে, ওরা এখন আমাকে নিয়ে যাবে বাবু। আমার বড় কষ্ট বাবু। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

সরল থ'। রিন্টি বলে কি! দু হাঁটু জড়িয়ে নতজানু রিন্টি। সে তার কে! কেন এ-ভাবে যে-কোন গাছ পেলেই অবলম্বন খুঁজতে চায়। সরল বুঝ দেবার মত বলল, ঠিক আছে নিয়ে যাব। এখন হোটেলে ফিরে যাও।

বেঢপ লোকটি বড়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সরলকে ধন্যবাদ জানাল। রিন্টি আর একটা কথা বলল না। মাথা নিচু করে রাস্তার দিকে উঠে যেতে লাগল।

সরল লোকটিকে বলল—কি হয়েছে ওর ?

—কিছু না। কিছুটা এড়িয়ে যাবার মত চলে যেতে চাইলে, সরল নাছোড়বান্দা হয়ে লোকটির পিছু নিল। লোকটির সব কিছু সে আর একবার পরখ করে দেখবার জন্য ডাকল, শুনুন।

লোকটি বলল, পরে। ও চলে যাচ্ছে।

সরল কোথা থেকে জোর পেয়ে, যেন বলল—রিন্টি ঠিক যাবে। আপনি শুনুন।

সরলের গাম্ভীর্যে বোধ হয় লোকটা নাড়া খেল। সে আর আগের মত এড়িয়ে যেতে পারল না। ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

—আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?

—কলকাতা থেকে।

—রিন্টি আপনার কে হয় ?

—খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

সরলের মনে হল সে খুব বাড়াবাড়ি করছে। কার কোথায় খুঁটি শক্ত করে বাঁধা আছে সে জানে না। গায়ে পড়ে একটা উটকো ঝামেলায় না জড়ানোই যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ। সে আবেগে একটু বেশি বোকামির প্রশ্রয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে বলল—এমনি জানতে চাইছিলাম। সেই থেকে মনে হয়েছে মেয়েটা কোন একটা কিছু করে বসতে পারে। আপনারা সাবধানে থাকবেন।

লোকটি হাঁ বা হুঁ কিছু বলল না। সরলও কিছু আর না বলে সোজা হোটেলের দিকে হাঁটা দিল। একটু দূরে দেখল, রিন্টি দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছে। সমুদ্র, বালিয়াড়ি, নীল আকাশ, অজস্র নক্ষত্রমালা, আর ঝাউয়ের বন মিলে কেন জানি রিন্টির জন্য তার ব্যাকুলতা বেড়ে গেল। সে হোটেলে ফিরে ভাবল, সঙ্গীদের সব বলবে। বলবে এক দীর্ঘাঙ্গী:লাবণ্যময়ী সমুদ্রের জলে ভেসে যাবার

জন্য বসেছিল। আমার কথায় সে হোটেলে ফিরে গেল। মেয়েটা যতই সব কিছু অস্বীকার করুক, অমন মুখ চোখের মেয়ের সমুদ্রে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। মেয়েটির জন্য আশ্চর্য বেদনায় বুক কেমন তার ভার হয়ে এল।

॥ দুই ॥

বিষ্ণুর খাটটা বাথরুমের দিকে। বাথরুমে কাউকে যেতে হলে ওর মশারির দড়িটা একটু তুলে যেতে হয়। ওরা তিন সঙ্গী বেড়াতে এসেছে। সরল এই কিছুক্ষণ আগে ফিরল। দরজা বন্ধ করে বাথরুমে যাবার জন্য দড়িটা ঠেলে তুলতেই তাব ঘুম ভেঙে গেল। জানালা খোলা। রাস্তার এবং হোটেলের বাইরের আলোগুলি জ্বালা। ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেও সব স্পষ্ট দেখা যায়। বিষ্ণু গৌরের সঙ্গে এক সময় গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাড়ে দশটা বাজে সরলের দেখা নেই। কোথায় যায়। একবার ভেবেছিল বেরিয়ে দেখবে। সি-বিচ খালি, কেউ নেই। আসলে ওরা মনে করে সরলের মধ্যে একটা কবি মানুষ বাস করে। এখানে আসার পরই সমুদ্রের ভালবাসায় পড়ে গেল। ঘরে এক দণ্ড বসে থাকতে পারে না। কিছু বললেই বলত, সমুদ্র দেখছি। তার বিস্ফারিত চোখ, তার প্রশস্ত ডানা, আর সুদীর্ঘ ছবি। নীল এক ভূখণ্ড আবিষ্কার করে আমি নিজের মধ্যেই নিজে মজে গেছি।

সেই সরল বাথরুমে ঢুকে মনে হল চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। তারপর আর কোন শব্দ নেই, একবার হাত থেকে মগ পড়ার শব্দ হল, আবার চুপ। তারপর দরজা খুলে বের হল। জগ থেকে এক গ্লাস জল ভরে ঢক ঢক করে খেল! এবার শুয়ে পড় বাপ, বিষ্ণু ঘুম কাতুরে চোখেই কোনরকমে তাকিয়ে এমন ভাবল। চোখে ফের ঘুম এসে লাগতেই খুট খুট শব্দে তা ভেঙে গেল। করছেটা কি! সে মশারির নিচে উঠে বসল। সে যে জেগে গেছে সরল লক্ষ্য করছে না। বড় এ্যাটাচিটা টেনে বের করছে। তারপর সেই

বাক্সটা। যার মধ্যে সরল বলে থাকে তার প্রাণ-ভোমরা ভরা আছে। ওরা হাওড়া স্টেশনে হাতে ওটা দেখে বলেছিল, কি ব্যাপার, সঙ্গে এটা!

— যাচ্ছি যখন নিয়ে যাচ্ছি।

—কোথায় উঠব ঠিক নেই, হোটেল পাই কি না, বেড়াতে বের হলে যত হাল্কা থাকা যায় ততই ভাল।

সরল সামান্য হেসে বলেছিল—খুব বাড়তি মনে হচ্ছে! দেখবি কাজে লাগবে।

—আমরা ভাই অরসিক। খাব দাব ঘুমাব, চুটিয়ে আড্ডা। আর মাঝে মাঝে তিনজন মিলে উধাও হয়ে যাব।

সরল বিষ্ণুকে বলেছিল—কার সঙ্গে!

বিষ্ণু বলেছিল—সেই। শালা এমন গেঁড়াকলে আটকে গেলাম মন উধাও হতে চাইলেও কে পেছন থেকে যেন লেঙ্গি মারে। আসলে বিষ্ণু তার বৌর কথা বলতে চেয়েছিল। সরল বলেছিল-—নিয়ে এলেই পারতিস। তুই ফুর্তি লুটতিস, আমরা সঙ্গ পেতাম। সরল এমনভাবে কখনও কথা বলে না। তবে বেড়াতে বের হলে সবাই বোধহয় মনে মনে সামান্য আলগা হয়ে যায়। ফলে কথাটা বিষ্ণুর কাছে খুবই নির্দোষ ঠেকেছিল। সে বলেছিল, আর বলিস না, ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা স্কুল খুললে। রিকস্ নিচ্ছে না। আমার মনোরঞ্জনের চেয়ে ওর কাছে ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষাটা বেশি।

বিষ্ণু জানে, সে এদের মধ্যে একটু বেশি বয়সের। সেই বিয়ে করেছে, অন্য দুজন এখনও সে পাটে বসেনি। সরল সবচেয়ে জুনিয়ার। দিনকে দিন দুর্দান্ত হয়ে উঠছে দেখতে। লম্বা উঁচু শরীর। প্রকাণ্ড কাঁধ। একটাই খুঁত, মাথার সামনের দিকটায় সামান্য ফাঁকা হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে এই ফাঁকাটুকু বিষ্ণুর মনে হয়, কবির উদাসীনতায় ঢাকা। সরলকে তখন প্রকৃতই সুপুরুষ ভাবা যায়। সেই সরল তার বেহালার বাক্সটা হাতে নিয়ে হাজির হলে, গৌরও ছেড়ে কথা বলেনি।—কিরে মেয়ে ধরার ফাঁদ সঙ্গে লটকে নিলি?

সরল বলেছিল, নারে, ভাবলাম সমুদ্র দেখব, সমুদ্র আমাকে দেখবে না। ভাবলাম যখন যাচ্ছিই সঙ্গেরটা সঙ্গে নিয়ে যাই। তোরা যখন আড্ডা দিবি সমুদ্রের ধারে, আমি একটু বেহালা বাজাব।

বিষ্ণু জানে এ তিন চারদিন ওরা খুব না ঘুরলেও সরল খুব ঘোরাঘুরি করেছে। একবারও ওর বেহালাটার কথা মনে হয়নি। বেহালার চেয়ে প্রিয় কিছু কি সে আবিষ্কার করেছে এমন তারা ভাবত। বেহালাটা সঙ্গে আনাই সার হয়েছিল। ওদেরও তেমনভাবে যন্ত্রটার কথা যে খুব মনে পড়েছে তাও না। আজ এই রাতে বাক্সটা টেনে বের করতেই সে অবাক হয়ে এসব ভাবছিল।

কিন্তু আশ্চর্য আজ সরল কেমন এক যেন নিমগ্ন মানুষ। সে জানালার পাশে গেল। কি দেখল। তারপর ব্যালকনির দরজাটা খুব আস্তে খুলল। কারো ঘুম ভেঙ্গে না যায় এমন সন্তর্পণে। তার মশারির নিচ থেকে দরজাটা খোলা দেখা যায়, কিন্তু ব্যালকনিটা দেখা যায় না। ওখানে দুটো বেতের নীল রঙের চেয়ার থাকে। সরল এত রাতে ওখানে গিয়ে কেন বসল বুঝতে পারছে না। বিষ্ণু একবার ভাবল ডাকে। ডাকলেই গৌরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে গৌর ভীষণ ক্ষেপে যায়। ধীরে ধীরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু কথা বলাবলির সময় শব্দ হবেই। খুটখাট আওয়াজ যে না হয়েছে এতক্ষণ তা নয়—তবে সমুদ্র গর্জনে খুব একটা বোঝা যাবার মতো নয়। তাছাড়া সরলও বিরক্ত হতে পারে।—তুই গোয়েন্দাগিরি করছিলি! আমি কি করছি না করছি দেখছিলি। এ সবের পরই মনে হল, ওকি বেহালাটা এখন বাজাতে শুরু করবে। মাথা খারাপ নাকি। বোর্ডাররা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সমুদ্রে অশান্ত গর্জন, আর সঙ্গে বেহালায় রাগের খেলা—কেউ জেগে নাও যেতে পারে। জেগে গেলে মনে হবে, দূর থেকে সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে কোন করুণ স্বর ভেসে আসছে। এতে করে ঘুম ভেঙ্গে যাবার বদলে কোন নতুন স্বপ্নের মধ্যে বোর্ডাররা ডুবে যেতে পারে! এসব ভেবে বিষ্ণু কি করবে ঠিক করতে পারছিল না।

বিষ্ণু আর পারল না। মশারি তুলে স্লিপার খুঁজল। কিন্তু আশ্চর্য অনেকক্ষণ হয়ে গেল সরলের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হাহাকার বাতাস বইছিল, তবে উত্তুরে হাওয়া। ওদের জানালার পর্দা বেশি নড়ছে না। হাওয়াটা বারান্দার দিকের দরজায় বরং মাঝে মাঝে জোর ধাক্কা মারছে। আর সব চুপচাপ।

পায়ে পায়ে বড় বেশি বালি ঘরে ঢুকে যায়। মেঝেতে খালি পা পড়লেই গা বড় শিরশির করে। সে স্লিপার না গলিয়ে সন্তর্পণে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। দেখল, কোন বড় মিউজিসিয়ানের মতো বেহালাটা এক হাতে ঝুলিয়ে অন্য হাতে ছড় উঁচু করে রেখেছে সরল। সে কেমন ভয় পেয়ে গেল।

বিষ্ণু কাছে গিয়ে প্রায় ঠেলে দিল। বলল—এই সরল এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

—হুঁ।

—ছড় তুলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

—অঃ।

—অঃ মানে !

সরল নিজের মধ্যে কিছুটা ফিরে এল। সত্যি তো সে এভাবে দাঁড়িয়েছিল কেন ? তারপর মনে হল সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সে একটা কিছু বাজাবে ভাবছিল। কিন্তু সোঁ সোঁ আওয়াজে বালিয়াড়িতে বার বার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সে কোন ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

—তোর হয়েছে কি !

গৌর জেগে গেছে। বিদেশ জায়গা। কত রকমের ঘটনা ঘটতে পারে। এত রাতে ব্যালকনিতে বিষ্ণু কাকে কি যেন বলছে !

গৌর বলল—তোরা কি করছিস ? একটু ঘুমোতে দিবি না

কিন্তু সরলকে দেখে আর কিছু কথা মুখে জোগাল না।

বিষ্ণু বলল—সরলের কিছু হয়েছে ?

সরল এবার কেমন রুখে দাঁড়াল।—ধুস। কিছু হয়নি।

বিষ্ণু ভেতরে এসে আলো জ্বেলে দিল।

সরল ব্যালকনিতে বসে পড়েছে। সে আসছে না। বলছে—তোরা যা ঘুমোগে।

গৌর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল—তুই কি মনে করিস আমরা কিছু বুঝি না ?

—বোঝাবুঝির কি আছে ?

—রাতে কোথায় যাস ? এত রাতে কোথা থেকে ফিরিস ?

—আর বলিস না। সরল এখন আগেকার সবল। একটা কাণ্ড হয়েছে আজ।

বিষ্ণু বলল—কাণ্ড !

—হ্যাঁরে।

গৌর বলল—কিছু হবে একটা জানতাম।

—আরে তেমন কিছু না।

বিষ্ণু বলল—তেমন না হলে কেউ পাগলের মত এত রাতে হাতে বেহালা ঝুলিয়ে মাথার উপর ছড় তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

—শোন না। সরলের মনে হল, ওদের সবটা খুলে বলা দরকার। সে বলল—ভিতরে চ, ওরা ভিতরে এসে সেণ্টার টেবিলটার তিনপাশে তিনটি চেয়ারে বসে পড়ল। মাথার উপর একটা নীল আলো জ্বলছে। সমুদ্র থেকে তেমনি সোঁ সোঁ আওয়াজ আসছে। দূরে তেমনি সমুদ্রের ব্রেকার ভাঙার রূপালি উজ্জ্বল রেখা।

সে সবই খুলে বলল।

গৌর বলল—গণ্ডগোলে ব্যাপার।

বিষ্ণু বলল—তুমি আর যাবে না।

—না যাচ্ছি না। কিন্তু জানিস, মেয়েটার জন্য আমার কেমন মায়া পড়ে গেছে। বলার সঙ্গে সঙ্গে, মেয়েটা মাথা নিচু করে হোটেলের দিকে ফিরে গেল।

—আমাদের হোটেলে উঠেছে ?

—না রে? পুরানো ভাঙ্গা রাজপ্রাসাদের মত একটা বাড়ি আছে না, ওর পাশে। কাল একবার যাবি?

গৌর বলল—কেন?

—না এমনি। আমার কথায় উঠে গেল। কিছু একটা হলে!

—হলে তার তুই কি করবি। যার পাঁঠা সে ইচ্ছে করলে ল্যাজে কাটতে পারে। ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই। ওর মাও তো এয়েছে শোনলাম।

আসলে সরল জানে জীবনে কোন নারী এভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। এই আত্মসমর্পণই তার মধ্যে কেমন ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। তার সব সময় মেয়েদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকার স্বভাব। নারীর সৌন্দর্য সে ভোগ করে দূরে দাঁড়িয়ে। এই প্রথম এক নারী ওর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসেছিল। কি দুঃখ তার সে জানে না। খারাপ লাইনের মেয়ে ভাবতেও কষ্ট হয়। বিষ্ণু গৌর সব শুনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেউ ওকে নিয়ে এই সমুদ্র তীরে ফুর্তি করতে এসেছে।

সরল বলল—লোকটা তো বাপের বয়সী।

গৌর বলল—শালা ঠিক দালাল।

বিষ্ণু বলল—মেয়েটার নাম কিরে?

—রিন্টি।

—লাইনের মেয়ে। তুমি একদম যাবে না আর।

বিষ্ণু শাসনের গলায় কথা বললে, তুমি তুমি শুরু করে দেয়।

সরল জবাব দিল না। কারণ সে ঠিক করেছে কাল যাবেই। সে বলল—বাচ্চা মেয়ে। তারপর বলতে চেয়েছিল, নারীর এমন ছবি আমি আগে আর দেখিনি।

—বার বছর বয়স হলে মেয়েরা আর বাচ্চা থাকে না।

—তার মানে!

তোমার বৌদির সঙ্গে তার দশবছর বয়স থেকেই আমার আলাপ।

গৌর বলল—অভিজ্ঞতা থেকে বলছিস?

—বিষ্ণুচরণ অভিজ্ঞতা ছাড়া কথা বলে না।

—তাহলে সরল এখন শুয়ে পড়। কাল আমরা ঝাউবনটায় যাব। ওদিকটায় লোকজন চলাচল কম। ছন্দটা মেলাতে পারিস কিনা দেখবি। এখানে এসে তোমার জীবনের ছন্দ কেটে যাবে সে হতে দেব না। আমরা সমুদ্র দেখব, আর তোমার বাজনা শুনব। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী, শুনব।

সরল আর একটা কথাও বলল না। মশারি তুলে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না।

দূরে কেউ যেন কাঁদছে। কেউ যেন নির্যাতন করছে রিন্টিকে। রিন্টির দুই মায়াবী চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন বলছে—দেখেও তুমি সব সহ্য করছ। তিন চারদিন ধরে কেন তবে তুমি আমাকে অনুসরণ করলে!

সে ঘুমের মধ্যেই শেষরাতের দিকে আর্তনাদ করে উঠেছিল—কে আমার সব নিয়ে যাচ্ছে!

সকালের দিকে ঘুম ভাঙল বেলায়। বেড-টি রেখে গেছে। সে ঘুমাচ্ছে বলে ওরা কেউ তাকে ডাকেনি। বাথরুমে ঢুকে হাতেমুখে একটু জল দিয়ে সে চা খাচ্ছিল আর সমুদ্র দেখছিল। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে তাকে এখন বের হতে হবে। চাটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে বলল—সিগারেট দেখছি নেই। নিচে যাচ্ছি।

গৌর দাঁত মাজছিল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে উঠেছে। ওরা বোধহয় সূর্যোদয় দেখতে নেমে গেছিল। ওদের ব্যালকনি থেকে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখা যায়। ওদের এ জন্য সি-বিচে নামতে হয় না। প্রথম দু-একদিন খুব আগ্রহ ছিল দেখার, এখন আর সেটা নেই।

বিষ্ণু বাথরুম থেকে বের হয়ে বলল—সরল কোথায় যাবে বলে গেল রে?

—সিগারেট আনতে গেছে নিচে।

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সামনের রাস্তায় কফি-কাউন্টার দেখা যায়।

সি-বিচে কোন দোকান পাট বসতে দেওয়া হয় না বোঝাই যায়। কাছেপিঠে একটাই মাত্র পান সিগারেটের দোকান—নিচে নেমে হোটেল রিসেপশনের ঘরটা পার হয়ে সদর রাস্তায় নামতে হয়। তারপর পূবদিকে কিছুটা এগুলেই দোকানটা। বিষ্ণু বলল—দেখলি সিগারেট আনতে গেছে ?

—লক্ষ্য করিনি।

—এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, দেখতে পেলি না ?

—কেন কি হল !

—আমার মনে হয় ঠিক ওখানে গেছে।

—আরে না। ওর ভয় ডর নেই। কোথাকার কারা—কেমন লোক, আর যদি ক্রাইমের গন্ধ থাকে তবে তো সকলের রক্ষা নেই। এ সবের মধ্যে সে কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে পারে না।

বিষ্ণু বলল—সরল এখন স‹ পারে। মেয়েটা একটা ডাইনি। মেয়েটা ওকে বশ করেছে।

—ডাইনি কেন।

—মেয়েটা খণ্ডগিরিতে একবার চোখ তুলে তাকাতেই সরল কেমন হয়ে গেল।

—তার মানে !

—সেই থেকেই তো সরল ঘরে থাকে না।

এতো বাবা মদন ভস্ম দেখছি। চল নিচে তবে দেখি কোনদিকটায় গেল।

বিষ্ণু বলল—মেয়েটাকে আমি দেখেছি। তুইও। সামনের সিটে বসেছিল। মনে নেই সেই সত্যবাদীতে মেয়েটার জন্য সবাই কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলছিল, থাক পড়ে। বাস ছেড়ে দিন। মাইরি মেয়ে বটে। গজেন্দ্রগামিনী। হুঁস নেই। রাজরানীর মতো যেন। তাকে ফেলে যায় কার সাহস এমন একটা ভাব।

গৌর মনে করার চেষ্টা করল, কোন্ সে মেয়ে! বাসটায়তো ছেলের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই যেন ছিল বেশি। এমন কি বিশিষ্ট

দেখতে, যে সরল এবং বিষ্ণু ঠিক তাকে খেয়াল করেছে, সে খেয়াল করেনি। আসলে গৌরের মনে হল, চোখ, কোন্ চোখে কার প্রতিচ্ছবি ভাসবে কেউ বলতে পারে না।

বিষ্ণু পাজামা পরেই যাবে ভাবল। তারও একটা সিগারেট দরকার। সে নিজের প্যাকেটে দেখল নেই। পাশে সরলের খাট। বালিস সরাতেই আস্ত একটা প্যাকেট বের হয়ে পড়ল। সে তাকাল গৌরের দিকে, হ্যাঁরে, আস্ত প্যাকেট দেখছি।

—কোথায় ?

—এই যে।

—তা'লে সিগারেটের নাম করে নেমে গেল !

—তাই দেখছি।

—আর দেরি করা ঠিক নয়। কি যে কাণ্ড! বেড়াতে এসেও স্বস্তি নেই। সরল এমনিতেই দারুণ সহজ স্বভাবের মানুষ। ঢাক গুড়গুড় নেই। খোলামেলা। তিন চারদিন ধরে এমন একটা সন্দেহ-জনক বিষয় গোপন করে রেখেছে ভাবতেই আরো তারা ঘাবড়ে গেল। সরল হয়তো অনেক কিছু তবে গোপন করে গেছে।

ওরা চটপট সিঁড়ি ধরে নেমে গেল।

রিসেপসানে চাবি রেখে বাইরে বের হয়ে দেখল—সব আছে, সরল বলে কোন মানুষের চিহ্ন চারপাশে কোথাও নেই। ওরা কিছুটা হতাশ হয়ে ভাবল কী করা যায়।

কিছুক্ষণ ওরা এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করল। কফি-কাউণ্টারে বসে কফি খেল। সামনের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নির্জন কিছু বাংলো বাড়ি পার হয়ে গেল। তারপর রাস্তাটা দুদিকে চলে গেছে। সোজা গেলে বাজার, দোলো মণ্ডপসাহী, কিছু হলিডে হোম—ডানদিকে গেলে সরকারী অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পরে সেই বালিয়াড়ি। ঝাউবনটা এদিকটায় এসে শেষ হয়েছে। সি-বিচে নেমে আজ ওরা এটা প্রথম টের পেল।

পূজার সময় বলে ভিড়টা বেশি। সি-বিচে লোক গিজগিজ

করছে। অতি উৎসাহীরা এরই মধ্যে নুলিয়া নিয়ে নেমে পড়েছে জলে। কেউ লাইফ-বয়া নিয়ে। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে ঢেউয়ের মাথায়। কেউ ঢেউয়ের ঘূর্ণিতে পড়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে।

বেড়াতে বের হয়ে এসব দেখতে মন্দ লাগে না। একটা আলাদা পৃথিবী যেন। বাস ট্রামের ভিড় নেই, অফিস নেই, বাজার করা নেই কেমন-এক স্বাধীন সত্তা মানুষ বেড়াতে বের হলে নিজের মধ্যে খুঁজে পায়। ওরা সি-বিচ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসব মজা উপভোগ করছিল। কিন্তু ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা সব সময় খচ খচ করছে। সরলটা কোথায় গেল ? একবার বিষ্ণু রেগে গিয়ে বলল—সোজাসুজি বলে দেব এখানে তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ, ঘুরতে হয়, এক সঙ্গে ঘুরব। মরতে হয় একসঙ্গে মরব। একা একা পালিয়ে একটা কিছু করবে সে হবে না। বিদেশ জায়গা, কিছু একটা হলে আমরা কি করব।

গৌর বলল—ধুস শালা, আমি সমুদ্রেই নেমে যাব। সাঁতার কাটা এর চেয়ে অনেক ভাল।

আসলে একদঙ্গল মেয়ে সাঁতারের পোষাক পরে সমুদ্রে ছুটোপুটি করছে। এটা দেখার পরই গৌর স্থির থাকতে পারছে না।

বিষ্ণু বলল—যা তুইও যা। আমার তো উপায় নেই—আমি যাই কি করে। সব শালা এক রকমের। কথা নেই, বার্তা নেই, সিগারেট কেনার নাম করে উধাও।

গৌর বলল—গিয়ে দেখব হয়তো বাছাধন ঘরে চুপচাপ বসে আছে।

হতেও পারে। বিষ্ণুর এমন মনে হল। সে সোজা রাস্তার দিকে হাঁটা দিলে গৌর বলল—আয় না দেখি।

—কি দেখবি।

—এই যে চান করছে। ধিঙ্গি মেয়েটা দেখ কেমন ছেনালিপনা করছে ?

—কার সঙ্গে ?

—কার সঙ্গে আবার, সমুদ্রের সঙ্গে।

বিষ্ণু বলল—মানুষের এই ইচ্ছে বরাবর। তার ভেতরে একটা বড় সমুদ্র আছে। সমুদ্র-রহস্য বলতে পারিস। আমরা যতই মনে করি, এ-আমার বউ, আমার লাভার, আমার প্রেমিকা। আসলে কেউ আমরা কারো ঠিকানা জানি না। বউ কি জানে, এই মেয়েগুলোকে দেখে তোর মতো আমারও ইচ্ছে করছে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু কি হল বলত, গেল কোথায় ? ছোঁড়াটাতো আচ্ছা ঝামেলায় ফেলল। সব শোনার পরে আমরাই বা নিশ্চিন্ত থাকি কি করে !

গৌর বলল—এটা আমাদের বাড়াবাড়ি। সরল তো কচি খোকা নারে, নাক গাললে দুধ বার হবে। আয় আর একবার কফি খাওয়া যাক। আমার খুব ইচ্ছে করছে—

—কি ইচ্ছে করছে।

—প্রেমে পড়ি।

—কেনরে ?

—প্রেম না করলে আত্মশুদ্ধি হয় না।

—তার মানে ?

—শুনছি, মাঘেই বাবা বিয়ে দেবেন।

—আজকাল বিয়ে দেয় নাকি, তুই যে বলেছিলি, কে তোকে চিঠি লেখে ?

—আরে সে তো আমার মারফৎ আর একজনকে। আমি শালা ডাক পিওন। চিঠি আমার নামে, পড়ে অন্যজনে।

আসলে গৌরের একটা দুঃখ আছে। বেজায় লম্বা শরীর। মাংস নেই, ঢেংগা। গালে হাড় বের করা। চোখ কোটরাগত। সে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে।—বেটা হারামি। ইচ্ছে করেই আমার এ চেহারা বানিয়েছে। কেউ যাতে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়তে না পারে।

বিষ্ণু কিছু বলল না। ওরা কফি-কাউন্টারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

গৌরই কেমন শুকনো গলায় ফের বলল—আমার বিয়ে বাপ না দিলে কে দেবে বল!

বিষ্ণু বলল—ভাল রোজগার তোর, মেয়ের অভাব হবে কেন?

—তা হবে না। তবে প্রেম না। সংসার বাঁধনে আটকা পড়বে। জননী হবে। জননী হয়ে সন্তানদের বড় করবে। আমি শালা গৌর, গৌরই থাকব। কোনদিন কারো প্রেমিক হতে পারব না।

আসলে এসব অতি তুচ্ছ কথা মানুষের। বাইরে মানুষ এমন হরেক রকম কথা বলে থাকে, কিন্তু ভিতরে সে চায় কোন গভীরে ডুব দিতে। এই ডুব দেবার নামই বোধহয় ঈশ্বর সন্ধান। বিষ্ণুর এমন মনে হল। সরল তার সেই ঈশ্বর সন্ধানে গেছে। সব কিছু তুচ্ছ মনে হচ্ছে মেয়েটার জন্য। তার যেমন বাবলিকে নিয়ে সেই দশবছর বয়স থেকে ঈশ্বর সন্ধান চলছিল। পেল, বিয়ে করল, জননী হল বাবলি—এখন ঝামটা মেরে কথা বলে। এ জন্য তার রাগ নেই—সেই কৈশোর বয়সের প্রেম এবং উত্তেজনার কথা ভাবলে মনে হয়, ক্ষণিকের এই প্রাপ্তিই জীবনের সঞ্চয়। ঐ সময়টাই ছিল তার ঈশ্বর প্রাপ্তির সময়। বড় সুখ, সেই চোখে। এখন সেই সুখও নেই, সেই চোখও নেই তবু বাবলি আছে, এক ঈশ্বর প্রাপ্তি থেকে আর এক ঈশ্বর প্রাপ্তিতে তাকে পৌঁছে দিচ্ছে। তারপরই মনে হল সে খুব ঈশ্বর ঈশ্বর করছে। ওর হাসি পেল। কফি মুখে দিয়ে বলল—প্রেম মানুষকে মহান করে, তাই নারে।

—হবে হয়তো। গৌর কফির দাম বের করল পকেট থেকে।

—প্রেমে পড়েছে সরল।

—হবে হয়তো।

—কেউ প্রেমে পড়লে আমরা কেমন হিংসুটে হয়ে যাই।

—তার মানে?

—প্রেমে যে পড়ে, সে আমাদের কাছে ছেনাল। না হয় ডাইনি। পুরুষ হলে লম্পট ভাবি।

—তা ভাবব কেন?

—রিন্টিকে নইলে ডাইনি ভাবব কেন?

গৌর বলল—সেই।

গৌরের 'সেই' বলা ভাল লাগল না বিষ্ণুর। এই যে সরলকে তারা খুঁজতে বের হয়েছে সে কোন একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়া থেকে। ভয়টা আসলে নিজের মধ্যেই থাকে। অবিশ্বাস থেকে ভয়। মেয়েটা সম্পর্কে সরল যদি কিছু গোপন করেও থাকে দোষেব না। প্রেমের এমনই গড়ন। এও এক জীবনের অন্তর্জলী যাত্রা তারপরই সে বলল—চল ফিরি। আজে বাজে ভয় থেকে আমবা সরলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তখন মনে হল, স্বর্গদ্বারের দিক থেকে সরল হেঁটে ফিরছে। সঙ্গে সেই মেয়েটি।

বিষ্ণু এবং গৌর মেয়েটিকে দূর থেকে ভাল করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। দূর থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে। বিষ্ণুর সহসা বাবলির কথা মনে পড়ে গেল। বড় জটিল রহস্য এই শরীরে। মনে আরও। ঘুরছ ফিরছ আছ বেশ। সঙ্গে নিয়ে থাকলেই হাঁচি কাসি উৎপাত শুরু করে দেয়।

সরল মেয়েটার সঙ্গে কথায় মগ্ন ছিল বলে ওদের লক্ষ্য কবেনি।

কেবল গৌর বলল মেয়েরা প্রেমে পড়লে ভারি সুন্দর হয়ে যায়।

বিষ্ণু বলল—ছেলেরাও।

—তখন মানুষের বোধ হয় শরীরের কোষগুলি সবচেয়ে তাজা থাকে। গৌর কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

—আসলে ডিমের পোচ বুঝলি। টল টল করছে কুসুম ভেঙ্গে গেলেই ল্যাভ ল্যাভে।

সরল আর মেয়েটা একটু এদিকে এসেই সি-বিচের দিকে নেমে যেতে থাকল। ওদের দেখতে পায়নি। বিষ্ণু ভাবল সরল প্রেম সম্পর্কে তবে খুব সাহসী হয়ে উঠছে। মাসিমাতো সরলের বিয়ের জন্য ওদের একটা ভাল মেয়ে দেখে দিতে বলেছিল। সরল সব উড়িয়ে

দিয়েছে। এতদিন মেয়েদের বিষয়ে ওর বোধ হয় কোন অজ্ঞাত ভয় ছিল। তারা অন্তত দেখেছে, মেয়েরা যেখানে, সরল সেখানে নেই। সেই ছেলে এখন কেমন পাশাপাশি একজন মেয়ে পাশে রেখে হেঁটে যাচ্ছে। তাও কিনা, এক অজ্ঞাত কুলশীল রমণীকে। এ সময় মেয়েটিকে রমণী বা নারী ভাবতেই ভাল লাগল। নারীর সব মাধুর্য মেয়েটার শরীরে লেপ্টে আছে। আসলে সরল বোধ হয় এতদিন এই মেয়েটির খোঁজেই ছিল। বেড়াতে এসে পেয়ে গেছে।

গৌর বলল—ডাকব ?

বিষ্ণু বলল—না।

॥ তিন ॥

পূর্ণিমা আর উদাস দু'জনই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। সব গেল। লাখ টাকার স্বপ্ন গেল, মেয়েটাও বোধ হয় হাতছাড়া হবে এবার। হলিডে হোমের এই বাড়িটা সেই তিনিই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সাতদিন হল রিন্টিকে নিয়ে এখানে এসেছে পূর্ণিমা। তিনিই বলেছেন, পূর্ণিমা তোমার তীর্থ করাও হবে, মেয়ের বেড়ানোও হবে। একা ভয় পেলে, তোমাব উদাসকে আনিয়ে নাও। উদাস তো এখানে এলে, যেতেই চায় না।

পূর্ণিমা বোঝে উদাস ওকে ছাড়া থাকতে পারে না। জীবনে যা কিছু স্বপ্ন দেখতে পূর্ণিমাকে উদাসই শিখিয়েছে। সেই উদাস সকাল বেলায় হুমকি দিয়েছে, চিঠি লিখে কর্তাকে জানিয়ে দিচ্ছি সব। পূর্ণিমাকে বলেছে আসলে তোর লাইনের মালই হইয়া উচিত ছিল।

পূর্ণিমা খেঁকিয়ে উঠেছিল, লাইনের মাল কে করেছে ? কে ফুসলিয়ে নিয়ে এল ? কার গতর কামড়ায় ? একটা দিন তো ছেড়ে থাকতে পার না। কাজ কাম থুইয়ে এখন আমার এখানে উঠে আসার তাল করছ।

—সেটা কে করল! তুই না আমি। কার জন্য করি। এখন ছাখ কি হয়। কোথাকার একটা ছোঁড়া আসতেই রিন্টি লাফিয়ে

বের হয়ে গেল। আরে আপনি! অ মা! দেখ এসে, সেই বাবু এয়েছেন। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন! আমার মা! আর বলিহারি যাই বেটা, তুই জোয়ান ছেলে, তোর স্বভাব হবে মরদের মত। তুই কিনা হুট করে পূর্ণিমাকে প্রণাম করে ফেললি। তুই ভদ্রলোকের ছেলে বাপ, জানিস না পূর্ণিমা কে! শালি রেণ্ডির এত প্রতাপ।

এমন কথায় কার না রাগ হয়। পূর্ণিমা বলেছিল, আমি রেণ্ডি! বেশ করেছি। লাখ টাকার খ্যাতায় আগুন। আমার মেয়েটার কি সর্বনাস করে ছাড়লে গো? ভাল করে সেই থেকে কথা কয় না। কাঁদে। আর বলি, বুড়া ভাম, রয়ে সয়ে করতে পার না! কচি মেয়েটা, কিছুই বোঝে না, আগে সব বোঝাতে হয়, কিসে কি হয়, কেন হয়, শরীরের তাপ উত্তাপে সব হয়, মেয়েটাকে বুঝিয়ে করলেই হত। লাখ টাকা, টাকা! আর আমার রিন্টি বুঝি জলে ভেসে এসেছে? মাথাটা গোলমাল করে দিলে সে!

উদাস বসে বসে বিড়ি টানছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, পূর্ণিমার মাথায় একটা লাথি মেরে বের হয়ে যায়। কি কুক্ষণে যে জড়াতে গেল! রিন্টির মাথা খারাপ! খারাপ হলে নতুন বাবু ঠিক করে কি করে? রিন্টি কচি খুকি! বোঝে না! যেমন মা তেমনি মেয়ে। বুড়ো ভাম! বয়েস হয়েছে তো কি হয়েছে। পুরুষ মানুষের বয়স কখনও বাড়ে! কি তোয়াজে রেখেছে। এখন মা মেয়ে যাবি আবার সৈদাবাদে। ঝি-গিরিরি স্বভাব, ভাল সইবে কেন? মেয়ে মানুষ বাঘে খেলেও খাবে, শেয়ালে খেলেও খাবে। হোম হলগে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাড়ি গাড়ি ফ্ল্যাট, চাপরাশি, বেয়ারা কী না আছে! মাগি তোর মেয়ে দেখে সেই মানুষ মজে গেল—কপাল না থাকলে হয়! কী না কী একটু করেছে হোমবাবু সেই থেকে তোর মেয়ের বিকার ধরে গেল। কেমন স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যায়। আসলে ওটা তোর চেয়ে বড় খানকি না হচ্ছে তো আমার নাম উদাস নয়।

রিন্টি যাবার সময় কারো অনুমতি নিয়ে যায় নি, কেমন সব কিছু অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। নতুন বাবুটাকে পেয়ে রিন্টি একেবারে

সেই আগেকার রিন্টি। বন বাঁদাড়ে ঘুরে ঘুরে সেই যে তিন পঙ্গপাল, কি নাম যেন, শালা নামটাও মনে থাকে না, উড়নচণ্ডী তিন ছোঁড়ার সঙ্গে বাবুদের বাগান থেকে এটা ওটা চুরি করে আনত রিন্টি। ছেঁড়া ফ্রক গায়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াত—একবেলা খেতে পেত, একবেলা খেতে পেত না, ঝি-গিরি করে চেয়ে চিন্তে সংসার চালাতিস, সেই ছিল ভাল। কপালে সুখ না সইলে যা হয়।

পূর্ণিমা বলল—নাও চা।

চাটা পেয়ে উদাস কিছুটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। বলল, ছ্যাখ পূর্ণিমা, কর্তা পয়সা যোগাচ্ছে। তোর তীর্থ হচ্ছে। মেয়েটার মতি ফেরা। কর্তা জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না।

পূর্ণিমা নিজেও এক-কাপ চা নিয়ে এল। সমুদ্র পূর্ণিমা জীবনে দেখেনি। এমন সুন্দর আবাস, সে আর উদাস, উদাসকে নিয়ে এমন নিরিবিল সময়, পূর্ণিমাকে কেমন ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়ে দিল। পূর্ণিমা বলল, উদাসবাবু রাগ কর না। মেয়েটা আমার কতদিন পর আজ প্রথম হেসেছে। তুমি আমার কাছে এসে বস।

উদাস কাছে গিয়ে বসল। তবে হাত বাড়াতে সাহস পেল না। রিন্টির বিকার দেখা দেওয়ার পর থেকেই পূর্ণিমা উদাসকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এখানে এসেও, পূর্ণিমা মন্দিরে গেছে। মন্দিরে ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা, আমার রিন্টির সুমতি দাও। রিন্টিকে রাজরানী কর। রিন্টি হোমবাবুকে কব্জা করতে পারলে, ওর সুখ দেখে কে! রিন্টি তো হোমবাবুকে নিজ থেকেই দরজা খুলে দিয়েছিল। আমার অবশ্য পাপ আছে ঠাকুর। আমি নির্যাতন না করলে ও বোধহয় দরজা খুলে দিত না ঠাকুর। ওর ভালর জন্যই তো সব করছি। লাইনের মেয়ে, দিন রাত বস্তি বাড়িটাতে দেখেও শিখল না কেন রিন্টি, কণা, মটরদের দেখেও কেন শিখল না রিন্টি, রাতে, বাবুরা আসে, ময়ফেল করে, টাকা ওড়ায়—রিন্টি তো ঠাকুর ঐসব দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। বয়েসও তো কম হয় নি ঠাকুর। পনেরোয় পড়েছে। কটা মাত্র বছর। যা পারবি লুটে-পুটে নিবি। মেয়েরা তো ঠাকুর বয়স

বাড়লে বুড়া গাই। ভাগাড়ে ছাড়া জায়গা নেই। আমরা লাইনের মেয়ে—কি পাপ বল তবে? ওর সুমতি না হলে আবার সৈদাবাদে। হোমবাবু বড় কড়ারে তীর্থ করতে পাঠিয়েছে। মানীজন—মেয়ের মাথায় বিকৃতি দেখে ঘাবড়ে গেছে। সারিয়ে তোল ঘুরে বেড়াও, সমুদ্র দেখ, বোঝাও জীবন কারে কয়, এত বুঝিয়ে তো এখন দেখছি সব অসার।

চা খেতে খেতে পূর্ণিমা সমুদ্র দেখছিল, আর ঠাকুরের কাছে, যা যা বলেছে সব মনে করার চেষ্টা করছে। একজন পাণ্ডা তাকে ধরে নিয়ে গেছিল, কল্পতরু বৃক্ষের নীচে। মানত করতে বলেছিল, যা চাইবে মানত করলে তা পাবে মা। পূর্ণিমা বলেছিল, আমার মেয়েটা যেন আর স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে না যায়। কেমন ঘোর লাগা মেয়ে। ঠাকুর ওকে ভাল করে দাও। ঝি-মাগি আমি, বড় আশা সইবে কেন! আর আজ সকালেই সে প্রথম দেখেছে, ঘুম থেকে উঠে রিন্টি জানালায় দাঁড়িয়ে নেই। অপলক সমুদ্র দেখছে না। কী যেন কার কাছে সঞ্জীবনী সুধা পেয়ে গেছে! কার যেন তার আসার কথা। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পাউডার মাখছে। গোল হলুদ টিপ পরেছে। সুন্দর ছাপা শাড়ি পরে বলেছে, মা চা দাও। কি করছ! আমায় খিদে পায় না?

পূর্ণিমা অবাক হয়ে গেছে মেয়েকে দেখে। যে মেয়ে হোমবাবুকে দরজা খুলে দেবার পর কিছুই আর চাইত না—কখনও সাজত না, সে আজ নিজেই চা খেতে চেয়েছে। নিজেই সাজতে বসে গেছে। বৃক্ষ তার কথা শুনেছে।

পূর্ণিমা কপাল ঠুকে বলল—উদাসবাবু বৃক্ষের বোধ হয় আমার উপর দয়া হয়েছে।

—কোন বৃক্ষ?

উদাস এখন একটাই বৃক্ষ বোঝে। বৃক্ষের নাম হোমবাবু। হোমবাবুর দয়ায় সে নিজেও দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছে। বাবু জেলা অফিসে চিঠি লিখে দিয়েছিল, সেই সুবাদে সে প্রাথমিক

দর্পণ বইটার সাপ্লায়ের অর্ডার পেয়েছে। একটা সাপ্লায়ের কমিশনেই কত টাকা! সে যদি হোমবাবুকে হাতে রাখে, আর সরকারের ঘাতঘোত জেনে নিতে পারে তবে তার হোমবাবু হতে বেশি দেরি লাগবে না। তখন কেবল ফূর্তি। ফূর্তির জায়গা কলকাতা। সে হোমবাবুর সঙ্গে দু এক জায়গায় গেছে। কি সব সুন্দর সুন্দর পরীরা ঘুরে বেড়ায়! আঁচল উড়িয়ে যায়। সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগে—কেবল সে খপ করে ধরতে পারে না। সব যেন ডানাকাটা পরী। পরী ধরতে ম্যাও লাগে। হোমবাবুর মত বড় বৃক্ষের তলায় থাকতে থাকতে সেও দু-পাঁচটা রিন্টিকে পুষতে পারবে।

পূর্ণিমা বলল, ঐ কল্পতরু বৃক্ষ।

—কি চাইলি?

—চাইলাম, ঠাকুর আমাব রিন্টির সুমতি দাও।

—আর কি চাইলি?

—চাইলাম, আমার রিন্টি রাজরানী হোক।

—আর কি চাইলি?

—হোমবাবু যেন রিন্টি ছাড়া আর কিছু না বোঝে!

উদাস কেমন ভারিম গলায় বলল, লাইনের মেয়ে তোরা, এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে শিখিস নি?

—আবার কি ভাবব?

—কেন ভাবলে পারতিস, রিন্টির রাজপুত্রের মত বর হোক। রিন্টির স্বামীর টাকা হোক। গাড়ি হোক বাড়ি হোক রিন্টির। স্বামী মন্ত্রী হোক। এ-সব না, চাইলি রিন্টি একখানা রেণ্ডি হোক। কি যে বলি তোকে! লেখা পড়া না শিখলে এই হয়।

উদাসবাবু মাঝে মাঝে এত ভাল কথা বলে! তখন মনেই হয় না, উদাস তাকে ফুসলিয়ে ভাগিয়ে এনেছিল। আর তুলেছিল লাইনের এক বস্তি বাড়িতে। প্রাথমিক ইস্কুলের মাস্টার উদাস, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো সেই থেকে। পার্টির হয়ে কাজ শুরু করে দিল। দু এক জায়গায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদাস যখন কথা বলে তখন মনে হয়

মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ কিছু চায় না উদাস। এখন বয়স যত বাড়ছে, তত তঁ্যাদড় হয়ে যাচ্ছে। আগে উদাসের বড় কাজ ছিল, মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়া। কেবল পার্টির হয়ে কাজ। কাজ করতে করতে বুঝি বুঝল—বেলা যে যায়। কিছুই তো নেই। এবারে লেগে পড়া যাক। রিন্টিকে দিয়েই শুরু। সেই রিন্টি হাত ছাড়া হয়ে গেলে মাথা ঠিক থাকে কার!

পূর্ণিমা বলল—রিন্টির জন্য মাথা গরম কর না। বেশিদূর যেতে পারবে না।

—ঐ ভেবেই বসে থাক।

—না বাবু, আমি বুঝি। ছোঁড়াটা ভদ্র ঘরের। রিন্টির সঙ্গে যদি ডুবে যায়, ভাসিয়ে তুলতে সময় লাগবে না।

—কেন এ কথা?

—আগুন শরীরে। রিন্টির শরীরে বাবু এখন তাপের দরকার। মুরগি ডিমে ওম দেয় না।

—দেয়।

—বাচ্চা ফুটে বের হয়।

—হয়।

—তারপর ডানার নীচে ছানাগুলো বড় হয়।

—হয়।

—তারপর উড়ে যায়।

—রিন্টি উড়ে যাবে? ডাল কোথায়? কোন ডালে বসবে?

—তোমার বৃক্ষের ডালেই আবার উড়ে গিয়ে বসবে।

—বলছিস রক্তে দোষ আছে।

—তাই।

—শুধরে উঠলে।

—ভদ্রজনের কাছে রিন্টি লাইনের মেয়ে জানাজানি হলে ঘরে রাখবে কেন?

—হোমবাবুর সহ্য হবে এতদিন?

—এতদিন কেন? কিছুদিন। মেলামেশা করলেই দেখবে রিন্টি আর স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যাবে না। স্বাভাবিক হয়ে গেলে নিজের অবস্থা বুঝতে পারবে। তখন আবার সেই বৃক্ষ। ঘুরছে ঘুরোক না। যে ক'দিন আছি ঘুরে ঘুরে মাথাটা ঠিক হোক।

—রিন্টি আর সোনার আংটি বলে হল্লা জুড়ে দেবে না!

—না।

—মনে হয় না। রক্তের স্বাদ নোনতা। দেখলি না, সেই থেকে কেবল একটাই কথা।

কী কথা, পূর্ণিমা জানে। দরজা খুলে দিয়ে রিন্টি হোমবাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে নিল। কোন আর ঝামেলা করে নি। রাতে পূর্ণিমা একবার মাত্র একটা আর্ত চিৎকারে পাশের ঘরে উঠে বসেছিল। কানে এখনও চিৎকারটা ভেসে আসে। মাগো! ঐ, তারপর রাত শেষ হল। রিন্টিকে সকালে এমন কি ডেকে তুলতে হয়েছিল। হোমবাবু ধর্মপ্রাণ মানুষ। পূর্ণিমাও কাজ সিদ্ধি হয়েছে শুনে কালীঘাটে গিয়েছিল। মানত দিয়েছিল। তারপর ফিরে এসেই দেখে, রিন্টি কেবল বলছে—ও আমার রিন্টি, তুই আমাদের সোনার আংটি। আর কোন কথা না। পূর্ণিমা রিন্টিকে জোরজার করে চান করিয়েছে। আর বলছে, কে বলে?

—বিশু সূর্য গোপাল।

—ওরা এখানে আসবে কোত্থেকে?

রিন্টি কোন কথা বলে না! পূর্ণিমা ফের বলেছিল, ওরা এলে পুলিসে দেব। রিন্টির তিন সাঙ্গ পাঙ্গ এসে জুটবে ভয়েই পূর্ণিমা কেমন বিভ্রমে পড়ে গেছিল। হোমবাবু অবশ্য অভয় দিয়েছিলেন, ও দেখা আছে। বয়স তো আর কম হল না। কত দেখলাম। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না বাবু, ঐ তিন ছোঁড়াই যত গণ্ডগোলের মূলে। আমার রিন্টিকে ঘরে থাকতে দিত না। বন বাঁদাড়ে নিয়ে ঘুরত। ওরা এটা ওটা চুরি করে আনত রিন্টির জন্য। আখের দিনে আখ। জাম জামরুলের দিনে জাম জামরুল। কি যে করি!

—কিচ্ছু করতে হবে না। রাতে রিন্টিকে নিয়ে সম্রাট সুন্দরী দেখিয়ে আন। জীবনটা কি বুঝবে। নাটকে সত্য কথা লেখা থাকে। বেশি করে নাটক সিনেমা দেখাও, বুঝতে পারবে সব।

নাটক সিনেমা দেখিয়েও কিছু হল না। একবার হোমবাবু নিজে উপযাচক হয়ে রিন্টিকে বড় হোটেলে নিয়ে গেল। ছাই ভস্ম গিলিয়ে নিয়ে এল—কিন্তু রিন্টি ভবি ভোলবার নয়। ফিরে এসেও বলেছিল, আমাকে কে ডাকে ?

—কে ডাকে ?

—ওরা।

—কি বলে ?

—রিন্টি তুই আমাদের সোনার আংটি। ভর টর হলে যেমন হয় তেমন ভাবে রিন্টি তাকিয়েছিল হোমবাবু আর পূর্ণিমার দিকে। এই বলতে বলতে রিন্টি কেমন এক স্বপ্নের দেশে চলে যেতে থাকল। কোন কথার উত্তর দিত না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকত। মরা মানুষের মত চোখ। জোরজার করলে কেবল বলত, আমাকে নিয়ে চল মা। পায়ে পড়ি।

এত সুখ ফেলে কেউ যায় ! পূর্ণিমার মাথায় আসত না। সকাল থেকে পিয়ার রিন্টির খাস বেয়ারা। হুকুম তামিল কথা মাত্র। একবার রিন্টি বলেছিল, গঙ্গায় চান করব, গাড়ি করে তাও করিয়ে আনা হল। পিয়ার সব সময় পাহারায় থাকে। কিছু না আবার একটা করে বসে। এই সব করতে করতেই হোমবাবু পূর্ণিমাকে ফের সেই ভয় দেখাল, আর এক পিসি ভাইঝি রেডি হয়ে আছে, বাসাটায় ওঠার জন্য। তোমরা আছ, আসতে লিখতে পারছি না। পূর্ণিমা এতে হোমবাবুরও দোষ দেখে না। মানুষটা একা। স্ত্রী পুত্র কন্যারা আলাদা বাড়িতে থাকে। বাপের নানা ভাবে টাকা, সব হাতছাড়া হবে, বাপের ওপর লাঠি নিয়ে চড়াও হলে। উড়িয়ে ফুরিয়েও যা রেখে যাবে বাপ, তিন পুরুষের ভাবতে হবে না। স্ত্রীটির উপরের পাটির দাঁত বাঁধানো। হোমবাবুর মনে ধরে কি করে!

সেই মানুষ যদি একটু সুখই না পেলে রিন্টিকে দিয়ে তবে এত তেল দিয়ে মাছ ভাজে কী করে !

পূর্ণিমা বলেছিল—কোথায় যাই ?

—যেখানে ছিলে ?

—সে তো আস্তাকুড় বাবু।

—যে যেমন মানুষ, তাকে সেখানেই থাকতে হয় পূর্ণিমা ! দুনিয়াতে কেউ কারো ভাল করতে পারে না। নিজের ভাল না বুঝলে আমার কী করার আছে।

তখন পূর্ণিমা ক্ষেপে যায়। মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বাবু বের হয়ে গেলে, মেয়ের চুলের মুঠি ধরে বলে—তোর সং করা বের করে দিচ্ছি। বলে, রিন্টির কপাল না ঠুকে নিজেই নিজের কপাল ঠুকতে ঠুকতে ফুলিয়ে ফেলে। উদাসকে চিঠি লেখে, সব গেল। বিবরণ পড়ে পত্রপাঠ উদাসও চলে এসেছিল। আগাম টাকা নিয়ে কারবার—মুখ থাকবে না ! তখনই আবার বুঝি হোমবাবুর মনে হয়েছিল, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। বলেছিল - তোমারা তীর্থ করতে যাও। রিন্টিকে সঙ্গে নাও। ঘুরে বেড়িয়ে যদি দুনিয়াকে চিনতে পারে। শেষ চেষ্টা করে আর একবার দেখি।

চা খেলেই উদাসের বিড়ির নেশা পায়। বাড়িটার সামনে সবুজ লন ! সে সেখানে বের হয়ে পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করল। হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া বাঁচিয়ে দু-মুঠোর মধ্যে জ্বালানো দেশলাইর কাঠি থেকে বিড়িতে আগুন ধরাল। পূর্ণিমা ভাত বসিয়েছে। বাজার থেকে সব্জি এনেছে উদাস। যতটা কম পয়সায় চালাতে পারে, ততটাই পয়সা বাঁচে। হোমবাবু রিন্টির ভ্রমণ খাতে বেশ মোটা টাকাই দিয়েছেন। যেন রিন্টির ইচ্ছা অপূর্ণ না থাকে। কিন্তু হলে কী হয়, পয়সার মর্যাদা না দিলে তাকে ধরে রাখা যায় না। শালা বেটা হোম এই করতে করতে ফতুর হবে ঠিক একদিন। রিন্টির ঘরে পয়সা চোরা স্রোতে ভরে যাবে। সেই রিন্টি কিনা, কোথাকার একটা বাবু-ছোঁড়ার সঙ্গে বের হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা ! সে পাঁচিলের পাশে একবার ঝুঁকে উঁকি দিল। এখান থেকে সি-বিচ অনেকটা দেখা যায়

লোকজন দেখা যায় স্পষ্ট। যুবক যুবতী বুড়ো বুড়ি সব। এর মধ্যে কাউকেই রিন্টির মত দেখাচ্ছে না। গেলো কোথায়?

উদাস মনে মনে বলে—যতদূরেই যাও পার পাবে না বাছা।

তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকল—পূর্ণিমা আর এক কাপ চা হবে!

তার কাঁচাপাকা গোঁফ এখন কেউ তুলে দেয় না। রিন্টি এককালে তুলে দিত। ডাগর হবার মুখে এই তোলা বড় সুরসুরি দিতে শরীরে। হাত পা জংঘা মাখনের মত। পূর্ণিমাটাও বয়সকালে এমনই বোধহয় ছিল দেখতে। জীবন একরকম থাকে না কেন?

পূর্ণিমা জানলায় মুখ বার করে বলল স্টোভে তেল নেই। তেল আনতে গেলে একবার ওদিকটা দেখে এস।

ভেতরে ঘুণপোকা কাটছে। সে বলল, ছেড়ে দিচ্ছ দাও, বুঝবে—লাইনের মেয়ে বলে বুঝি মনে কর কেউ ঠকাতে পারবে না। দুনিয়াতে চোরের ওপর থাকে বাটপাড়। শালা কোন বাটপাড়ের পাল্লায় পড়েছে টের পাবে।

সে হাতে কেরোসিনের একটা টিন নিয়ে স্বর্গদ্বার দিয়ে ঘুরে যাবে ভাবল। বেলা বাড়ছে। সূর্য সমুদ্রের ঠিক মাঝ বরাবর ঝুলে আছে। কোথায় যে গেল! ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল ফেরার নাম নেই! স্বর্গদ্বারের কাছে আসতেই ভিড়ের মধ্যে দেখল রিন্টি আঁচল উড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যেমনটা হয়—রিন্টি যেন সমুদ্র আর বালিয়াড়ির মাঝে এক রঙীন প্রজাপতি—কেবল উড়ছে। এখন নেমে গেলে হয়। ডাকলে হয়, বেলা হল বাড়ি চল রিন্টি, তোর মা বসে আছে। কিন্তু তখনি মনে হল রিন্টি ওকে দেখেই যদি সেই স্বপ্নের ঘোরে পড়ে যায়' ছোঁড়াটা কোথায়! ছোঁড়াটা নিশ্চয় কাছে কোথায় আছে। সবুজ মাঠ, নীল আকাশ আর ফুলের সুঘ্রাণ না থাকলে প্রজাপতি ওড়ে না। ছোঁড়াটা এখন রিন্টির সবুজ ঘাস, নীল আকাশ এবং ফুলের সুঘ্রাণ। সে যে অত্যন্ত নীরস মানুষ। বালিয়াড়িতে রিন্টিকে দেখে তারও যে কবিতার মতো পৃথিবীটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

॥ চার ॥

দরজায় ঠক ঠক করে কেউ শব্দ করছিল। সরল চা জলখাবার খেয়ে জামা প্যাণ্ট পরে বসে আছে। ঠিক সকাল ৬টায় ট্রেভেলিং এজেণ্টের লোক আসার কথা। দরজা বিষ্ণুই খুলে দিল। টুকিটাকি কিছু আর নেবার আছে কিনা একবার মুহূর্তের মধ্যে দেখল সরল। দরজা খুললে দেখল, হোটেলের প্রিয়দাস। ট্রেভেল এজেণ্টের লোক নয়। প্রিয়দাস চা জলখাবারের এঁটো প্লেট কাপ নিতে এসেছে। সরল ঘড়ি দেখে বলল—৬টা বাজে। কি ব্যাপার!

গৌর দাড়ি কামাচ্ছিল। সে বলল—আসবে। এত উতালা হচ্ছিস কেন? সেদিন তো পেছনে তাড়া না লাগালে বাসই ফেল করতে হত।

বিষ্ণু জানলায় দাঁড়িয়ে বলল—সকাল বেলার আকাশ মেঘলা থাকলে বড় খারাপ লাগে। কত আশা আসিবে সে। আসলে কি জানিস, এই আশায় আশায় বড় হই, পথ হাঁটি। কোনো মন্দিরে পৌঁছাব মনে হয়। কিছুদিন হাঁটলেই বোঝা যায়—সব ফাঁকা। মন্দির আর দেখা হয় না। কিছু ইঁট পাথর অবশ্য থাকে। শ্যাওলা-ধরা। তার ফাঁক ফোঁকরে ভুজঙ্গেরও সাক্ষাৎ মিলতে পারে। সবই থাকে, কেবল প্রাপ্তি থাকে না। বোঝ, মন্দির নেই—ইঁট পাথর আছে, বোঝ শিব নেই—ভুজঙ্গ আছে। জীবনটা শালা ভুজঙ্গের প্যাঁচে পড়ে পড়ে আদ্যিকাল থেকে মার খাচ্ছে।

এসব কথা সরলকে শুনিয়ে বলা। সরল আবার কোণার্ক দেখতে যাবে। মানুষ এখানে বেড়াতে এলে একবারই যায়—কোণার্ক, ধবলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি সবাই একবার। সরলের একেবারে পোষায়নি। সে আবার যাচ্ছে। সরল একা যাবে না। সেই মেয়েটাও যাবে। সরল কিছু না বললেও তারা ঠিক টের পেয়ে গেছে। মুখচোরা ছেলে। তা ছাড়া মেয়েটা সম্পর্কে ওদের ধারণা

ভাল না। একটা খারাপ মেয়ের সঙ্গে কে বেড়াতে যায়! না কি সরল আর রিন্টির সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য শুনতে ভালবাসে না। রিন্টির কথা উঠলেই ওরা আঁতকে উঠতে পারে ভেবেও সরল ওদের কাছে কথাটা গোপন করে যেতে পারে।

কেবল গৌর হাই তুলতে তুলতে বলল—যাচ্ছিস ঠিক আছে, তবে সাবধানে যাস। আজকাল কাগজে মেয়ে ঠকবাজদের যা খবর বের হয়, পাঁচে ফেলে কিছু না আবার আদায় করে নেয়।

সরল কিছু বলছে না। কেবল ঘড়ি দেখছে। সময় কখনও যে কত অমূল্য হয়ে যায় সরলের ঘড়ি দেখা না দেখলে বোঝা যাবে না। আর ঠিক এ সময়েই দরজায় ঠক ঠক শব্দ।

গৌর বলল—এসে গেছে।

বিষ্ণু বলল—মা তারা।

সেই থেকে বিষ্ণু আর গৌর ওর পেছনে লেগেছে। মাসিমাকে বলে দেবে বলে ভয়ও দেখিয়েছে। সে তাতে কর্ণপাত করেনি। রিন্টিকে তার ভাল লেগে গেছে কেন অত জানে না। মেয়েটার মধ্যে এক আশ্চর্য স্বপ্নের পৃথিবী সে আবিষ্কার করেছে। সে এমন অবশ্য বলতে পারত গৌরকে। কিন্তু এরা সবটাই ভুজঙ্গ দেখছে। সে সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভাবল, সব মানুষের মধ্যেই ভুজঙ্গ বাস করে গৌর। আমরা তবু মণি খুঁজি। পেয়েও যাই। জানি না, এই আমার সেই মণি কি না।

বাসটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। হোটেল থেকে আরও কজন ওর সঙ্গে উঠল। কনডাকটার সিট নম্বর বলে দিলে সে গিয়ে বসে পড়ল। পাশের সিট রিন্টির জন্য। সে রিন্টিকে জানালার কাছে বসতে দেবে বলে নিজে বাঁ-দিকটায় সরে বসল।

বাসের ভেতরে আশ্চর্য মিউজিক বাজছে। এমন সুন্দর মিউজিক সে যেন কতকাল শোনে নি। ভেতরটা কেমন গম গম করছে। সকাল বেলা। সূর্য উঠে গেছে। অসীম অনন্ত সমুদ্রে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ। যেন শব্দ নয় গান। সমুদ্র ভূখণ্ডে আছড়ে পড়ছে। মাথা কুটছে।

যেন এক গভীর ভালবাসার হাহাকার সমুদ্রের। কোন অনাদি অনন্তকাল থেকে নমুদ্র পৃথিবীর কাছে দু হাত পেতে ভালবাসার জন্য করুণা ভিক্ষা করছে। রিন্টির সঙ্গে এ কদিন ঘুরে মনে হয়েছে, সেই এক হাহাকার তার। সরলের কাছে তার সেই নতুন ভূখণ্ড বুঝি কেউ গচ্ছিত রেখে গেছে।

বাসটা পর পর আরও দুটো হোটেলের সামনে দাঁড়াল। সেখান থেকেও লোক উঠল। সামান্য বাঁক ঘুরে সেই হলিডে হোমটায় হাজির। যেন রিন্টিকে কেউ এখানে বন্দী করে রেখেছে। সে দেখেছে ঘুরে বেরিয়ে এই হলিডে হোমে পৌঁছে দিতে এলেই রিন্টি কেমন মনমরা হয়ে যেত। রিন্টির কত সব গল্প, কোন এক পাগলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একবার। তার গল্প। পাগলটা নাকি গাছে দেয়ালে স্কুল-বাড়ির সদর দরজায় ভাঙা পাঁচিলে একটা কথাই বার বার লিখে যায়। সে প্রশ্ন করেছিল, কি লেখা ?

রিন্টি বলেছিল, পাগলটার কী মাথাখারাপ বল, কেবল লেখে—মানুষ মরে যায়। মানুষ তেলে ভেজাল দেয়।

কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দরজা জানালা বন্ধ। রিন্টিকেও না। বুকটা কেমন ধড়াস করে উঠল। সে নিজেই লাফিয়ে নামতে যাবে, এমন সময় দেখল, দরজা খুলে রিন্টি বের হয়ে আসছে। ওর পেছনে মাসিমা। মাসিমাকেও তার খুব ভাল লেগে গেছে। তার সব পরিচয়, কোথায় থাকে কি করে, কোন হোটেলে উঠেছে সব জেনে খুব খুশি। মানুষ হিসেবে সে যে খারাপ নয়, ক'দিনে মাসিমা এটা টের পেয়ে গেছে। রিন্টিই বল্লেছিল, আমরা কোণার্ক দেখতে যাব মা।

—এই যে ঘুরে এলি সেদিন।

—কবে ?

—বারে উদাসবাবু নিয়ে গেল না।

—ধুস মনেই নেই। কিছুই দেখিনি মা। আমি যাব। সরল-বাবুর সঙ্গে যাব। আমি যাব।

—এই এক তোর দোষ রিন্টি। একবার বললে আর রক্ষে নেই।

—না আমি যাব। সরলবাবু কবে যাবে বল।

সরল বলেছিল, একবার তো গেছি।

—আর একবার গেলে কি হয় ?

সত্যি কিছু হয় না। তারও কথাটা বড় মনোরম মনে হয়েছে। রিন্টির সঙ্গে বেড়ানোর আলাদা মাধুর্য আছে। কিন্তু সে তো নিজ থেকে তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে না। এতে সংশয় দেখা দিতে পারে। সে বলেছিল, তুমি তো গেছ রিন্টি।

—না যাই নি।

সরলের মনে হয়েছিল, যেতে নাও পারে। কারণ এই রিন্টি আর সেদিনের রিন্টি এক নয়। দুস্তর ফারাক।

রিন্টি ফের বলেছিল, আমি কিন্তু জানি না। আমি যাব। তুমি না যাও আমি একাই যাব। কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না।

মাসিমা বলেছিল, ঠিক আছে উদাসবাবু নিয়ে যাবে।

উদাসবাবু! মাথা খারাপ! তালে আমি যাবই না। তারপরই রিন্টির মুখ কেমন কি ভাবতে গিয়ে ভারি ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। মাসিমা বুঝি টের পায়, কোথাও আবার কোন আবেগ রিন্টির মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। রিন্টি এক দণ্ডের মধ্যে আগেকার রিন্টি হয়ে যাবে বুঝি। বেগতিক দেখে মাসিমাই বলেছিল, সরল বাবা তুমি একটু সময় করে ঘুরিয়ে আন। আদরে আদরে ওর মাথাটি গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে রিন্টি মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মা তুই কি ভাল! 'তুই' কথাটা শুনে সরল কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছিল। মাসিমা কি বুঝে বললেন, ও মেয়ের এমনই স্বভাব। খুশিতে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বাসে ওঠার আগে সরল দেখেছিল উদাসবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে রিন্টিকে দেখছে। উদাসবাবু মানুষটা ভাল। সরলের একখান ছবি চেয়েছিল। বাইরে বের হলে চেনা অচেনা কত মানুষ যে আত্মীয়

হয়ে যায়। সরল রিন্টির ছবি তুলেছিল। সরল নিজের ছবিও তুলেছে। তার, বিষ্ণুর, গৌরের এক গাদা ছবি তোলা আছে। সে সব ছবিগুলিই নিয়ে গেছিল মাসিমা রিন্টি আর উদাসবাবুকে দেখাবে বলে। উদাসবাবু বিষ্ণু গৌর এবং তার একটা গ্রুপ ফটো পছন্দ করে বললেন, এটাই আমাকে দাও। তোমরা তিনজন এয়েছ তাই তো! আমার কাছে এটাই থাক।

রিন্টি আসছে। রিন্টি পায়ে আজ রুপোর চেলি পরেছে। হাতে রুপোর বালা। কানে ঝুমকো। সাদা সিল্ক পরেছে। চুল দু বিনুনিতে বাধা। নাকে পাথরের নাকচাবি। রিন্টিকে দেখলে যে কেউ এখন ভাববে, এ যে সত্যি রূপকথার আংটি। সরল বাসের পাশে দাঁড়িয়ে। রিন্টি উঠলে সে উঠল। আর সেই মিউজিকের মধ্যে বাস চলতে থাকলে সরল রিন্টির কানে কানে বলল—তুমি সবার কাছে রিন্টি, আমার কাছে রূপকথার আংটি।

—যা কি যে বলছ!

—ঠিকই বলছি রিন্টি।

রিন্টি বলল, মিছে কথা।

আর তখন বাস শহর ছাড়িয়ে দু-পাশের গ্রাম মাঠের মধ্যে ঢুকে গেল। ড্রাইভার চিৎকার করে বলল, পেছনে তাকান। পেছনে তাকাতেই দেখল, সব ছাপিয়ে আকাশের গায়ে মন্দিরের চূড়া উঠে গেছে। সবাই প্রণাম করছিল। সেও করল। রিন্টি বলল—তাহলে আমিও করি। ভ্রমণে বের হবার আগে রিন্টিও প্রণাম সেরে নিল।

মিউজিক তেমনি বাজছে। ডি-লাক্স বাসগুলিতে কত সব যে বিলাসের উপকরণ থাকে। ভ্রমণার্থীদের জন্য নানারকমের সুখ সুবিধা। বাসটি চলছে। যেন সেই মিউজিক চলার সঙ্গে মিল রেখে বাজছে। রিন্টির শাড়ি থেকে চুল থেকে বড় সুঘ্রাণ উঠছে। সরল একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। কে এই মেয়ে, সে তো মেয়েদের থেকে সব সময় দূর রেখে চলত। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যুবতী মেয়ে দেখলেই কেমন সংকোচের মধ্যে পড়ে যেত। ভাল করে সে আজ

পর্যন্ত কোন যুবতী মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেই পারে নি। বার বার মনে হয়েছে যুবতীরা বড় অহংকারী। ছিমছাম তরুণীরা তার মত মানুষকে পাত্তা দেবে কেন? দেখতে সুশ্রী বলে! সে রকম কত সুন্দর যুবকই তো আছে। এই রিন্টির সঙ্গে সেদিন এ ভাবে দেখা না হলে তাকেও কোন কথা বলতে পারত না। কেন জানি মনে হয়েছিল, সারা রাস্তায় মেয়েটি একা। ওকে দেখার কেউ নেই। দেখতে দেখতে কেমন মায়ায় জড়িয়ে গেছিল। রিন্টি বলল, এই শোন।

সরল রিন্টির মুখের কাছে কান এগিয়ে নিল।

—তুমি আমাকে রূপকথার আংটি বললে কেন?

—কেন যে বললাম বুঝতে পারছি না।

—কথার কোন মানে থাকবে না? রিন্টি গম্ভীর মুখে বলল।

—রূপকথার আংটি তুমি জান না? বারে সেই যে রূপকথায় আছে, আংটি তুমি কার?

—রূপকথা কি?

রূপকথা মানে রূপকথা।

সরল রিন্টির এমন কথার অর্থ ধরতে পারে না। রিন্টি কি মাঝে মাঝেই স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যায়। মুখ দেখল ভাল করে। নাতো! খুব স্বাভাবিক মুখ। মাঠ গাছপালা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে বাসের গতিবেগের সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঐ দেখ কি সুন্দর একটা বাছুর। লাফাচ্ছে। কি সুন্দর কুঁড়েঘরটা। কি সুন্দর বুড়িটা। মাথায় কাঠ নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। জান আমার এমনি ইচ্ছে করে, কারো জন্য শুকনো কাঠ ঘরে নিয়ে যাই। শীতে আগুন জ্বালি। রিন্টি আর রূপকথার মানে জানার জন্য আগ্রহ বোধ করছে না।

মাইকে তখন গাইড বাসটা কোথায় কোথায় যাবে, কতক্ষণ থামবে, এবং অন্যান্য কি করণীয় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই আগের দিনের মতো। একই ভাবে, একই ভাষায়। প্রথমে বাংলায় পরে হিন্দীতে। সরলের ও সব শোনার আগ্রহ কম। কারণ একই কথা বার বার কে শুনতে চায়। রিন্টি একেবারে বালিকার মতো

ওর গা ঘেসে বসেছে। নির্দোষ এবং পবিত্র। জীবনে একটা বড় হওয়ার বিষয় আছে, বড় হলে নারী-পুরুষের মধ্যে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়, রিন্টির ব্যবহারে তার কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না। এ ক'দিন মিশে দেখেছে রিন্টি কোন ভালবাসার কথা বলতে শেখেনি। গড়ে পিঠে না দিলে যেন রিন্টি জীবনেও ভালবাসা কি টের পাবে না। মাঝে মাঝে ওর একটাই কথা, তুমি বড় আমার কাছের—এত কাছে আমি আর কাউকে পাইনি। তোমাকে না দেখলে কান্না পায়। তুমি আমাকে ফেলে কোনদিন যাবে না বল!

এমন কথা যে মেয়ে অকপটে বলতে পারে তাকে সরল না ভালবেসে থাকে কি করে। রিন্টির এক একদিন এক এক রকম বায়না। আজ সমুদ্রে সন্ধ্যায় সাঁতার কাটব। জ্যোৎস্না উঠবে। তুমি আমি এক সঙ্গে সাঁতার কাটব। সমুদ্রে ভেসে যাব, যাবে তো!

সে বলেছিল, রিন্টি সকালে সাঁতার কাটব। সন্ধ্যায় কেউ সাঁতার কাটে না।

—না সন্ধ্যায়। না এলে দ্যাখ আমি মরে যাব। রিন্টিকে আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

সরল বলেছিল, ঠিক আছে। রিন্টি শালোয়ার কামিজ পরে এসেছিল। দারুণ সাঁতার কাটে। সমুদ্রের সঙ্গে রিন্টির যেন কতদিনকার বন্ধুত্ব। শেষ ব্রেকারটা পার হয়ে শান্ত জলে চুপ চাপ ভেসে থাকত। আর একটা কথা বলত না। ভারি খেয়ালি মনে হত তখন রিন্টিকে।

স্বর্গদ্বারে সরল একদিন রিন্টিকে বলেছিল, ঝিনুকের মালা তোমাকে খুব মানাবে। বলে সে একটা কিনতে গেলে রিন্টি বলল ওদিকের রূপবাহারে সুন্দর পাথরের মালা আছে। ওখান থেকে কিনব। তারপর কিছুটা এগিয়েই বলেছিল, জান আমি পড়তে শিখে গেছি। দেখ না, পড়ছি বলেই সে দোকানগুলোর সাইনবোর্ড গড় গড় করে পড়ে যেতে লাগল। সরল এমন কথায় বড় বিভ্রমে পড়ে গেছিল। ছোট্ট কোন খুকী যেন তার বিদেশাগত দাদাকে নিজের

ক্লাতঙ্কের কথাটা জাহির করছে। তারপরেও চমক ছিল। পাথরের মালাটা কিনে দেবার আগে একবার পরে দেখতে বলেছিল রিন্টিকে। রিন্টির মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর প্রায় পাগলের মতোই কাণ্ড করে বসল। কোন নাটক নবেলে এমন দৃশ্যের কথা ভাবা যায়। পাথরের মালাটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। তার মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—মালা দিয়ে তুমি কি করতে চাও বুঝি না! তুমি একটা রাক্ষস। তুমি ভাল না। তুকি খারাপ। পাজি।

দোকানের ভিড়ে সরল ভারি বিপদে পড়ে গেছিল। কি করবে বুঝতে পারছিল না। মজা দেখার জন্য ভিড় বাড়ছিল। সে তাড়াতাড়ি দোকানীকে দামটা দিয়ে ছেঁড়া মালাটা পকেটে পুরে নিয়েছিল। তারপর রিন্টিকে প্রায় টানতে টানতে সি-বিচে নামিয়ে নিয়ে গেছিল। বলেছিল, তোমার কি মাথা খারাপ। এটা কি নাটক করলে?

রিন্টি হাউ হাউ করে কাঁদছিল। কেবল বলছিল—বল আর কোন দিন তুমি আমায় মালা কিনে দেবে না। বল।

সরল বাধ্য হয়ে বলেছিল—দেব না। কোথাও এই মালা নিয়ে মেয়েটির মধ্যে একটা বড় ঘা গোপন করে আছে। রিন্টি চুপচাপ বালিয়াড়িতে বসেছিল আর একটা কথা বলছিল না। কেবল অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। দূরে নুলিয়াদের কালো ডিঙ্গিগুলো বিন্দুবৎ। কোথাও সাদা নৌকাররঙের পাল প্রজাপতির মত দুলছে। রাত বাড়লে সরল বলেছিল—ওঠো। ফিরব।

রিন্টি বলেছিল—মালাটা দাও।

সরল পকেট থেকে ছেঁড়া মালাটা বের করে হাতে দিয়েছিল। তারপর আর একটা কথাও না। রিন্টি গলায় আজ সেই ছেঁড়া মালাটা অজস্র তালি মেরে জোড়া লাগিয়ে পরে এসেছে। যত যাচ্ছে, তত রিনটি তার কাছে আরো গভীর রহস্যময় হয়ে উঠছে। সরল অপলক মালাটা দেখছিল।

রিনটি সরলের দিকে তাকিয়ে বলল—মালাটা পরলে জান আমার কোন দুঃখ থাকে না।

সরল বলল—এই মালা কেনা নিয়ে কি কাণ্ডটা না করলে। তোমার মাথায় ভূত চেপে আছে।

রিন্টি পলকে উদাসীন হয়ে গেল। বাসের জানালায় মুখ। লক্ষ্য করলে একটা পাশ দেখা যায়। রিন্টি এখন কী দেখছে কে জানে! কি ভাবছে কে জানে!

সরল বলল—ধবলগিরিতে তুমি শেষ উঁচু সিঁড়িটাতে দাঁড়াবে। আমি অনেক নিচ থেকে একটা ছবি তুলব।

রিন্টি বলল—আমিও তুলব। তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে।

সরলের এতে আর আপত্তি থাকার কি আছে। সে বলল—আচ্ছা।

—আমরা এক সঙ্গে ছবি তুলব।

সরলের অটোমেটিক ক্যামেরা নয়। সে বলল—কোণার্কে হবে। ওখানে ফটো শিকারী ঘুরে বেড়ায়।

কোণার্কে নেমেই ওরা ফটো তুলল। এবং বাস থাকতে থাকতে নিগেটিভ হাতে দিয়ে সরলের কাছ থেকে বারটা টাকা নিল ফটো শিকারী। তিনটে ছবি। একটা হাতি দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, একটা সিঁড়ি ধরে ওঠার মুখে। অন্য ছবিটি দেয়াল চিত্র ব্যাকগ্রাউণ্ড করে।

রিন্‌টি বলল, আমার খুব বিশ্রী ছবি ওঠে।

সরল রিন্‌টিকে নিয়ে হোটেলে খাচ্ছিল—তখন রিন্‌টি এমন বলল।

তারপর কি ভেবে রিন্‌টি বলল, তুমি আমার সঙ্গে সৈদাবাদ যাবে?

সহসা রিন্‌টি একথা বলছে কেন বুঝতে পারছে না সরল। সৈদাবাদটা কোথায় সে জানে না। রিন্‌টির ঠিকানাও তার নেওয়া হয় নি। তার মনে হল আসল কাজটাই সে করেনি।

—সৈদাবাদ কোথায়?

—বারে জান না! তুমি কি! তুমি কি। তুমি এত জান, সৈদাবাদ কোথায় জান না?

রিন্‌টির ধারণা সে যেখানে বড় হয়েছে, গাছপালার মধ্যে যেখানে

সে ঘুরে বেড়িয়েছে; সেটা পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত জায়গা। সরল জায়গাটার নাম জানে না ভেবে কেমন মুষড়ে পড়ল। বলল—তুমি বহরমপুর যাওনি!

—না যাইনি।

—তবে তুমি কি! বহরমপুর যাওনি। রেল লাইন আছে বহরমপুরে। ইস্টিশান আছে। নীল আলো জ্বলে রাতে সেখানেই আমাদের বিশু সূর্য গোপাল থাকে। ওখানে গিয়ে আমরা সবাই এক সঙ্গে ছবি তুলব। ওরা কী খুশি না হবে। একটা জেলখানার পাঁচিল আছে। কারবালার মাঠ আছে। হোতার সাঁকো পার হলে বড় বটগাছ। খালপাড় ধরে কালীবাড়ির রাস্তায় হেঁটে গেলে তো, দেখবে সৈদাবাদ রাজবাড়ি। বড় রাস্তা ধরে হাঁটবে। সামনে গেলে ছুটো পর পর জলের কল। ওখানে রিন্টি বললে আমাকে সবাই চেনে।

কিন্তু উদাসবাবু যে বলল—ওরা কলকাতার লোক! কলকাতা থেকে এয়েছে। সরল হাতমুখ ধোবার সময় বলল, তোমরা কলকাতায় থাক না?

—কলকাতা!

যেন সরল এমন একটা বাজে জায়গার নাম করেছে যার মত খারাপ জায়গা আর কোথাও নেই। রিন্টি বলল, কলকাতা আমার ভাল লাগে না। দেশে চলে যাব। মা না যাক আমি চলে যাব!

—কলকাতার ঠিকানাটা আমাকে দেবে রিন্টি।

রিন্টির মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চিৎকার করে কিছু বলতে চাইল পারল না। হতাশায় মুখটা কী করুণ হয়ে গেল!

—দেবে তো!

—হুঁ।

যেন শুনতে পায়নি রিন্টি।

—কী বলছি বুঝতে পারছ! ঠিকানা না জানলে, কলকাতায় ফিরলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব কী করে!

—না না। দেখা করতে হবে না।

সরল ওর এমন কথায় অবাক হয়ে গেল। সে কাকে নিয়ে তবে স্বপ্ন দেখছে। কাকে সে তার স্বপ্নের পৃথিবী ভাবছে।

সরল বাসে ওঠার সময় বলল—তুমি এমন কর কেন বুঝি না।

—কি করি!

—এই যে বললে দেখা করতে হবে না।

—জান সেখানে গেলে তুমি আমায় চিনতে পারবে না। বলেই রিন্টি বাসে উঠে জানালায় মাথা এলিয়ে বসে থাকল। তার পাশে যে সরল বসে আছে যেন খেয়ালই নেই। সেই প্রথম দিনকার চেহারা। সর্বস্ব হারানো এক নিরুপায় রমণী।

সরল বলল, এই কি হল!

রিন্টি মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখ জলে ভার হয়ে আসছে। সেই বিকট লোকটা আদর করে গলায় হার পরিয়ে দিচ্ছে—আর তার কেমন শীত করছিল কথাটা ভাবতে গিয়ে। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠছে। ইচ্ছে হয় উদাসবাবু আর মাকে খুন করতে। বে দেবে বলে নিয়ে এল। বুড়ো বরে সে তো আপত্তি করে নি। সবারই বিয়ে হয়—হোক না বুড়ো, সব মিছে কথা। কণা মাসিদের মত জীবনটাকে মা আর উদাসবাবু মিলে নষ্ট করে দিল। সরল তাকে ছুঁলেও যেন অমঙ্গল হবে। সে সরে বসতে চাইল।

বলল, কি হল!

রিন্টি শাড়ির আঁচল টেনে আল্গা হয়ে বসল। বলল, সরে বস না! আমার কেমন শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

সরল বলল—শরীর খারাপ লাগছে? বমি পাচ্ছে? এই মাত্র ওরা হোটেলে খেয়ে এসেছে। বাস ছুটছে ভুবনেশ্বরের দিকে। গম গম করে বাসের ভেতর বাজছে 'তেরে দেওয়ানা'। বাসের ঝাঁকুনি, আর কানের কাছে বিকট সুরে হিন্দী গান শরীর খারাপ করতেই পারে।

রিন্টি এই মানুষটাকে নিয়ে কী যে করে! সে বড় হতে হতে

এমন একজন সুন্দর মানুষেরই স্বপ্ন দেখেছে। কণা মাসিদের জীবন দেখে তার কষ্ট হয়েছে, সে তার তিন সঙ্গী নিয়ে নদীর চরে কিম্বা বাবলার বনে যখন ঘুরে বেড়াত, তখন তার তিন বিশ্বস্ত অনুচর ফল পাকুড় চুরি করে আনত তাকে দেবে বলে অথবা যখন সে গভীর বনের মধ্যে হারিয়ে যেত তখনও মনে হয়েছে, রাজপুত্র আসছে ঘোড়ায় চড়ে। হাতে ফুল। রিন্টিকে ফুল দিয়ে বলছে, আমার সঙ্গে যাবে। এই মানুষ তার যেন সেই রাজপুত্র। অথচ মা, উদাসবাবু গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দিয়েছে। এমন হতকুচ্ছিৎ জীবনের কথা সে পৃথিবীর কাউকে আর বলতে পারবে না। সে একটা অমঙ্গলের মধ্যে পড়ে গেছে। তার মধ্যে আর এই সুন্দর মানুষটাকে টেনে আনতে পারে না।

রিন্টি বলল না, বমি পাচ্ছে না।

—তালে ?

রিন্টির চোখ থেকে ফের জল গড়িয়ে নামছে। জানালায় মুখ রেখে বলছে, আমাকে ছুঁলে তোমার পাপ হবে। তোমার অনিষ্ট হবে।

সরল বলল—সত্যি তুমি পাগল আছ।

রিন্টি বলল—সরলবাবু, তুমি জান না, পাগলেরও স্বাধীনতা আছে, আমার তাও নেই। কেমন গম্ভীর গলায় কথাটা বলছে। কত বয়সী মানুষ যেন রিন্টি। মেয়েটা শুধু হাতে পায়ে বাড়েনি, মনের দিক থেকেও কেমন অল্প বয়সে পাকা হয়ে উঠেছে।

সরল বলল—তোমার কি হয়েছে বলবে ত !

রিন্টি বুঝল—মানুষটাকে এসব বলা নিরর্থক। এতে মানুষটা তার আরও বিপদে পড়তে পারে। বিপদ না হোক, যদি জানতে পারে, একজন বিকট মানুষের রক্ষিতা বানাবার জন্য মা আর উদাসবাবু আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তবে সরলবাবুর কষ্টের সীমা থাকবে না। সরলবাবুর মধ্যে সে একজন ভাল মানুষকে আবিষ্কার করে খুশী। যেন এর জন্য সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। কারো না কারোর জন্য মানুষের অপেক্ষার দরকার হয়। রিন্টি

হঠাৎ আঁচলে চোখ মুছে, হা হা করে হেসে উঠল।—কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি।

সরল বলল—তোমার কিছু একটা হয়েছে। তুমি মনে কর আমি কিছু বুঝি না।

—কি বোঝ ?

—তুমি কোথায় থাক বলতে হবে।

রিন্টি বলল—এখন কলকাতায়।

—কলকাতার কোথায় ?

—বেলেঘাটায়।

—বেলেঘাটার কোথায় ?

—সি, আই, টি রোড না কী যেন বলে।

—কত নম্বর ?

রিন্টি বলল—তুমি আমার কাছে এসে বোস।

—এই ত কাছে।

—না আরও কাছে।

—শোন কথা এড়িয়ে গেলে চলবে না। নম্বর বল।

—নম্বর আমি জানি না।

—জান না মানে।

—বাংলা পড়তে পারি। বড় গোলমেলে নম্বর।

—সেটা কি ?

রিন্টির মনে হল, সে নম্বর না জেনে ভালই করেছে। না হলে সরলবাবু যে ভাবে চাপ দিচ্ছে, তাতে তাকে বলে দিতেই হত। আসলে হোমবাবুর দুটো উপর নিচ ফ্লাট। পাশে একটা ব্যাংকের অফিস। চিঠিপত্র পিয়ার তুলে রাখে। মা এনে বাসাটায় তুলেছে। উদাসবাবু তাকে আর মাকে রেখে মাঝে মাঝে বহরমপুর চলে যায়। আবার ছুটি ছাটায় আসে। উদাসবাবুর সঙ্গে সে ছাড়াও হোমবাবুর আর একটা কি লাইন হয়ে গেছে।

—বাসার নম্বর বল।

—আমি সত্যি জানি না।

—তুমি জান। বলবে না।

—তুমি বিশ্বাস কর সরলবাবু, আমি জানি না। আমি কিছু জানি না। আমি এখন তোমাকে ছাড়া কিছু জানি না।

বাসে আবার মিউজিক বাজছে। সরলের এই মিউজিক মনে হচ্ছে হট্টগোল। কান ঝালাপালা করা হট্টগোলেও তাদের কথা কারও কানে যেতে পারে—দু একজন বাসযাত্রী সরল এবং রিন্টিকে লক্ষ্য করছে। চোখে মুখে তাদের কৌতূহল। সরল আর মাথা গরম করল না। রিন্টি কিংবা তাকে নিয়ে কেউ মজা উপভোগ করুক সে চায় না। নন্দন কানন হয়ে বাসটা যখন উদয়গিরিতে এল তখন রিন্টিকে আবার নিরিবিলি কাছে পাওয়া গেল। বাসটা এখানে অনেকক্ষণ থামে।

রিন্টি আর সে সিঁড়ি ভেঙ্গে এখন উঠছে। রিন্টির জীবনে এমন সুন্দর সময় আর কখনও আসেনি। সে কলকাতায় আসার পর বুঝেছে তার জীবনের সব কেড়েকুড়ে নেবার জন্য হোমবাবু গোঁফে তা দিচ্ছে। গোঁফে তা দিতে দিতেই একদিন তার দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে গেল। লোকটা এঁটুলির মতো গলায় ঝুলে আছে। রিন্টি উঠতে উঠতে নিজের গলায় হাত দিল। তার সময় বয়ে যাচ্ছে। সুন্দর সময়ে সে আর তার নিয়তি নিয়ে ভাবল না। সরলকে বলল—এস না এস। এই তো দেখ কেমন আমি লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছি।

সরল বলল—রিন্টি তুমি সব পার। আমি পারি না।

—এস না এস। কত উঁচু না। কত উঁচু এই পাহাড়টা। মন্দিরগুলো কেমন সুন্দর না? এখানটায় আমি ঢুকে গেছিলাম। তুমি ডাকলে, বাস ছেড়ে দেবে। চলুন। মনে হল কি জান?

—কী মনে হল?

—মনে হল আমার দরজায় এক নবীন সন্ন্যাসী। সে আমাকে ঠিক একদিন কোথাও নিয়ে যাবে।

সরল বলল—তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায়?

—যেখানে খুশি যাব। যাবে কিনা বল।

—আমি কি না কি, তুমি আমাকে নেবে কেন?

—এই যে এতদিন বলেছ, তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাও সরলবাবু।

—ও এমনি। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাবে? মা ছাড়বে কেন?

—ছাড়বে। রাজি করাব।

—না সরলবাবু ছাড়বে না। তুমি এক জগতে বড় হয়েছ, মা আর এক জগতে। দুস্তর ফারাক। বলে প্রায় ছুটে উপরে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছিল নীচে। সরল আচমকা জড়িয়ে ধরে বলল—রিন্টি, রিন্টি, ছিঃ এটা কি করতে যাচ্ছিলে!

রিন্টি বসে পড়ল। সত্যি সে একটা কিছু করতে যাচ্ছিল। সে বলল—আমি পারছি না সরলবাবু। আমি বেঁচে থাকতে চাই। কখনও আমি মরতে চাই না।

এ-সব কথা শুরু হলে সরল ভেবে পায় না সে কি করবে। সে জানে পৃথিবীতে কেউ কখনও এ-ভাবে মরতে চায় না। রিন্টিও চায় না। তার মনে হল জোরজার করে জানতে চাইলে খারাপ হবে। তাকে এখন রিন্টির কাছে নবীন সন্ন্যাসী হয়েই থাকতে হবে। জীবনে কখনও না কখনও ঠিক সময় আসবে—সরল হাতে নীল লণ্ঠন নিয়ে হাজির হতে পারবে মেয়েটার কাছে। সে বাস থেকে হলিডে হোমে নেমে যাবার সময় আস্তে রিন্টিকে বলল—সকালে তোমার ছবি নিয়ে যাব।

মাসিমা উদাসবাবু দুজনই গেটের মুখে। রিন্টি ফিরে আসায় বড় আশ্বস্ত চোখ মুখ। সরল বলল—মাসিমা কাল সকালে আসছি। রিন্টির অনেক ছবি তুলেছি। নিয়ে আসব। মনে মনে ভাবল রিন্টিকে সে ভাল করে তুলবেই।

পূর্ণিমা বলল—হ্যাঁ বাবা, নিয়ে এস।

উদাসবাবু একটা কথাও বলল না। গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে রিন্টির দিকে।

আর রিন্টি গেটে দাঁড়িয়ে থাকল। সরলকে চলে যেতে দেখছে। এক সুন্দর পৃথিবী থেকে সরলবাবু তাকে এখানে যেন নির্বাসনে রেখে গেল। মা তার কে, মার জন্য মন পোড়ে কখনও মনে হল না। ডিমের খোসা ভেঙ্গে গেলে পাখির ছানা যে আলোর ঠিকানা পায়, সরলবাবু তার কাছে সেই আলোর ঠিকানা। সে চীৎকার করে বলল—সরলবাবু খুব সকালে আসবে। আমি তোমার জন্য বসে থাকব। আমরা দুজনে লনে বসে এক সঙ্গে চা খাব আর ফটোগুলো দেখব। কি মজা!

সরল হাত তুলে দিল। সে কাল খুব সকালেই আসছে। সেও তো স্বস্তিতে নেই। যে আশ্চর্য বনভূমির আবিষ্কার তার জীবনে ঘটে গেল, সেখানে নিরিবিলি হেঁটে যেতে না পারলে তার স্বস্তি নেই।

॥ পাঁচ ॥

—এ-তিনটা পোস্টকার্ড সাইজ। বাকিগুলো ছোট হলেও চলবে। আজই দিতে হবে।

দোকানী বলল—আজ হবে না। কাল বিকেলে পাবেন।

—আমার যে আজই দরকার।

এমন নাছোড়বান্দা কাস্টমার এই সমুদ্রতীরে দোকানী অনেক দেখেছে। এ-সময়ে তারা কিছু কামিয়ে নেয়। সে দর কষাকষির জন্য বলল—আপনাকে আজই কেউ করে দেবে না। কাজের চাপ বেশি। দোকানী তারপর হেসে দিল। নেগেটিভ দেখে বুঝেছে, এক জোড়া নতুন প্রেমিক। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কোণার্কে গেলেই প্রেমিক প্রেমিকারা ঠিক এই ঢঙেই ছবি তুলে থাকে। তর সয় না। কতক্ষণে

ছবিতে নিজেদের নতুন ভাবে খুঁজে দেখবে বলে সঙ্গে সঙ্গে করে দিতে হয়। সে বলল, বসুন দেখছি। আরও অনেকে এয়েছে ছবি নিতে। সবাই নিজের নিজের ছবি বুঝে নিচ্ছে। দোকানীর ব্যস্ততা দেখে ভাবল শেষ পর্যন্ত যদি না হয়! সরল কেমন অধীর গলায় বলল—আমি কিন্তু না নিয়ে উঠছি না। রাত যত হোক বসে থাকব।

দোকানী ভিতরে ঢুকে গেল। ওর সহকারী এখন বাইরে। যাবার সময় বলে গেছে, একটু দেরি হবে। সে কাকে যেন বলল—বাবুকে চা দাও।

সরল নেগেটিবগুলো নিয়ে খুব শঙ্কাতে আছে। যা ভিড়, তাতে তার ছবিগুলি আবার বেহাত না হয়ে যায়। কিম্বা ওরটা করতে গিয়ে অন্য কারুর নেগেটিব তাড়াতাড়ি প্রিন্ট করে দিয়ে যদি দেয়—এসব ভেবে সে একবার দোকানের ভেতরেই ঢুকে গেল। বলল—আমার-গুলো ঠিক দেখে নিয়েছেন ত?

দোকানী পেছন ফিরে সরলকে দেখল। সেই এক হাসি। দোকানীর বয়স হয়েছে। বাঙালী ভদ্রলোক এতদূরে ছবির দোকান খুলে এখানেই থেকে গেছে।

দোকানী দেখেছে সবাই ছবির ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো করে। এতে ছবি ভাল হয় না। মাঝে মাঝে আবার বড় ভাল হয়ে যায়। আসলে কপাল। কপাল না অন্য কিছু কে জানে।

দোকানী সরলকে বলল—কোথায় উঠেছেন?

সরল তার হোটেলের নাম বলল।

সহকারী ছেলেটি নেগেটিবগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ছবি ভালই হবে মনে হয়।

সরলের মুখ দেখে কি দোকানী টের পেয়েছে, এই ছবি তার কাছে যখের ধনের চেয়েও মূল্যবান বেশি। অথবা সেই ফটো শিকারীর হাত যদি ভাল না হয়—কিম্বা দোকানী যদি বলে দেয়, ভাল আসেনি। আবছা। দোকানীকে সরল কেমন ছেলেমানুষের মতো বলল—আলো কম ছিল, কেমন উঠবে কে জানে।

দোকানী এবারে আর কেন জানি সরলকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখতে চাইল না। বলল—খুব সুন্দর ছবি উঠেছে। আপনি ঘুরে আসুন না।

সরল বলল—সেই ভাল। আমি যাচ্ছি। আসলে সরল ভাবল, এই ফাঁকে সে হোটেলে গিয়ে চানটান করে নেবে। রাতের খাবার আটটার মধ্যে দেয় বলে, ইচ্ছে করলে খেয়েও নিতে পারে। হোটেল থেকে স্বর্গদ্বার বেশি দূর না। রিক্সা নিলে সাত আট মিনিটও লাগে না। কিন্তু কিছুটা হেঁটে এসেই মনে হল, যদি আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। সে তো সময়টা জেনে আসেনি। দোকান কটা অবধি খোলা থাকে তার জানা হয়নি। সে আবার ফিরে গিয়ে বলল—ভুলেই গেছি। দোকান কটার সময় বন্ধ করেন ?

দোকানী বলল—আপনার জন্য বসে থাকব।

—নটার মধ্যে এলে হবে ?

—হবে। তারপর এলেও দোকান খোলা পাবেন।

সরল এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিল। এটুকু পথ হেঁটেই যাবে। ভিড় বাঁচিয়ে সে হাঁটছে। একা। কিন্তু নিজেকে একা ভাবতে কষ্ট লাগে। সে মনে করে তার পাশে আরও একজন হাঁটছে। যেন নাক টানলে সে এখন তার চুলের গন্ধও পাবে। আর শাড়ির খসখস শব্দ। এবং অদ্ভুত সব কথাবার্তা—আমি পড়তে পারি, আমার তিন অনুচর, অথবা উদাসবাবু সব মিলে যত তার কাছে রিন্টি রহস্যময় হয়ে উঠছে, তত সেও আর এক ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। মা বাবা ভাই বোন কত দূরের মনে হয়! রিন্টি তার কাছে সমুদ্রে এক নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের মতো। সে সেখানে আছে। চাষ আবাদ করছে। ছোট্ট নদী, কাশফুল এবং ঘরে ফেরার সময় অনেক দূরে কুটিরে রিন্টি তার জন্য যেন লণ্ঠন জ্বেলে বসে আছে। রিন্টিকে ছবিগুলি দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারলে, সে আর কিছু চায় না। সে একা একা কথা আরম্ভ করে দিল। বলল—রিন্টি তুমি আমার সত্যি রূপকথার আংটি।

সে ফের বলল—আগে ছিলে কার ?

—রাজার।

—এখন কার ?

—তোমার।

সরল বলল—কাল আমরা বিকেলে সি-বিচে বসে থাকব।

তুমি টিলার উপরে, আমি নিচে। আমার হাতে বেহালা। আমি বাজাব। তুমি নিবিষ্ট মনে শুনবে।

রিন্টি যেন পাশে দাঁড়িয়ে মজা করার মতো বলল—সমুদ্র ক্ষেপে যাবে।

—ক্ষেপে যাবে কেন ?

—ওর রাগ হবে না ?

—কী যে বলছ না।

—সত্যি বলছি। বেহালা তো এনেছিলে ওর জন্যে।

সরল বলল—সে আর হল না। আরও বড় সমুদ্র সামনে। সে মানুষের বড় প্রিয় সমুদ্র। সারা জীবন সাঁতার কাটব।

—জাঁদরেল সাঁতারু।

—ঠাট্টা করছ।

হাহাকার হাসি। রিন্টি যেন আঁচল উড়িয়ে সি-বিচে নেমে যাচ্ছে।

সরল সিঁড়ি ভাঙছে। সে যে কি সব ভাবছে, তাড়াতাড়ি সব করা দরকার। বিষ্ণু গৌর ওকে দেখেই বলল—কিরে এত দেরি !

সরল এড়িয়ে যাবার জন্য বলল—দেরি কোথায় ? এইত নামিয়ে দিল।

বিষ্ণু বলল- আটটা বাজে।

সরল শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকে গেল। যেন তার দু দণ্ড বসে থাকার সময় নেই। কথা বলার সময় নেই। হুঁ হাঁ করে ওদের কথার জবাব দিচ্ছে। তিন তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে স্নান করল। বিষ্ণু গৌর লাউঞ্জে নেমে গেছে। সে গিয়ে বসে পড়ল। হা-ভাতের

মত খেয়ে নিয়ে ফের নেমে গেল। গৌর বিষ্ণু ক্ষেপে গিয়ে বলল—যাকগে মরুকগে কথা না শুনলে কি করব।

সরল নিচ থেকেই বলল—রাগ করিস না আসছি।

—এই রাতে বাইরে তোর কি এমন কাজ?

—আছে। বুঝবি না।

সরল রাস্তায় নেমে এল। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। রাস্তার লোকজন কমে আসছে। তার তর সইছিল না। ঘড়িতে দেখল নটা বেজে গেছে। দোকানী যদি চলে যায়—যদি গিয়ে দেখে বন্ধ সব কিছু, কেমন উদ্বেগে মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে ফটোর জন্য। এত অস্থীরতা কেন সরল? সরল বলল—জানি না। আবার নিজের সঙ্গে তার কথোপকথন।

—প্রথম প্রেম!

—জানি না।

প্রথম আত্মসমর্পণ?

—জানি না।

মেয়েটার কোন ঠিকানা নেই?

—আছে।

—বলছে না কেন?

—ঠিকানা জানে না। এবারে জানবে।

—একেবারে কচি খুকি!

—খুকি কিনা জানি না। তবে ভারি পবিত্র। ওর কোন কষ্ট আছে। সব মানুষেরই থাকে। আমি তাকে নিরাময় করে তুলব।

—হয় না। জীবন বড় এলেবেলে রাস্তা।

—তবু সে রাস্তায় মানুষই হাঁটে।

দূর থেকেই সরল যেই দেখতে পেল, খোলা আছে দোকান—ওর কথোপকথন শেষ হয়ে গেল। সে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানী বলল—বসুন দেরি হবে।

—কত দেরি?

—অনেক দেরি।

সে বসে থাকল। জবু থবু এক বালকের মত বসে থাকল। সবাই ওকে নিয়ে মজা করছে। দোকানী পর্যন্ত। সে নিজের সঙ্গে কথোপকথনে বললে, যত দেরিই হোক আমি যাব না। সকালে রিন্টি ফটো দেখবে বলে বসে থাকবে। কথা না রাখতে পারলে আমার উপর ওর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর সরল কত রাতে ফিরেছিল জানে না। বালকের মতো ছবিগুলো খাম থেকে বার বার বের করেছে আর দেখেছে। সে ঘরে ফিরেই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল। বালিশের তলায় খাম রেখে দিয়েছে। ওরা যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, সে তখন উঠে বসেছে—টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে নিমগ্ন হয়ে দেখেছে, দু'জনের ছবি। রিন্টির মুখ নক্ষত্রের মত জ্বলছে। পাশে তাকে ভারি বেমানান লাগছিল। সে কিছুতেই রিন্টির মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। এ-ভাবে কখন সকাল হয়ে গেল, কখন হাত মুখ ধুয়ে সেই হলিডে হোমের সামনে সে হাজির তাও জানে না। সে শুধু দেখল, হলিডে হোমের দরজা জানালা বন্ধ। কেউ জানালা খুলে দাঁড়িয়ে নেই। লনে কেউ তার অপেক্ষায় বসে নেই। খাঁ খাঁ করছে বাড়িটা। সে গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। দরজায় ধাক্কা মেরে ডাকল, রিন্টি আমি, দরজা খোল। তোমার ফটো এনেছি।

কেউ কোন কথা বলল না।

কোন এক বুড়ো মানুষ হাজির তখন। শুধু বলল—ওরা কাল রাতেই চলে গেছে।

সরল মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছিল। তার পকেটে রিন্টির ফটো। তার রিন্টি, তার রূপকথার আংটি।

তখন কেউ যেন হাঁকল, আংটি তুমি কার?

অনেক দূর থেকে কে যেন বলল—যার হাতে আছি তার।